মোগল সাম্রাজ্য পতনের ইতিহাস

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

মোগল সাম্রাজ্য পতনের ইতিহাস

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ আকরাম ফারুক

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২২৬

১ম সংস্করণ

রমযান	১৪১৭
মাঘ	১৪০৩
জানুয়ারী	১৯৯৭

বিনিময় ঃ ৯০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

دکن کی سیاسی تاریخ -এর বাংলা অনুবাদ

MOGOL SAMRAJAY POTONER ETIHASH by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 90.00 Only.

আমাদের কথা

কোনো জাতি যদি পৃথিবীতে গর্বের সাথে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই অতীত ইতিহাস জানতে হবে। তাকে জানতে হবে নিজেদের উত্থান এবং পতনের ইতিহাস। তাকে খুঁজে বের করতে হবে নিজেদের অতীতের উত্থান ও পতনের কার্যকারণসমূহ।

ভারত উপমহাদেশে মোগল শাসকরা কয়েক শতাব্দী শাসন কার্য-পরিচালনা করে। সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনামল পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য ছিলো অপারাজেয়। আরওঙ্গজেবের পর এ বংশের শাসকদের অযোগ্যতা, অদূরদর্শিতা ও বিলাসিতার কারণে এ সাম্রাজ্যের ভিতের মাঝে ফাটল ধরে। দেখা দেয় বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা। উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ধ্বংসের দুয়ার। ছোবল হানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। অবশেষে চরম অপমানকর অবস্থায় অবসান ঘটে এই বিরাট সাম্রাজ্যের।

সাইয়েদ মওদূদী (র) জামায়াত গঠনের পূর্বে মুসলমানদের ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনারই অংশ তাঁর গ্রন্থ "দক্কিন কী সিয়াসী তারীখ"। পরবর্তীতে ইসলামী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার কারণে সাইয়েদ মওদূদী (র) তাঁর ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। তবে উক্ত শিরোনামে তাঁর লিখিত ইতিহাসের যে অংশটুকু প্রকাশ হয়েছে, তাতে মোগল সাম্রাজ্য পতনের কার্যকারণসমূহ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারায় পরম দয়াময় আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা গ্রন্থটির নাম দিয়েছি "মোগল সাম্রাজ্য পতনের ইতিহাস"। এ গ্রন্থটি ইতিহাসের ছাত্র ও ইতিহাস প্রেমীদের দারুণভাবে কাজে লাগবে আশা করি।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকদের একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাহলো, গ্রন্থকার যে ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সে কাজ যেহেতু শেষ করতে পারেননি, তাই এ গ্রন্থটি পাঠ করার মাধ্যমে পাঠকদের ইতিহাস পাঠ করার তৃষ্ণা এ থেকে পুরোপুরি মিটবে না। কিন্তু যতটুকু ইতিহাস এ গ্রন্থে পাবে, তাতে খাঁটি ইতিহাস জানার আকাংখা অনেকটা পূর্ণ হবে।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

নিযামুল মুল্‌ক ও তাঁর পরিবার

দাক্ষিণাত্যের আসফিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠায় যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ অবদান রেখেছিল, তন্মধ্যে স্বয়ং নিযামুল মুল্‌ক আসফজাহের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর পারিবারিক প্রতিপত্তি অন্যতম। সুতরাং স্বভাবতই এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর পরিবারের জীবন বৃত্তান্ত দিয়ে শুরু করা বাঞ্ছনীয়। তবে যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় কোন সাধারণ ইতিহাস নয় বরং রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত, তাই এসব ব্যক্তিবর্গের জীবনেতিহাস থেকে আমরা শুধু সেইটুকুই গ্রহণ করা সমিচীন মনে করি, রাজনৈতিক দিক থেকে যার যথেষ্ট গুরুত্ব ও সার্থকতা রয়েছে।

নিযামুল মুল্‌কের পূর্বপুরুষগণ

নিযামুল মুল্‌কের বংশ পরম্পরার সপ্তদশ পূর্ব-পুরুষ হচ্ছেন হযরত শেখ শিহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং ৩২তম পূর্ব-পুরুষ আমীরুল মুমিনীন হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু আনহু। তাতারী আগ্রাসনের পর এই পরিবার সমরকন্দের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। আপন বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও চারিত্রিক মহত্বের সুবাদে এই পরিবার উক্ত অঞ্চলে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। এই পরিবারেরই এক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন খাজা ইসমাঈল। ইনি আলম শেখ নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। সমরকন্দের শাসনকর্তা তাঁকে দেশের 'শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বেশ কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে আওয়ারেফ, শারখুল নাসায়েহ এবং আ'লামুত তুকা—এই তিনখানা গ্রন্থ ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ। আলম শেখের দু'জন পুত্র সন্তান ছিলেন। একজন খাজা আবেদ। ইনি নিযামুল মুল্‌কের দাদা। অপরজন খাজা বাহাউদ্দীন। ইনি এক সময় সমরকন্দের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। খাজা বাহাউদ্দীনের পুত্র মুহাম্মদ আমীন খান এবং পৌত্র কামরুদ্দীন খান সুলতান মুহাম্মদ শাহের আমলে মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন।

কালীজ খাম খাজা আবেদ

নিযামুল মুলকের দাদা খাজা আবেদ শিক্ষা সমাপনান্তে সমরকন্দ থেকে বোখারা চলে যান। সেখানে তিনি প্রথমে বিচারপতি এবং পরে শায়খুল ইসলাম পদে অভিষিক্ত হন। এই সময় সম্রাট শাহজাহানের শাসনাধীন ভারতবর্ষে চলছিল উপচে পড়া সমৃদ্ধির এক স্বর্ণ যুগ। জনজীবনে যেমন ছিল অঢেল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের সমারোহ, তেমনি শাসকদের কাছেও ছিল যোগ্যতা ও

প্রতিভার যথোচিত সমাদর। এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিরল উদার পরিবেশ বিরাজমান ছিল। ব্যক্তিগত গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং সহজাত যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে, উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের সুযোগ ছিল যে কোন মানুষের জন্য উন্মুক্ত ও অবারিত। এ কারণে শাহজাহানের দরবারে দূর-দূরান্ত থেকে বহু গুণধর লোকের সমাগম ঘটতো। এহেন পরিবেশের আকর্ষণেই খাজা আবেদও ভারতে উপনীত হন। হিজরী ১০৬৬ সন, মোতাবেক ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সেখানে গিয়ে রাজ দরবারে চাকুরী লাভ করেন। এর কিছুদিন পরেই প্রাসাদ বিপ্লবের ফলে আওরংগজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতার এই পটপরিবর্তনে খাজা আবেদের জন্য অধিকতর উন্নতির পথ খুলে যায়। সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পর সম্রাট তাঁকে প্রথমে চারহাজারী পদে, অতপর চতুর্থ বছরে 'সদরে কুল' (প্রধান সেনাপতি) পদে উন্নীত করেন। অবশেষে ১০ম বছরে তাঁকে আজমীরের সুবেদার পদে নিযুক্ত করেন। সিংহাসনে আরোহণের ১৪শ বছরে অর্থাৎ ১৬৭২ সালে তাঁকে সুলতানের সুবেদার নিযুক্ত করেন এবং ১৬৮১ সালে 'কালীজ খান' (তলোয়ার খান) খেতাবে ভূষিত করেন। পরে ১৬৮২ সালে তাঁকে পুনরায় প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। ঐ বছরই সম্রাট তাঁকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। সেখানে বেশ কয়টি সামরিক অভিযান পরিচালনার পর তাঁকে ১৬৮৬ সালে বেদারের সুবেদার নিয়োগ করা হয়। ১৬৮৭ সালে গোলকুন্ডা অবরোধ অভিযানে খাজা আবেদ সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সংঘর্ষের প্রাথমিক পর্যায়ে হঠাৎ দুর্গের ওপর থেকে একটি গোলা এসে তাঁর বাহুতে আঘাত করে এবং হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অভিযানে তিনি যে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেন, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি গোলার আঘাতে হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ শান্ত ও স্বাভাবিকভাবে ঘোড়ায় চড়ে স্বীয় শিবিরে আসেন। প্রধানমন্ত্রী আসাদ খান যখন তাঁকে দেখতে আসেন, তখন দেখেন যে, অস্ত্রোপচার চিকিৎসক তাঁর বাহুর ক্ষতস্থান থেকে বিচূর্ণ হাড়ের কণাগুলো বেছে বেছে বের করে নিচ্ছে, আর তিনি নির্বিকারভাবে বসে লোকজনের সাথে কথা বলছেন এবং অন্য হাত দিয়ে কফি খাচ্ছেন। অবশেষে এই আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতপর দুর্গের বাইরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। দাক্ষিণাত্যের মাটিতে দাফনের মাধ্যমে এই রাজ্যে তাঁর বংশধরের শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হোক—এটাই হয়তো আল্লাহর অদৃশ্য পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল।

গাজীউদ্দীন খান ফিরোজ জং

খাজা আবেদের পাঁচ পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে তিনজন খ্যাতিমান হন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ গাজীউদ্দীন ফিরোজ জং মীর শিহাবুদ্দীন, মুইজ্জুদ্দৌলা সালাবত জং মীর হামেদ খান এবং নাসীরুদ্দৌলা কাসওয়ারায়ে জং মীর আবদুর রহীম

খান। মীর শিহাবুদ্দীন এদের সবার বড় এবং সর্বাধিক সুনামের অধিকারী ছিলেন। ১৬৪৯ সালে তিনি সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই শিক্ষা লাভ করেন। ২০ বছর বয়সে ভারতবর্ষে গমন করেন। সমরকন্দের শাসনকর্তা সুবহান কুলি যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে বলেন ঃ "তুমি ভারতবর্ষে যাচ্ছ ? বেশ, একজন সুযোগ্য ব্যক্তি হতে পারবে।" এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে ফলেছিল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে এলে সম্রাট আওরংগজেবের দরবারে ৩৭০জন ঘোড় সওয়ার সৈনিকের সেনাপতি নিযুক্ত হন। শুরুতে তাঁর পদমর্যাদা ছিল তাঁর পিত্রার সহযোগী স্থানীয়। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর নিজস্ব দক্ষতা ও তেজোবীর্য ফুটে ওঠে এবং তা সম্রাটের মনোযোগ তাঁর দিকে প্রত্যক্ষভাবে আকৃষ্ট করে। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট উদয়পুরের রানার বিদ্রোহ দমন অভিযানে যান। তিনি হাসান আলী খান বাহাদুরকে রানার পশ্চাদ্ধাবন করতে গিরীবর্তের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশ কয়েকদিন যাবত হাসান আলী খানের কোন হদিস পাচ্ছিলেন না। সম্রাট ডাক গোয়েন্দা ব্যবস্থা পুনর্বহালের মাধ্যমে তাঁর সন্ধান লাভের জন্য একাধিকবার চেষ্টা চালান। কিন্তু রাজপুতদের ছোট ছোট দুর্ধর্ষ সেনাদলের নাশকতামূলক তৎপরতার জন্য তা ব্যর্থ হয়ে যায়। অবশেষে সম্রাট মীর শিহাবুদ্দীনকে তলব করেন এবং হাসান আলী খান কোথায় কিভাবে আছে, তা অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেন। মীর সাহেবের জন্য ভারত তখনো একটা অজানা অচেনা বিদেশ ভূমি। তথাপি তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে নির্ভিক চিত্তে গিরীবর্তের সুদূর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। অবশেষে দু'দিন পরেই সম্রাটকে হাসান আলী খানের সন্ধান এনে দেন। এই কৃতিত্বের জন্য সম্রাট তাঁকে খান উপাধি দান করেন এবং ভবিষ্যতে বড় বড় অভিযানে তাঁকেই পাঠাবেন বলে স্থির করেন। এরপর যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। এ সময় যুবরাজ আকবরের পক্ষ থেকে তাঁকে বিস্তর প্রলোভন ও বড় বড় পদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কিন্তু তিনি সম্রাটের আনুগত্যে অবিচল থাকেন। এমনকি বিদ্রোহী যুবরাজের সাথে যোগসাজশে লিপ্ত স্বীয় ভাই হামেদ খানকেও যুবরাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। আকবরের বিদ্রোহ দমনে তিনি সম্রাটের পক্ষে যে অসামান্য অবদান রাখেন, তার পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট তাঁকে পদোন্নতি ও সৈয়দ শিহাবুদ্দীন খেতাবে ভূষিত করেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে জুন্নেরের দিকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে তিনি সাফল্যের সাথে একাধিক আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং গাজীউদ্দীন খান খেতাবে ভূষিত হন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মারাঠাদের কাছ থেকে রাহিড়ী দুর্গ অধিকার করেন এবং ফিরোজ জং খেতাব লাভ করেন। বিজাপুর অবরোধকালে যখন সৈন্যদের টিকে থাকাই দুষ্কর হয়ে পড়ে, তখন রাজকীয় বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে রসদ নিয়ে যাওয়ার কাজে সম্রাট ফিরোজ জংকেই নির্বাচন করেন। পথিমধ্যে বিজাপুরীদের এক বিশাল সেনাবাহিনী তার

গতিরোধের চেষ্টা করে। ঐতিহাসিক খাফী খানের মতানুসারে এই বাহিনী ফিরোজ জং এর বাহিনীর চেয়ে দশগুণ বড় ছিল। কিন্তু ফিরোজ জং তাদেরকে পরাজিত করে এগিয়ে যান এবং কর্ণাটক থেকে বিজাপুরের অবরুদ্ধ বাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বহনকারী অপর একটি কাফেলার যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে যুবরাজ আযমের বাহিনীর সাথে গিয়ে মিলিত হন। এই সাহায্য এত মূল্যবান ছিল যে, শুধুমাত্র এরই বলে যুবরাজের বাহিনী শোচনীয়ভাবে নাস্তানাবুদ হয়ে অবমাননাকর পরাজয়ের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পায়। এই ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ সম্রাট বিজাপুর বিজয়ের সমুদয় কৃতিত্ব ফিরোজ জংকেই প্রদান করেন। তিনি স্বহস্তে নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন ঃ

"অমিত বিক্রমী বীর গাজীউদ্দীন খান বাহাদুর ফিরোজ জং-এর সাহায্যে বিজাপুর বিজিত হয়।"

খাফী খান লিখেছেন যে, ফিরোজ জং-এর এই কৃতিত্বের কথা যখন সম্রাটকে জানানো হয়, তখন তিনি বলেন ঃ

"ফিরোজ জং-এর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার বদৌলতে আল্লাহ্ যেমন তৈমুরের বংশধরকে অপমানের গ্লানী থেকে রক্ষা করলেন, তেমনি তিনি যেন কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর বংশধরের সম্মানও বজায় রাখেন।"

পরে যখন গোলকুন্ডার দুর্গ অবরোধ শুরু হয়, তখন সম্রাট সেনাদল বিভাজন, সুড়ংগ ও পরীখা খনন এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ সহ রণাঙ্গণের যাবতীয় কার্য নির্বাহের দায়িত্ব গাজীউদ্দীনকে সমর্পন করেন। এদিক থেকে বলতে গেলে তিনিই এই যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। গোলকুন্ডা বিজয়ের পর তিনি সাত হাজার সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন এবং অধুনী (ইমতিয়াজগড়) দুর্গ অধিকার করেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে চোখে আঘাত পেয়ে অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ত্যাগ করেননি। অন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর নির্বাহী কর্মদক্ষতা এত উঁচু মানের ছিল যে, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন দেওগড় (ইসলামপুর) অভিযানে রওয়ান হচ্ছিলেন, তখন সম্রাট তাঁর সেনাদল পরিদর্শন করেন এবং তাঁর সৈন্যদের শৃংখলা, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সাজসজ্জা দেখে অভিভূত হয়ে যান। তিনি যুবরাজ বেদার বখতকে (যুবরাজ আযমের পুত্র) ভর্ৎসনাচ্ছলে বলেন যে, ফিরোজ জং-এর চেয়ে বহুগুণ বেশী ভূসম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তোমার সৈন্যদের সাজ-রসজ্ঞাম তাঁর সেনাবাহিনীর তুলনায় কিছুই নয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ জং নীমা সিন্ধিয়া জয় করেন এবং এর প্রতিদানে তাঁকে "সিপাহসালার" (সেনাপতি) খেতাব দেয়া হয়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সম্রাট আলমগীর তাঁকে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বেরারের সুবেদার নিয়োগ করেন। সম্রাটের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। আলমগীরের ইন্তিকালের পর যখন যুবরাজ আযম

সিংহাসনের দাবীতে শাহ আলম বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করেন, তখন অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দেয় যে, খান ফিরোজ জংকে সাথে নেয়া অত্যাবশ্যক। কেননা তুরানী ওমরাদের সকলেই তাঁর নেতৃত্ব মানে। কিন্তু আযম ঔদ্ধত্যের সাথে বললেন ঃ "একজন অন্ধ লোকের জন্য আমি আমার সোজা পথ ছাড়বো কেন ? এর ফল দাঁড়ালো এই যে, তুরানী ওমরাদের কেউ তার সহযোগী হলো না। ঐতিহাসিকগণ আযমের এই ভুলটাকে তাঁর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন।[১] গৃহযুদ্ধের পরিণতিতে শাহ আলম বাহাদুর শাহ সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি তুরানী ওমরাদের বিরোধী এবং তাদের দাপট খর্ব করতে ইচ্ছুক ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তুরানী গোষ্ঠী বিশেষত ফিরোজ জং-এর পরিবার যে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, সে জন্য দাক্ষিণাত্যের সশস্ত্র বাহিনী ও সরকারী কর্মকর্তাদের ওপর তাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এমনকি দাক্ষিণাত্যের সমগ্র অধিবাসীদের ওপরও তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। শাহ আলম এই প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট করার জন্য এই গোষ্ঠীর সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে দাক্ষিণাত্য থেকে সরিয়ে দেন এবং এই সূত্র ধরেই ফিরোজ জংকেও বেরারের সুবেদারী থেকে হটিয়ে আহমেদাবাদ ও গুজরাটের সুবেদার করে পাঠান। বাহাদুর শাহের শাসনামলের চতুর্থ বছরে অর্থাৎ হিজরী ১৭ই শাওয়াল, ১১২২ হিঃ মোতাবেক ৮ই ডিসেম্বর ১৭১০ খৃষ্টাব্দে সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর লাশ দিল্লীতে পাঠানো হয় এবং বর্তমানে যেখানে আরবী কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে দাফন করা হয়। সম্রাট আলমগীর তাঁর সাথে কিরূপ হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন, সেটা তিনি চোখে আঘাত পাওয়ার পর সম্রাট তাঁকে যে চিঠি লেখেন, তা থেকেই বুঝা যায়। তিনি লেখেন ঃ

"কথা ও কাজে পরিপূর্ণ সাদৃশ্যের প্রতিক প্রিয় ফিরোজ জং ! আমার ইচ্ছা ছিল আপনার রুগ্নাবস্থা পরিদর্শন করতে নিজেই আপনার বাসস্থানে আসি। কিন্তু কোন্ মুখ নিয়ে আসবো এবং কোন্ চোখ দিয়ে দেখবো ? তাই সিয়াদাত খানকে আমার পক্ষ থেকে পাঠালাম। তিনি স্বচক্ষে দেখবেন এবং মনের কথা বলবেন। মৌসুমী ফলমূলের মধ্যে কিছু আঙ্গুর আপনার জন্যে সংগ্রহ করা গিয়েছিল। কিন্তু শরীরের শুভাশুভ বিষয়ে পারদর্শী ইউনানী চিকিৎসকগণ একে ক্ষতিকর বলে মত দিচ্ছেন। এ জন্য আমি তা পাঠানো সমিচীন মনে করিনি। ইনশাআল্লাহ দ্রুত রোগ নিরাময় ও পূর্ণ স্বাস্থ্য বহাল হবার পর দু'জনে একত্রে বসেই খাবো।"

---

১. ঐতিহাসিক আবুল কাসেম লিখেছেন যে, ফিরোজ জং সকল তুরানী ওমরাদেরকে আযম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। এক অন্ধ কবিতার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ
"তোমরা যে যেখানে সুখে শান্তিতে আছ, সেখানেই থাক। আল্লাহর তাকদীরের ওপর আস্থাশীল থাক। যুদ্ধের পর আল্লাহর ইচ্ছায় যিনিই বাদশাহ হবেন, আমরা ও তোমরা সকলে মিলে ভক্তিভরে তার আনুগত্য করে যাবো।"

প্রথম নিযামুল মুল্‌কের প্রাথমিক জীবন

সম্রাট শাহজাহানের প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লাহ খানের কন্যা সাঈদুন্নেসা বেগমের সাথে গাজীউদ্দীন খান ফিরোজ জং-এর বিয়ে হয়। অতপর ১৪ই রবিউস সানী ১০৮২ হিঃ মোতাবেক ১১ই আগষ্ট ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে তাদের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই পুত্রই নিযামুল মুলক আসফজাহ নামে খ্যাত হয়।[১] তৎকালে রীতি ছিল যে, উচ্চস্তরের ওমরাদের মধ্যে কারোর কোন পুত্র জন্মগ্রহণ করলে তিনি সম্রাটকে উপঢৌকন দিতেন এবং সম্রাট স্বয়ং তার নাম রাখতেন। এই প্রথা অনুসারে সম্রাট আলমগীর ফিরোজ জং-এর পুত্রের নাম রাখেন মীর কামরুদ্দীন। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি ৪৫০ ঘোড় সওয়ার সৈনিকের সম্মানসূচক সেনাপতির পদ লাভ করেন। এটি এমন এক দুর্লভ সম্মান ছিল, যা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিভাজন পরিবারের পুত্ররাই লাভ করতে সক্ষম হতো। মোগল সাম্রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ তারাই অলংকৃত করতো, যারা ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে গৌরবজনক কীর্তি স্থাপন করে নিজেকে রাজকীয় সম্মান ও মর্যাদার উপযুক্ত প্রমাণ করতে পারতো। কিন্তু যেসব বিশিষ্ট কীর্তিমান পরিবার নিজেদের অসাধারণ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আনুগত্যের বদৌলতে সাম্রাজ্যের একান্ত বিশ্বস্ত সদস্যে পরিণত হতো, তাদের পুত্রদেরকে শৈশবকাল থেকেই বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়ে রাজকীয় চাকুরীতে ভর্তি করে নেয়া হতো। সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে তাদের লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে মনোযোগী হতেন, যাতে তারা প্রথম থেকেই সেনাপতিত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। মীর কামরুদ্দীন খানের পরিবার এই শেষোক্ত পরিবারসমূহের মধ্যেই গণ্য হতো। তাই জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথেই তাঁকে রাজকীয় চাকরীতে ভর্তি করে নেয়া হয়। কিন্তু স্বীয় সহজাত যোগ্যতার বলে তিনি সম্রাটের অসাধারণ কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন এবং সম্রাট তাঁর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। কামরুদ্দীনের শিষ্টাচার ও বুদ্ধিদীপ্ত চালচলন দেখে সম্রাট প্রায়ই অভিভূত হয়ে বলতেন যে, খান ফিরোজ জং-এর পুত্রের কপালে বিচক্ষণতা ও সৌভাগ্যের লক্ষণ পরিস্ফুট। উজীরে আযম আসাদ খানও ফিরোজ জং-কে একাধিকবার বলেছেন যে, মীর কামরুদ্দীন অত্যন্ত ভাগ্যবান ছেলে বলে মনে হয়। এসব ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর যৌবনের শুরু থেকেই সত্য হয়ে দেখা দিতে আরম্ভ করে। ২০ বছর বয়সে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি আলমগীরের দরবার থেকে "চেন কালীজ খান"[২] খেতাব লাভ করেন। হিঃ ১১০৯ সাল মোতাবেক ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে থেকে তাঁর সামরিক তৎপরতার সূচনা হয় এবং তাকে মারাঠাদের বিরুদ্ধ বিভিন্ন

---

১. মাআসেরে নিযামী গ্রন্থের লেখক তাঁর জন্ম সন ১০৮৮ লিখেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত রায় এ মতের বিপক্ষে।

২. তুর্কী ভাষায়, 'চেন' অর্থ ছোট এবং 'কালীজ' অর্থ তরবারী। সম্রাট আলমগীর দাদাকে 'কালীজ খান' অর্থাৎ 'তলোয়ার খান' উপাধি দিয়েছিলেন বিধায় পৌত্রকে 'চেন কালীজ খান' অর্থাৎ 'ছোট তলোয়ার খান' উপাধি দেন।

অভিযানে পাঠানো হয়। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটক বিজাপুরের[১] সেনাধ্যক্ষ, ১৭০২ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সুবেদার একই বছর কোকন আদিল খানীর[২] শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁকে কর্ণাটক হায়দারাবাদের[৩] সেনাধ্যক্ষ হিসেবে রোস্তম দিল খানের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। অতপর একই বছর নুসরাতাবাদ, সাংগীর ও মুদগানের শাসনকর্তা হিসেবে বদলী করা হয়। ১৭০৪ থেকে ১৭০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দাকন কাবিরা দুর্গে এক নাগারে যে দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ চলে, তাতে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এর ফলে সম্রাট তাঁকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিকের সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ ও বিজাপুরের সুবেদার হিসেবে পুনঃ নিয়োগ দান করেন। সম্রাট আওরংগজেবের আমলে তাঁর কৃতিত্ব ও পদোন্নতির এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এরপর তিনি ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে যে অসামান্য অবদান রাখেন, সেটা আমার এ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সম্রাট আলমগীরের সাথে চেন কালীজ খান বাহাদুরের যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল তা শুধু তাঁকে প্রদত্ত উচ্চ পদবী ও খেতাবগুলোর আলোকে বিচার করলে বুঝা যাবে না। এ জন্য উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিকেও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এতে করে বুঝা যাবে যে, তাঁর সাথে সম্রাটের এক অসাধারণ ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতা ছিল। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একবার ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে চেন কালীজ খান স্বীয় পিতার সাথে অভিমান করে সম্রাটের কাছে চলে যান। সম্রাট শাস্তি হিসেবে তাঁকে দরবারে হাজির হবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, পিতার কাছে ক্ষমা চেয়ে এসো। তবে সেই সাথে স্বহস্তে গাজীউদ্দীন ফিরোজ জং-এর নিকট নিম্নরূপ সুপারিশ লিখে দেন :

"নিষ্ঠাবান পুত্র চেন কালীজ খান বাহাদুর মিনতি জানাচ্ছে যে, আপনি যদি ক্ষমা না করেন এবং অনুগ্রহ না করেন তবে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

---

১. বিজাপুর রাজ্যের দু'টো অংশ ছিল। একটি বিজাপুরের পতনের আগে আদিল শাহের করতলগত ছিল। আর বিজানগরের পতনের পর আদিল শাহ কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণে যে অংশটি দখল করেন, সেটি হলো দ্বিতীয় অংশ। এই দ্বিতীয় রাজ্যটি কর্ণাটক বিজাপুর নামে খ্যাত হয়েছিল এবং এর রাজধানী ছিল সারা।

২. মহারাষ্ট্রের যে অংশটি পশ্চিম তীর ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী গোয়া থেকে তাইপে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার নাম কোকন। এর আবার দু'টো অংশ ছিল। একটি কোকন বালাঘাট বা নিযাম শাহী কোকন এবং অপরটি কোকন পাইন ঘাট বা কোকন আদিল খানী নামে পরিচিত ছিল। পরে নিযাম শাহী রাজত্বের পতন ঘটলে শাহজাহান কোকন নিযাম শাহীও আদিল খানকে দিয়ে দেন। কিন্তু মারাঠাদের অরাজকতায় এ এলাকা কার্যত রাজকীয় দখলমুক্ত হয়ে যায়।

৩. যে অঞ্চলটির একাংশ বিজানগরের পতনের পর কুতুব বংশীয় সম্রাটগণ এবং বৃহত্তর অংশ মীর জুমলা মীর মুহাম্মদ—সাঈদ খান হায়দারাবাদে কর্মরত থাকাকালে দখল করেন, তার নাম কর্ণাটক হায়দারাবাদ।

'মায়াসেরে নিযামী' ও 'ফতুহাতে আসেফী' গ্রন্থদ্বয়ের আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেটি এই যে, আলমগীর স্বীয় জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে যুবরাজ কাম বখ্‌শের কন্যার সাথে চেন কালীজ খান বাহাদুরের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় সচিব খাজা ইখতিয়ার খানের মাধ্যমে প্রস্তাবও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু চেন কালীজ খান বাহাদুর বাহ্যতঃ বিনয়ের খাতিরে এবং বাস্তবিক পক্ষে পরিণাম দর্শিতার ভিত্তিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারটি এমন দু'জন গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন যারা নিযামুল মুল্‌কের সমসাময়িক এবং তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারী ছিলেন। তাই এর সত্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ঘটনা থেকে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। প্রথমত, সম্রাট আলমগীরের দৃষ্টিতে চেন কালীজ খান বাহাদুর ও তাঁর পরিবার এত শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি তাঁদেরকে রাজকীয় পরিবারের সাথে আত্মীয়তা স্থাপনের মর্যাদা প্রদানের উপযুক্ত বিবেচনা করেন। দ্বিতীয়ত তিনি তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক যোগ্যতার প্রতি এতটা আস্থাশীল ছিলেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে নিজের দুর্বলতম পুত্রকে শক্তি ও প্রতিপত্তি যোগানোর জন্য তাঁর কন্যার সাথে চেন কালীজ খানের বিয়ে হওয়াই সর্বোত্তম পন্থা প্রতীয়মান হয়। আলমগীর ভালোভাবেই জানতেন যে, কাম বখ্‌শ একজন অস্থির মতির ও স্থুল বুদ্ধির লোক। এ দু'টি দোষের সাথে ঔদ্ধত্য ও অহংকারেরও সমাবেশ ঘটায়। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি অধিকতর হ্রাস পেয়েছে। তিনি এও জানতেন যে, আসাদ খান ও তার পরিবার কাম বখ্‌শের বিরোধী হওয়ায় সে ইরানী ওমরাহদের সমর্থন লাভে অক্ষম। এ জন্য তাঁর মতে কাম বখ্‌সকে নিরাপদ করার একমাত্র উপায় ছিল এই বৈবাহিক বন্ধন। এর মাধ্যমে শুধু যে চেন কালীজ খানের মত বীর ও দক্ষ সেনাপতি তার সহায়ক হয়ে যেত তাই নয়, বরং এর সুবাদে ফিরোজ জং, মুহাম্মদ আমীন খান ও সকল তুরানী ওমরাহ্ তার সমর্থকে পরিণত হতো। এটি এমন একটি কৌশল ছিল যে, সম্রাট এতে সফল হতে পারলে তার মৃত্যুর পরবর্তী গৃহযুদ্ধে মুয়াজ্জেমের পরিবর্তে কাম বখ্‌শই হয়তো বিজয়ী হতো। আর না হোক, এতে অন্তত 'দক্ষিণাত্যে' তাঁর আলাদা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো। কিন্তু চেন কালীজ খান যেহেতু রাজনীতিতে আলমগীরেরই ভাব শিষ্য ছিলেন, তাই তিনি এ বিষয়টা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি নিজের জন্য এমন সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে অসম্মতি জানালেন যে, যার দরুন স্বয়ং তাঁকে ও তার পরিবারকে অনেক মারাত্মক ঝুঁকি বহন করতে হতো। তিনি যখন এই বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তখন হয়তো ঘুনাক্ষরেও জানতেন না যে, অদৃষ্ট দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদটি কাম বখ্‌স নয় বরং খোদ তাঁর জন্যই বরাদ্দ করে রেখেছে।

নিযামুল মুল্‌কের জীবনেতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, তাঁর মধ্যে তাঁর মহান দীক্ষাগুরু সম্রাট আলমগীরের গুণ বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে বিদ্যমান ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর সহজাত মেধা ও যোগ্যতা যেমন কৃতিত্বের দাবীদার ছিল,

তেমনি তাঁর দীক্ষাগুরুর প্রশিক্ষণেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। যে ধর্মভীরুতা, ভাবগাম্ভীর্য, আত্মমর্যাদাবোধ, পদমর্যাদা অনুসারে অন্যের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, রাজনৈতিক কর্মকুশলতা, রাষ্ট্রনায়ক সুলভ প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক দক্ষতা, মিতাচার ও আড়ম্বরহীনতা এবং সরলতা সম্রাট আলমগীরের চরিত্রের ভূষণ ছিল। নিযামুল মুল্‌কের চরিত্রেও অবিকল তাই বিদ্যমান ছিল। এদিক থেকে বলা অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি প্রায় সকল ব্যাপারে আলমগীরেরই প্রতিকৃতি কিংবা দ্বিতীয় আলমগীর ছিলেন।

এই দুর্লভ গুণাবলীর সমাবেশের বদৌলতেই আলমগীরের ইন্তিকালের পর বিদ্রোহ ও অরাজকতা পরিবেষ্টিত সাম্রাজ্যে তিনি সবচেয়ে শক্তিমান ও প্রতাপশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর দাদা, তাঁর পিতা এবং তিনি স্বয়ং অর্ধ শতাব্দী ধরে যে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, এক নাগারে তিন পুরুষ ব্যাপী তাঁর পরিবার সেনা পরিচালনা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় যে যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন, তাঁর দাদা রাজকীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেভাবে প্রাণোৎসর্গ করেন, তার পিতা যেভাবে চক্ষু বিসর্জন দেন এবং চক্ষু হারিয়েও যেভাবে অকুণ্ঠ চিত্তে সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণপণ সেবা ও সাধনা করেন। অতপর এ সবের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্রাট তাদেরকে যেরূপ বড় বড় পদবী, খেতাব ও সম্মানে ভূষিত করেন, তার ফলে তাঁদের পরিবার মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক সম্প্রদায় তথা তুরানী ওমরাহদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবার রূপে বিবেচিত হতো। উচ্চ রাজকীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আসাদ খান এবং প্রধান সেনাপতি জুলফিকারের পদেই যাঁরা সর্বাধিক মর্যাদাবান ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব রূপে চিহ্নিত হতেন, তারা আর কেউ নন, এই দুই পিতা-পুত্র ফিরোজ জং ও চেন কালীজ খান। কিন্তু যখন ফিরোজ জং মারা গেলেন এবং তার অব্যবহিত পর আসাদ খান ও জুলফিকার খানও একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, তখন তুরানী ওমরাহদের প্রভাবাধীন দাক্ষিণাত্য রাজ্যে নিযামুল মুল্‌কের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ আপনা আপনিই সুগম হয়ে গেল। আর সেই সুবাদেই তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে এক দোর্দন্ড প্রতাপশালী ব্যক্তি রূপে আবির্ভূত হলেন। অবশ্য এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নিযামুল মুল্‌ক যদি শুধুমাত্র পারিবারিক প্রভাব প্রতিপত্তির ওপরই নির্ভর করতেন এবং সেই নৈরাজ্যকর পরিবেশে বিলাসিতায় গা ভাসানো অসচ্চরিত্র রাজা, স্বার্থপর ও অযোগ্য মন্ত্রী, আর অপ্রকৃতিস্থ ও বখাটে চালচলনের আমলা-সভাসদদের আমলে তিনি যদি সুদৃঢ় চরিত্র, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, তিক্ষ্ণ মেধা, উচ্চাংগের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা এবং মার্জিত রুচী ও শালীন আচরণের মাধ্যমে অবিকল আওরংগজেব আলমগীরের ভাবমূর্তি তুলে ধরে নিজেকে সমগ্র ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ও আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থলে পরিণত না করতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে উন্নতির এই সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করা কখনো সম্ভব হতো না।

গ্রন্থপঞ্জী

মায়াসিরুল উমারা, রচনায় ঃ সামসামুদ দৌলাহ শাহ্ নওয়াজ খান, কোলকাতায় মুদ্রিত, ১৮৮৮।

মায়াসিরে নিযামী, রচনায় ঃ লালা মান সারাম (দফতরে দেওয়ানী পুস্তকাগার, হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য)।

মুসতাখাবুল্ লুবাব, রচনায় ঃ মুহাম্মদ হাসেম ওরফে খাফী খান নিযামুল মুলকী, কোলকাতায় মুদ্রিত, ১৮৬৯।

খাযানায়ে আমেরা, রচনায় ঃ মীর গোলাম আলী আযাদ বলগ্রামী, কানপুরে মুদ্রিত, ১৮৭১।

সারওয়ে আযাদ, রচনায় ঃ মীর গোলাম আলী আযাদ বলগ্রামী, হায়দারাবাদে মুদ্রিত।

সওয়ানেহে দেকান (পাণ্ডুলিপি), রচনায় ঃ মোনায়েম খান আওরংগাবাদী, নওয়াব মীর নিযাম আলী খানের আমলে লিখিত (হায়দারাবাদের আসফিয়া পুস্তকাগারে সংরক্ষিত।)

খাযানায়ে রসুলখানী (পাণ্ডুলিপি), রচনায় ঃ মুহাম্মদ ফায়দুল্লাহ মুনশী, রচনা কাল, ১২৫১ হিঃ নওয়াব নাসিরুদ্দৌলার আমলে (হায়দারাবাদের আসফিয়া লাইব্রেরীতে রক্ষিত)।

তাযাকে আসফিয়া, রচনা ঃ তাজাল্লী আলী শাহ, হায়দারাবাদ মুদ্রণ, ১৩১০ হিজরী।

ফতুহাতে আসফী (পাণ্ডলিপি), রচনা ঃ আবুল ফায়েজ, (দফতরে দেওয়ানী)।

সায়রুল হিন্দ ও গুলগাস্তে দেকান (পাণ্ডুলিপি), রচনা ঃ কাদের খান বেরারী (আসফিয়া লাইব্রেরী)।

হাদীকাতুল আলম, আসফিয়া রাজ্যের মন্ত্রী মীর আলম প্রণীত, হায়দারাবাদ মুদ্রণ, ১৩১০ হিজরী।

গুলজারে আসফিয়া, রচনা ঃ গোলাম হোসেন খান, হায়দারাবাদ মুদ্রণ, ১২৬০ হিজরী।

(Later Mughels, Willion Irvine, Calcutta, 1922)

(A History of Mahrattas, Grant Duff, Calcutta, 1918)

(The Nizam, His History and relations with the British Government, Henry George Briggs, London, 1861)

নিযামুল মুল্‌কের পূর্বপুরুষগণ এবং তাঁর চাচাতো ভাইগণ[১]
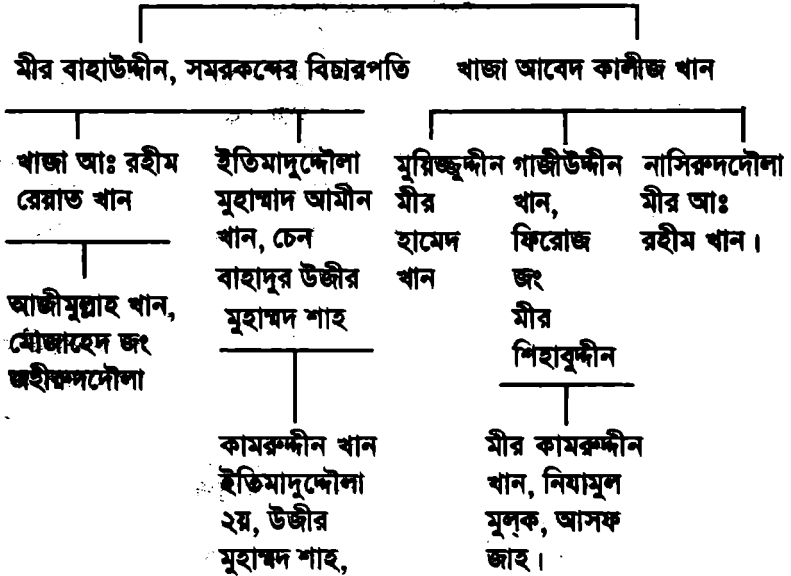
১. অত্র বংশ পরিচিতিতে শুধুমাত্র যাঁরা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্রাট আলমগীরের তীরোধানের পর

যে পরিস্থিতির সূত্র ধরে দাক্ষিণাত্য প্রদেশটি নিযামুল মুল্‌কের শাসনাধীনে ভারত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা পৃথক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়, এবার সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য সম্রাট আলমগীরের ইন্তেকালের পর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে যে ঘটনাবলী সংঘটিত হয়, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ তৎকালীন ঘটনাবলীকে আসফিয়া রাজ্যের ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বলে মনে করে অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু আমার মতে, আলমগীরের মৃত্যু থেকে শুরু করে মুহাম্মদ শাহের শাসনকাল পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে এবং সাম্রাজ্যের পর্যায়ক্রমিক অধোপতন, ভারতীয় রাজনীতির পালাবদল, বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উত্থান পতন, আর এই সমগ্র সময় ধরে বিকাশমান নিযামুল মুল্‌কের জীবন চিত্রের প্রতি সবিস্তারে ও তার সকল খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি না দিলে আসফিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও মোগল সাম্রাজ্য থেকে তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণসমূহ উপলব্ধি করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। এই আমলের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া আরো একটা কারণে অত্যাবশ্যক। সেটি এই যে, আসাফিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ এক শতাব্দী পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে যে সমস্যাগুলো সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে, এই সময়টাতেই তার সূচনা হয়। বস্তুত সূচনা না বুঝলে ফলাফল বুঝা যে কঠিন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১—আলমগীরের পুত্রদের গৃহযুদ্ধ

আলমগীরের জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্রদের মধ্যে যেভাবে কলহ কোন্দল শুরু হয়ে গিয়েছিল, তা থেকে পরিষ্কার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল যে, সম্রাটের চোখ বুজা মাত্রই এই সৌরজগতের গ্রহপুঞ্জের মধ্যে একটা মারাত্মক সংঘর্ষ বেধে যাবে। সম্রাট যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তাঁর ভয়ে তাদের পারস্পরিক শত্রুতা চাপা পড়েছিল। কিন্তু যখনই তার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল, অমনি তাদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ষড়যন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক খেলা। সম্রাট এসব লক্ষণ দেখে তাঁর জীবনের শেষভাগে স্বীয় পুত্র ও পৌত্রগণকে নিজের কাছ থেকে দূরে সম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বিক্ষিপ্ত করে দেন যাতে তাঁর মৃত্যুর পর অন্তত কিছুকাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ বাধতে না পারে এবং পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে তারা নিজেদের ও দেশের স্বার্থ অনুধাবনের যথেষ্ট সুযোগ পায়। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুয়াযযমকে কাবুলের, মুয়াযযমের এক পুত্র

মুইজ্জুদ্দীনকে মুলতানের এবং অপর পুত্র মুহাম্মদ আযীমকে বাংলাদেশের সুবেদার নিয়োগ করেন। স্বীয় মেঝ পুত্র আযমকে তিনি মালোহ ও গুজরাটের সুবেদার এবং আযম তনয় বেদার বখ্তকে গুজরাটের সহকারী সুবেদার নিয়োগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি ওছিয়তনামা লিখে স্বীয় বিশাল সাম্রাজ্যকে তিন পুত্রের মধ্যে এমনভাবে বন্টন করে দেন যে, প্রথম দুই পুত্র মুয়াযযম ও আযমের প্রত্যেককে দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে যে কোন একটি শহর পাবে। দিল্লী যার ভাগে পড়বে, সে শাহ্জানাবাদ, পাঞ্জাব, কাবুল, মুলতান, চাট্টা, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, এলাহাবাদ ও অযোধ্যা প্রদেশসমূহও শাসন করবে। আর যে পুত্র আগ্রাকে মনোনীত করবে, আকবরাবাদ, মালোহ, গুজরাট, আজমীর, খান্দেশ, বেরার, আওরংগাবাদ ও বেদার প্রদেশসমূহের শাসনভারও তার ওপর ন্যস্ত হবে। তৃতীয় পুত্র কাম বখশকে হায়দারাবাদ ও বিজাপুর প্রদেশদ্বয় এবং কর্ণাটকের উভয় অংশের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সাম্রাজ্যকে এভাবে বন্টন করার পর সম্রাট মুয়াযযম ও তার পুত্রদেরকে উত্তর ভারতের প্রদেশগুলোতে পাঠিয়ে দেন, আযম ও তার পুত্রদেরকে মধ্য ভারতে রেখে দেন এবং কাম বখ্শকে পাঠিয়ে দেন দক্ষিণ ভারতে।[১] কিন্তু এতসব দূরদর্শী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও অবধারিত অনভিপ্রেত ঘটনাগুলোকে শেষ পর্যন্ত ঠেকানো গেল না। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে যখন আহমদ নগরে সম্রাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন যুবরাজ আযম মালুহের পথে রওনা হয়ে রাজকীয় সেনানিবাস থেকে মাত্র ২৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করেছিলেন এবং কাম বখ্স বিজাপুর অভিমুখে যাত্রা করে ৪০ বা ৫০ ক্রোশের বেশী দূরে যেতে পারেননি। খবরটি শোনা মাত্রই আযম আহমদনগর ফিরে গেলেন এবং রাজকোশ অস্ত্রাগার ও অন্যান্য যাবতীয় উপকরণ হস্তগত করলেন। তিনি সকল রাজ কর্মচারীদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নিলেন এবং পবিত্র ঈদুল আযহার দিনে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। কাম বখ্শ সোজা বিজাপুর গিয়ে উপনিত হলেন এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসলেন। ওদিকে জিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে মুয়াযযম ও তার পুত্ররাও খবরটি জানতে পারলেন। মুয়াযয তনয় মুহাম্মদ আযীম আলমগীরের জীবদ্দশাতেই তাঁর নির্দেশক্রমে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো থেকে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। দাদার মৃত্যুর খবর শুনে তিনি আগ্রাতেই থেমে গেলেন। মুইজ্জুদ্দীন ও আয়াজ্জুদ্দীন চাট্টা ও মুলতান থেকে সসৈন্যে লাহোর উপনীত হলেন। সেখানে মুয়াযযমের ভক্ত অনুচর মোনেম খান সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। পেশোয়ার থেকে ১২ মাইল পশ্চিমে জমরুদ নামক স্থানে অবস্থানরত যুবরাজ মুয়াযযম ক্ষিপ্রগতিতে ভারত অভিমুখে রওনা হলেন এবং

---

১. আওরংগজেবের মৃত্যুকালে যুবরাজ মুয়াযযমের বয়স ৬৫ বছর, আযমের বয়স ৫৫ বছর এবং কাম বখ্শের বয়স ৪১ বছর ছিল।

লাহোর পৌঁছে তিনিও নিজস্ব স্বতন্ত্র মুদ্রা ও খুৎবা চালু করে দিলেন। এভাবে একই সাম্রাজ্যে একই সময়ে তিনজন সম্রাটের আবির্ভাব ঘটলো। এমতাবস্থায় নৈরাজ্য মাথাচাড়া না দিয়ে আর যায় কোথায়?

আযমের ব্যর্থতা ও তার কারণসমূহ

এই তিন সম্রাটের মধ্যে আযমই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর অধিকারী। তিনি নিজেও ছিলেন বীরযোদ্ধা এবং সম্রাট আলমগীরের পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞ উজীর আমলারা তাঁর সহযোগী ছিল। অধিকন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোকে ও মারাঠাদেরকে পদানত করার জন্য যে বিপুল সমর সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছিল তার সবই তার হস্তগত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভ্রান্ত কৌশল ও অদক্ষতার কারণে এই শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং এটাকে পুনরায় সতেজ করা তার পক্ষে আর কখনোই সম্ভব হয়নি। তাঁর পুত্র বেদারবখত আহমেদাবাদে তাঁরই সহকারী ছিল। সে সম্রাটের মৃত্যুর খবর শোনা মাত্রই আবেদন জানালো যে, তাকে এক্ষণি আগ্রায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। আগ্রার সুবেদার বাকী খান এবং কোতোয়াল আলী শের খান উভয়েই তাঁর সমর্থক ছিল। তাদের সাহায্যে সে অনায়াসে আগ্রা দখল করতে পারতো। কিন্তু আযম স্বয়ং তার পুত্রের প্রতি ঈর্ষাকাতর ছিলেন। তিনি বেদার বখতকে মালুহের সীমান্তে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললেন। সেমতে বেদার বখত মালুহে গিয়ে সময়ের অপচয় করতে লাগলো। অপর দিকে মুহাম্মদ আযীম তার আগে আগ্রায় পৌঁছে গেল। সুবেদার ও দুর্গরক্ষক কিছুক্ষণ প্রতিরোধ করার পর তার বশ্যতা স্বীকার করলো এবং সেখানকার কোষাগারের কোটি কোটি টাকা তার হস্তগত হলো। এতে করে মুয়াযযমের অর্থবল অনেকখানি সংহত হলো। বস্তুত অর্থবলই যে শ্রেষ্ঠ বল, তা বলাই বাহুল্য। আযমের দুর্বল হয়ে যাওয়ার অন্য যে কারণটি ছিল তা হলো, তার অহংকার ও দাম্ভিকতা, কৃপণতা, দুষ্ট লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং রাজকীয় ওমরাদের সাথে দুর্ব্যবহার। সম্রাট আওরংগজেবের হাতে গড়া লোকেরা এহেন আচরণে তার প্রতি রুষ্ট ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী আসাদ খান ও প্রধান সেনাপতি জুলফিকার খান উভয়ের উষ্ণ আন্তরিকতা থিতিয়ে যায় এবং তাদের অনুরাগ বিরাগ ও বিতৃষ্ণায় রূপান্তরিত হয়। এমনকি যাকে তিনি বুরহানপুরের সুবেদারী, পাঁচ হাজারী পদবী এবং খানে দাওরান খেতাবে ভূষিত করেছিলেন, সেই চেন কালীজ খানও তাকে পরিত্যাগ করে আওরংগাবাদ চলে যান। কাম বখ্শকে পরিত্যাগ করে যে মুহাম্মদ আমীন খান চেন বাহাদুর[১] তাঁর কাছে

---

১. ইনি খাজা আবেদের আপন ভ্রাতুষ্পুত্র, গাজীউদ্দীন ফিরোজ জং-এর চাচাতো ভাই এবং এই সূত্রে চেন কালীজের চাচাতো ভাই ছিলেন। তূরানী ওমরাদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল চেন কালীজ খানের সমমর্যাদা সম্পন্ন। চেন কালীজ খান তার চেয়ে দশ বছরের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। ১৬৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বোখারা থেকে ভারতে এসে আওরংগজেবের দরবারে চাকুরী লাভ করেন এবং তখন থেকে ক্রমাগত পদোন্নতি লাভ করে সম্রাটের শেষ জীবনে প্রধান সেনাপতি পদে অভিষিক্ত ও চেন বাহাদুর খেতাবে ভূষিত হন।

এসেছিলেন, তিনিও তার সঙ্গ ত্যাগ করে যান। ওমরাদের মধ্যে বাদবাকী যে কয়জন তাঁর সাথে ছিলেন, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারীখে মুহাম্মাদী গ্রন্থের লেখক মির্জা মুহাম্মদের বর্ণনা অনুসারে বিশেষভাবে তূরানী ওমরাগণ এবং সাধারণভাবে অন্যান্য সুন্নী ওমরাগণ আযমের প্রতি আরো যে কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তার সিংহাসনে আরোহণের বিরোধী ছিলেন, তাহলো এই যে, আযম আকিদা বিশ্বাসে একজন শীয়া ছিলেন। ফতুহাতে আসফী গ্রন্থের লেখকও এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"এ ছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঐ সম্রাট ছিলেন রাফেজী শীয়া। এভাবে তিনি স্বীয় মহান পূর্বপুরুষদের ধর্ম থেকে বিপথগামী হয়েছিলেন।"

কিন্তু আযমের সবচেয়ে বড় যে দোষটি তাকে সাম্রাজ্য পরিচালনার মত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের একেবারেই অযোগ্য করে দিয়েছিল, তা এই যে, তাঁর মধ্যে মতের দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, বিচক্ষণতা ও সাবধানতা নামমাত্রও ছিল না। তিনি শুধু অসি চালনাতেই পারদর্শী ছিলেন, তা সে উপযুক্ত ক্ষেত্রে হোক বা না হোক। তার এই দুর্বলতার ব্যাপারেই আলমগীর সবচেয়ে উদ্বিগ্ন ও শংকিত ছিলেন। তিনি আশংকা করতেন যে, এই জিনিসটাই হয়তো তাকে একদিন ধ্বংস করে ছাড়বে। "আহকামে আলমগীরী" গ্রন্থে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ

"ঐ সন্তানটি বড়ই অদ্ভুত, যার ওপর কারো সাহচর্যই প্রভাব বিস্তার করতে পারলো না, সতর্কতা ও দূরদর্শিতা থেকে যার অবস্থান হাজার যোজন দূরে, খারাপ ধারণা পোষণ করাই যে বিচক্ষণতা, সে কথা যার মনমগজে স্থানই পেল না এবং 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।' কুরআনের এই বাণী থেকে যার কোন শিক্ষাই অর্জিত হলো না।"

নিজের বীরত্ব ও সাহসিকতা নিয়ে আযম গর্ববোধ করতেন এবং মুয়াযযমকে ভীরু কাপুরুষ ও দুর্বল মনে করে তার মোকাবিলায় নিজের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মুয়াযযমকে "ফড়িয়া" বলতেন এবং এত হেয় জ্ঞান করতেন যে, তাকে কেউ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিলে কঠোর ভাষায় জবাব দিতেন যে, "এসব ব্যবস্থা কেবল কোন বীর পুরুষের মোকাবিলায় গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে—মুয়াযযমের মত কাপুরুষের মোকাবেলায় এ সবের কী দরকার? এই অতিরিক্ত আত্মনির্ভরশীলতার কারণেই তিনি কামান সাথে নেননি এবং সংবাদ আদান প্রদানেরও কোন ব্যবস্থা করেননি। এমনকি মুয়াযযমের আগ্রায় পৌছে যাওয়ার আগে তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে তিনি ঘূণাক্ষরেও কিছুই জানতে পারেননি। এই ঘটনা প্রবাহের সামগ্রিক ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, আযম যখন মুয়াযযমের মোকাবিলায় রওনা হন তখন তার সাথে ৫০ হাজারের বেশী সৈন্য ছিল না। অধিকাংশ রাজ

কর্মচারী তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল এবং টাকার অভাবে তিনি সৈন্যদের বেতন পর্যন্ত দিতে অক্ষম হয়ে পড়েন। এর ফলে তাঁর বাহিনীর সৈন্যরা দলছুট হয়ে প্রতিপক্ষের বাহিনীর দিকে চলে যেতে থাকে।

বস্তুত সে সময় সিংহাসন দখলের চেষ্টার সফলতা নির্ভর করছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল দিল্লী ও আগ্রাকে এই দুই দাবীদারের মধ্যে কে আগে পদানত করে তার ওপর। কেননা সেনাবল ও অর্থ বলের কেন্দ্র ছিল এই দুই নগরী। আযম এই প্রতিযোগিতায় পেছনে পড়ে যান এবং আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, মুয়াযযম জয়যুক্ত হন। এরপর মুয়াযযমের হাতে এসে স্বাম্রা সমগ্র পূর্বভারতীয় প্রদেশসমূহের ধনভাণ্ডার। এর মুদ্রামান ১৮ থেকে ২০ কোটি টাকা পর্যন্ত ছিল এবং কাবুল, লাহোর, বাংলা ও দিল্লীর সৈন্য সমেত ৮০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য তার অধীনস্থ ছিল। এক দিকে যেখানে বিপুল অর্থ, বিশাল সৈন্য সামন্ত এবং রাজ কর্মচারীদের সর্বাত্মক আনুগত্য ও অনুরাগ বিদ্যমান, আর অন্য দিকে অর্থ কম, সৈন্য অপর্যাপ্ত এবং কর্মচারীদের মন বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ, সেখানে এমন অসম প্রতিযোগিতায় নিছক বীরত্ব দিয়ে প্রতিপক্ষকে হারানো যায় না। এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে পরিণতি ঘটা স্বাভাবিক ছিল, তাই সংঘটিত হলো। ১৮ই রবিউল আউয়াল ১১১৯ হিঃ মোতাবেক ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে জাজাও এর রণাঙ্গনে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে আযম তাঁর উভয় পুত্র সমেত নিহত হন। আর দক্ষিণ ভারত বাদে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের অধিপতি হন সম্রাট মুয়াযযম ওরফে শাহ আলম বাহাদুর শাহ। বাহাদুর শাহ একজন সহনশীল, শান্তিপ্রিয় ও বিনম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি আযমকে লিখেছিলেন যে, "মরহুম পিতা স্বীয় ওছিয়তনামায় দেশকে যেভাবে ভাগ করেছিলেন তাতে তোমাকে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশের মধ্য থেকে চারটি গুজরাট ও মালুহ সমেত দিয়েছিলেন। আমি সেই সাথে আরো দু'টো প্রদেশ তোমাকে দিচ্ছি। কারণ, আমি চাই, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক রক্তপাত না ঘটুক।

"নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কাছে এবং যাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও ঈমান আছে তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট যে, অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের রক্ত ঝরানো এত বড় গুনাহ যে, সাম্রাজ্যের সমগ্র ধন-সম্পদও যদি তার কাফফারা হিসেবে দেয়া হয়, তবু তার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"

কিন্তু এই সন্ধি প্রস্তাব যদি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে আমি এবং তুমি নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থে পুরো দেশটাকে ধ্বংস করতে যাবো কেন ? এসো, আমরা দু'জনেই শুধু লড়াই করে ফায়সালা করে নেই। এতে তোমারই লাভ হবে। কেননা, তুমি স্বীয় তরবারীর সামনে কাউকে তোয়াক্কা করতে অভ্যস্ত নও। কিন্তু এই সহৃদয় মানুষটির বার্তার জবাবে আযম বললো,

"এই বুড়ো শেখ সাদীর গুলিস্তাও পড়েনি। তাতে লেখা রয়েছে যে, এক দেশে দুই রাজার রাজত্ব চলে না। আমি যে ভাগ বাটোয়ারা চাই সেটা হচ্ছে এই যে, "ঘরের মেঝে থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত আমার, আর আকাশের ওপর থেকে নক্ষত্র পর্যন্ত তোমার।"

এই অভিলাস অনুসারে আযম যুদ্ধ করলো এবং দেশের ভাগবাটোয়ারাও সে যে ধরনের চেয়েছিল সে ধরনেরই হলো। ঘরের মেঝে থেকে আকাশ পর্যন্ত অংশ তার অভিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দখলে চলে গেল। যুদ্ধের পর বাহাদুর শাহ আযম সমর্থক সকল রাজকর্মচারীকে শুধু ক্ষমা করেই ক্ষ্যান্ত হলেন না, বরং তাদেরকে উচ্চতর পদেও উন্নীত করলেন। আসাদ খান ও জুলফিকার খানকে গোয়ালিয়র থেকে ডেকে এনে পারিতোষিক দিয়ে তুষ্ট করলেন। আসাদ খানকে "নিযামুল মুল্‌ক আসফুদ্দৌলা" খেতাব ও সম্মানসূচক "উকিলে মুতলাক" (সার্বিক তত্ত্বধায়ক) পদে নিয়োগ করলেন। জুলফিকার খানকে "সামসামুদ্দৌলা আমীরুল ওমারা বাহাদুর নুসরাত জং" খেতাব এবং সম্মানসূচক "মীরবখশী" ছাড়াও সহকারী "উকিলে মুতলাক" পদ দান করলেন। দাক্ষিণাত্যে গাজীউদ্দীন খান ফিরোজ জং চেন কালীজ খান ও মুহাম্মদ আমীনের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছেও ক্ষমা ঘোষণামূলক চিঠি পাঠালেন এবং তাদেরকে পরিতুষ্ট করার চেষ্টা করলেন। চেন কালীজ খানকে সাত হাজারী পদ এবং আযম প্রদত্ত 'খানে দাওরান' খেতাব দান সহ অযোধ্যার সুবেদার ও লক্ষ্ণৌ-এর ফৌজদার নিয়োগ করলেন।

কাম বখ্‌সের ব্যর্থতার কারণ

সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় নির্বাহী কার্যাদি এবং রাজপুতানা অভিযান সম্পন্ন করার পর বাহাদুর শাহ কাম বখ্‌শের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। কাম বখ্‌শ সম্রাট আওরংগজেবের মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই বিজাপুর পৌছলেন। সেখানে চেন কালীজ খানের নায়েব সাইয়েদ নিয়াজ খান কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা চালানোর পর কাম বখ্‌শের নিকট দুর্গ সমর্পণ করলেন। কাম বখ্‌শ দুর্গ দখল করে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করলেন এবং আশপাশে যত্রতত্র সৈন্য পাঠিয়ে নিজের রাজত্বের পরিধি বিস্তৃত করা শুরু করলেন। শাহ আলম বাহাদুর শাহ ও কাম বখ্‌শ-এই দু'জনের মধ্যে কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বির মোকাবিলা করাকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত এই প্রশ্ন যখন আযমের সামনে এল, তখন তিনি একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পরামর্শের বিপক্ষে শাহ আলমের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনাকেই অগ্রাধিকার দিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্য বাদ দিয়ে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করলেন। এতে করে কাম বখ্‌শ দক্ষিণ ভারতে শক্তি বৃদ্ধির সর্বোত্তম সুযোগ পেয়ে গেলেন। কিন্তু কাম বখ্‌শ স্বীয় অপরীণামদর্শীতা, বুদ্ধির সংকীর্ণতা ও দৃষ্টির বক্রতা হেতু এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন। বিজাপুর ও কর্ণাটকের অধিকাংশ অঞ্চলকে পদানত করার পর

হায়দারাবাদ গেলেন এবং সুবেদার রুস্তুম দিল খানকে শরিয়তের বিধি মোতাবেক শপথ পূর্বক জানমাল ও মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে শহর অধিকার করলেন। এখানে কাম বখ্শের পারিসদবর্গের মধ্যে দু'টো দল সৃষ্টি হলো এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটিতে শুরু করলো। একটি দলের নেতৃত্বে ছিল আহসান খান মীর বখ্শী, সাঈফ খান (কাম বখ্শের শিক্ষাগুরু) এবং রুস্তুম দিল খান। অপর দলটির নেতৃত্বে ছিল প্রধানমন্ত্রী তাকাররুব খান হাকীম মুহসিন। তাকাররুব খান কাম বখ্শকে জানালেন যে, আহসান খানের দল তাকে (কাম বখ্শকে) গ্রেফতার করে বাহাদুর শাহের কাছে সোপর্দ করতে চায়। কাম বখ্শ এ খবরটি বিনা তদন্তে বিশ্বাস করে ফেললেন। তিনি রুস্তুম দিল খানকে পাকড়াও করে হাতির পায়ের তলে পিষ্ট করিয়ে দিলেন। সাইফ খানের হাত ও জিহ্বা কেটে হত্যা করালেন। আহমদ খান আফগানকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তার অপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। অতপর এদের লাশ সারা শহরে ঘুরিয়ে প্রদর্শনী করালেন। এরপর সেনাবাহিনীতে যিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং সেনাপতি ও সৈনিক নির্বিশেষে সকলে যার ভক্ত অনুরক্ত ছিল, সেই আহসান খানকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। সেখানে দু'তিন মাস ধরে কঠোর নির্যাতন চালানোর পর তাকে হত্যা করিয়ে দিলেন। এই নিষ্ঠুর জুলুমের ফলে সকল রাজকর্মচারী সৈনিক ও জনসাধারণ কাম বখ্শের ওপর নিদারুণভাবে বিক্ষুব্ধ হলো। হায়দারাবাদের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শহর ছেড়ে পালালো এবং সেনাবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য স্বপক্ষ ত্যাগ করলো।

এ পরিস্থিতিতে বাহাদুর শাহ আজমীর থেকে হায়দারাবাদ রওনা হন। পথিমধ্য থেকেই তিনি কাম বখ্শকে চিঠি দিয়ে সাবধান করে দেন যে, তিনি যেন হায়দারাবাদ ও বিজাপুরের প্রদেশ ক'টি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন এবং সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কাম বখ্শ এই আপোষ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান তো করলেনই, অধিকন্তু বাহাদুর শাহের দূতকেও লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ করলেন। ফলে যুদ্ধ করা ছাড়া বাহাদুর শাহের আর কোন উপায় রইল না। তিনি অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখলেন এবং ১১২০ হিঃ মোতাবেক ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে শওয়াল মাসে হায়দারাবাদের অনতিদূরে এসে যাত্রা বিরতি করলেন। কাম বখ্শের কাছে পাঁচ ছয়শো অশ্বারোহীর বেশী সৈন্য ছিল না। এই সৈন্যরাও তার দুর্ব্যবহারে, অত্যাচারে এবং এক বছর ধরে বেতন না পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। আর এদের মোকাবেলায় বাহাদুর শাহের সাথে ছিল দু'লাখেরও বেশী সৈন্য। সাইফ খান মীর আসাদুল্লাহ (যিনি জুলফিকার খান ও আসাদুল্লাহ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে রাজপুতানা গিয়েছিলেন এবং সেখানে রাজপুতদেরকে বাহাদুর শাহের বিরোধিতা ও কাম বখ্শকে সমর্থন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে সেই সময়েই হায়দারাবাদ পৌঁছেছিলেন)

কাম বখ্‌শকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন গুন্ডুয়ানা ও বেরারের মধ্য দিয়ে রাজপুতানা চলে যান এবং রাজপুত গোত্রপতিদের সাহায্য নিয়ে বাহাদুর শাহের আগেই দিল্লী ও আগ্রা দখল করেন। কিন্তু কাম বখ্‌শের মনে সন্দেহ জাগলো যে, সে বোধহয় তাকে গ্রেফতার করানোর ফন্দি আঁটছে। তাই তিনি সাইফ খানকে জবাব দিলেন যে, এ ক্ষেত্রে তোমার উদ্ভাবিত কৌশল ও হীতকামনার পরিণাম আমার শাস্তি ও হত্যা ছাড়া আর কিছু হবে না। কেউ কেউ তাকে পরামর্শ দিল নিকটবর্তী কোন উপকূলীয় বন্দরে গিয়ে সেখান থেকে ইরানের দিকে চলে যেতে। কিন্তু কাম বখ্‌শকে জ্যোতিষীরা যে বিজয়ের আশ্বাস দিয়েছিল তাতে তিনি এত বিশ্বাসী ছিলেন যে, কারোর পরামর্শই কর্ণপাত করলেন না এবং সেই মুষ্টিমেয় সংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে উভয় সেনাদল মুখোমুখী হলো। বাহাদুর শাহ যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাম বখ্‌স রক্তপাত ছাড়াই বশ্যতা স্বীকার করুক—এটাই তিনি কামনা করছিলেন। কিন্তু সেনাপতি জুলফিকার খান ঝাঁসি অবরোধের সময় থেকেই কাম বখ্‌শের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আসছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধ করার জন্য জিদ ধরেন এবং সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই আক্রমণ চালান। কাম বখ্‌শ এমন জোরদার প্রতিরোধ যুদ্ধ চালান যে, জুলফিকার খান ও তার সহযোগী দাউদ খাঁ চোখে সর্ষে ফুল দেখতে থাকেন। কিন্তু নিছক বীরত্ব ও সাহসিকতার বলে এত বড় সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় কতক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব? দু' ঘন্টা যুদ্ধ চালানোর পর কাম বখ্‌শের সৈন্যরা পর্যুদস্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তিনি নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হয়ে গ্রেফতার হন। এরপর বাহাদুর শাহ সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে যান।

সৌভাগ্যক্রমে কাম বখ্‌শ একটা দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিলেন। কিন্তু নিজের অদূরদর্শিতার দরুন সে সুযোগ হাত ছাড়া করে ফেলেন। তিনি যদি নিজের অংশ নিয়ে তুষ্ট থাকতেন তাহলে বাহাদুর শাহের মত শান্তিপ্রিয় মানুষ তাকে কখনো উৎখাত করার চেষ্টা করতেন না। তাঁর শাসনাধীন হায়দারাবাদ ও বিজাপুরের মত বিশালায়তন দু'টো প্রদেশ মিলিয়ে একটা নতুন সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারতো। ভীম ও গোদাবরী নদী থেকে নিয়ে রাসকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত এই নয়া সাম্রাজ্যের আয়তন সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের এক-চতুর্থাংশের সমান হতো এবং এর সম্ভাব্য রাজস্বের পরিমাণ অন্তত ১৫ কোটি রুপিয়ায় দাঁড়াতো। এই নয়া সাম্রাজ্য একাধিক দিক দিয়ে একটা প্রতাপশালী সাম্রাজ্য হবার যোগ্য ছিল। এর শাসক হতো তৈমুরীয় রাজ বংশের সদস্য। তাই তিনি অনায়াসেই সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সকল রাজকর্মচারী ও নেতৃস্থানীয় লোকদের আনুগত্য ও সমর্থন লাভ করতেন। তাঁর পক্ষে একটা ক্ষুদ্রায়তন সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অধিকতর সহজ হতো। মারাঠাদের দাপট তো সম্রাট আলমগীরই খর্ব করে তাদেরকে আধমরা করে রেখে গিয়েছিলেন। সেই শক্তিকে দমন করে পুরোপুরি

বশীভূত করা এই নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে সহজসাধ্য হতো। দক্ষিণ ভারতের অবাধ্য সেনাপতি, ভূস্বামী ও ছোট ছোট নৃপতিগণকে[১] জব্দ করে একটি একক শাসন ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং কটক থেকে নিয়ে কোকন পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারতকে তার কর্তৃত্বাধীন করা তার পক্ষে সম্ভব হতো। এই ঘটনার ৩০ বছর পর ইংরেজরা ভারত সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশের যে সুযোগ পেয়েছিল এবং যার ফলে ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটই পাল্টে গিয়েছিল, সেটা এ ধরনের একটি সুসংহত সাম্রাজ্যের উপস্থিতিতে হয়তো সম্ভব হতো না।

২— শাহ আলম বাহাদুর শাহের শাসনকাল

একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, আযম ও কাম বখ্শ উভয়ে বীর ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। কিন্তু তাদের চরিত্রে ঔদ্ধত্য মেজাজের কঠোরতা, মনের সংকীর্ণতা এবং বিচক্ষণতা ও কুশলতার অভাব এত প্রকট ছিল যে, তারা মোগল সাম্রাজ্যের শাসক ও আলমগীরের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য কোন ক্রমেই ছিলেন না। তাই তাদের পরাজয় ও মৃত্যুকে বাস্তবিক পক্ষে ভারতের বা সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকর আখ্যায়িত করা যায় না। তাদের তুলনায় বাহাদুর শাহ্ তার অনেক দোষত্রুটি এবং মাত্রাতিরিক্ত শান্তিপ্রিয়তা, সহৃদয়তা, মহানুভবতা, বদান্যতা, উদারতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাহীনতা সত্ত্বেও অগ্রগণ্য ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তৈমুর বংশীয় সকল সম্রাটের মধ্যে তিনি অনন্য ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাকে "কুদওয়াতুল মুহাদ্দেসীন" (শ্রেষ্ঠ হাদীস বেত্তা) মানা হতো। তাফসীর এবং ফেকাহ শাস্ত্রেও তিনি বুৎপত্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর পরহেজগারী ও ধর্মপরায়ণতা স্বয়ং তাঁর পিতার চেয়ে কম ছিল না। আলমগীরের পুত্রদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর পক্ষে স্বীয় ঔদার্য, মহানুভবতা, সহনশীলতা ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা ওমরা ও পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে কিছুটা হলেও তুষ্ট রাখা সম্ভব ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আলমগীরের তীরোধানের পর এই সাম্রাজ্যের শাসকের মধ্যে অন্য যেসব গুণবৈশিষ্ট্য থাকা দরকার ছিল, তা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি স্বীয় চার পাঁচ বছরের স্বল্পস্থায়ী শাসনকালে নিজের দুর্বলতা দ্বারাই এমন সব উপাদান সৃষ্টি করে ফেলেন, যার দরুন তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই গোটা সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

বাহাদুর শাহ সাম্রাজ্যের খোঁজ খবর রাখতেন না

তাঁর সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল এই যে, তিনি সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিষয়ে উজীর নাজির ও আমলা ওমরাদের ওপর ন্যস্ত করে রেখেছিলেন এবং ছোটখাট ব্যাপারতো দূরের কথা, মৌলিক ও বড় বড় বিষয়ের ওপরও তাঁর কোন ব্যক্তিগত তদারকী ছিল না। তাঁর এই অমনোযোগিতার কথা এতটা জানাজানি হয়ে যায় যে, জনসাধারণ তাকে "উদাসীন রাজা" বলতে শুরু করে। সাম্রাজ্যের

জন্য এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ছিল যে, আলমগীরের মত বিচক্ষণ শাসক—যিনি আপন সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়ের ওপরও নজর রাখতেন এবং ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নগণ্য কোন কর্মচারী বা দারোগার কার্যকলাপও তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারতো না—তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিল বাহাদুর শাহের মত এক উদাসীন সম্রাট। এর ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, মন্ত্রী থেকে শুরু করে আলেম ও পরহেজগার ব্যক্তিগণ পর্যন্ত প্রত্যেকেই দায়িত্বজ্ঞানহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। এমনটি হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। কেননা যারা পঞ্চাশ বছর ধরে একটা দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসন ব্যবস্থার বজ্র আটুনীতে আবদ্ধ থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তারা স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং স্বীয় বাছবিচার ক্ষমতার আলোকে কাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা আকস্মিকভাবে দেখতে পেল, সেই বজ্র আঁটুনী আর নেই। ফলে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীন আচরণ রোধ করতে পারে এমন শক্তির অস্তিত্ব কোথাও ছিল না।

মন্ত্রীর পদে ভুল নির্বাচন

কেবল এতটুকু ত্রুটিতেও হয়তো পরিণাম এতটা শোচনীয় হতো না, যদি মন্ত্রীরা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন চালানোর যোগ্য হতো। সম্রাট আলমগীর মৃত্যুকালে ওছিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তার উজীর আসাদ খানকে যেন ওজারতীতে বহাল রাখা হয়। বাহাদুর শাহের সর্বোত্তম মন্ত্রী হবার যাবতীয় যোগ্যতা এই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অর্ধ শতাব্দীর চেয়েও অধিক সময় ব্যাপী তিনি মোগল সাম্রাজ্যের বহু শীর্ষস্থানীয় দায়িত্বশীল পদে আসীন ছিলেন। শাহজাহানের আমলে দ্বিতীয় সচিব ছিলেন। আলমগীরের আমলে প্রথমে উপমন্ত্রী হন। তারপর দীর্ঘ ৩০ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কার্যক্রম অনুধাবন ও পরিচালনায় এবং তার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাঁর চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ কর্মকর্তা আর কেউ ছিল না। কিন্তু সম্রাট বাহাদুর শাহ ওজারতীকে নিছক পুরস্কার ও উপহার সামগ্রী ভেবে এই পদ নিজের অনুরক্ত বন্ধু মোনেম খানকে প্রদান করেন। একথা সত্য যে, আযমের মত শক্তিশালী শত্রুর মোকাবেলায় বাহাদুর শাহের সিংহাসন লাভ যেসব ব্যক্তির চেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল, তাদের মধ্যে যুবরাজ আজীমুশশানের পর একমাত্র এই মোনেম খানের নামই উল্লেখ করার মত। একথাও ঠিক যে, বাহাদুর শাহের বিপক্ষে আযমের সিংহাসন দাবীকে সমর্থন দানকারী শীর্ষস্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে এই দুই পিতাপুত্র আসাদ খান ও জুলফিকার খান সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু তবুও অস্বীকার করা যাবে না যে, মোনেম খানের অনেক উৎকৃষ্ট গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও এতটা যোগ্য ছিলেন না যে, নাজুক পরিস্থিতিতে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পুঁথিগত জ্ঞান ব্যতিরেকে তাঁকে সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ

করা চলে। বিশেষত যে প্রধানমন্ত্রীকে সম্রাটের ব্যক্তিগত তদারকী ও পথনির্দেশ ছাড়াই সকল ছোট বড় বিষয়ে নিজেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সে ধরনের প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য মোনেম খান মোটেই উপযুক্ত ছিলেন না। মোনেম খানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার পর আসাদ খানকে খুশী করার জন্য তাকে "উকিলে মুতলাক" (সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক) পদে নিযুক্ত করা হয়। এই পদ যদিও প্রধানমন্ত্রীত্বের চেয়ে উচ্চতর পদ ছিল, কিন্তু এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে শাহজাহানের আমলে আসফ খান যতটা ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, আসাদ খান ততটা ক্ষমতা পাননি। এক দিকে আসাদ খান এই ভুল পদ বন্টনে নাখোশ হন, অপর দিকে আসাদ খানের নামমাত্র উচ্চতর পদে আসীন হওয়াও মোনেম খানের বরদাশত হয়নি। এ জন্য বার্ধক্যের ওজুহাত দিয়ে আসাদ খানকে অব্যাহতি দেয়া হয়। আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে তদীয় পুত্র জুলফিকার খানকে মীর বখশী, দাক্ষিণাত্যের সুবেদার এবং সহকারী উকিলে মুতলাক পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। এভাবে মন্ত্রীত্বের সকল ক্ষমতা দুই ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের একজন ছিলেন অতিমাত্রায় ক্ষমতালোভী ও উচ্চাভিলাসী জুলফিকার খান। এ ধরনের দু' ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতা বিভক্ত হওয়ার যে কুফল অবশ্যম্ভাবী ছিল, তা অচিরেই দেখা দিল। উভয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিন চার বছর অবধি দ্বন্দ্ব ও সংঘাত লেগে থাকলো। আর এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দরুন সাম্রাজ্যের প্রশাসনে অধিকতর বিশৃংখলা দেখা দিল। বাহাদুর শাহের শাসনের চতুর্থ বছর অর্থাৎ ১১২৩ হিজরীর মুহাররম মাসে মোতাবেক ১৭১১ খৃষ্টাব্দে মোনেম খানের মৃত্যু হলে জুলফিকার খান ওজারতীর অভিলাসী হলেন। সম্রাট ততটা বুদ্ধিমত্তা দেখালেন বটে যে, একই পরিবারে উকিলে মুতলাক, আমীরুল ওমারা ও উজীর এই তিনটে পদের সমাবেশ ঘটানো সমিচীন মনে করলেন না। কিন্তু নৈতিক সাহসের অভাবে জুলফিকার খানকে অসন্তুষ্ট করে অন্য কাউকে উজীর নিয়োগ করতেও সক্ষম হলেন না। এ সমস্যার সমাধান তিনি এভাবে করলেন যে, ওজারতীর যাবতীয় ক্ষমতা তিনি কার্যত যুবরাজ আজীমুশ শানের হাতে ন্যস্ত করলেন। আর এনায়েতুল্লাহ খান খানসামানের পুত্র হেদায়াতুল্লাহ খানকে ওজারত খান খেতাব দিয়ে দেওয়ান (প্রধান সচিব) নিয়োগ করলেন। এই নয়া ব্যবস্থা পূর্বতন ব্যবস্থার চেয়েও ক্ষতিকর ছিল। কেননা এবার এমন এক যুবরাজকে জুলফিকার খানের প্রতিদ্বন্দ্বী বানানো হলো তিনি সম্রাটের পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও যোগ্যতম ছিলেন। সেই সময় থেকেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় এবং তার ফলশ্রুতিতে সম্রাটের মৃত্যুর সংগে সংগেই এক সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

শুধু এই ভুলই শেষ নয়। দায়িত্বশীল পদসমূহে অনুপযুক্ত লোকদের নিয়োগ করা বাহাদুর শাহের সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনে হয়, মানুষের যোগ্যতা ও মান নির্ণয় করার যোগ্যতাই তাঁর ছিল না। তাঁর চারপাশে তাঁর পিতার সংগৃহীত সর্বোত্তম লোকেরা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি

কোন্ কাজের যোগ্য কিংবা অযোগ্য, তা তিনি জানতেন না। তিনি স্বীয় পিতার এই মূল্যবান উপদেশ কার্যকর করতে পারেননি যে ঃ

"কামারের কাজ কুমোরকে অর্পণ করা বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের কাজ নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে এবং নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের কাজ উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে করতে বলা উচিত নয়। কেননা যোগ্যতর লোকেরা নিম্নস্তরের কাজ করতে গিয়ে কেলেংকারী ঘটিয়ে থাকে। আর নিম্নস্তরের কর্মচারীদের মধ্যে উচ্চতর কাজ করার সাহস থাকে না। বস্তুত সরকারের কর্মবন্টন ও ব্যবস্থাপনার গলদই সকল বিশৃংখলার উৎস।

চেন কালীজ খান ও তার পরিবারের সাথে অবনিবনা

বাহাদুর শাহের আরেকটা বড় ত্রুটি ছিল এই যে, তিনি মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ তুরানী ওমরাদেরকে অসন্তুষ্ট রেখেছিলেন এবং তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিপত্তিকে কোন কাজে লাগাননি। প্রতিভা নির্ণয়ে ও যোগ্যতা নিরূপণে সুনামের অধিকারী সম্রাট আলমগীর উপদেশ দিয়েছিলেন যে ঃ

"তুরানী সম্প্রদায় জাত যোদ্ধা।..........আক্রমণ পরিচালনা, অপরাধীকে পাকড়াও করা, কমান্ডো অভিযান ও লুণ্ঠন কার্যে তারা অতিশয় দক্ষ। সর্বাবস্থায় এই গোষ্ঠীকে আনুকূল্য দেয়া উচিত। কেননা অধিকাংশ সময় তাদের দ্বারা এমন কাজ উদ্ধার হয়, যা আর কারোর দ্বারা হয় না।"

কিন্তু বাহাদুর শাহ যৌবনকাল থেকেই এই গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ ছিলেন। গাজীউদ্দীন ফিরোজ জং-এর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল যে, বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে আলমগীরকে ক্ষেপিয়ে দিতে তিনিও ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর মন্ত্রী মুয়াযযম খান মুহাম্মদ আমীন খানের বিরুদ্ধে এই মর্মে দোষারোপ করতেন যে, একবার তাঁর চেষ্টায় আলমগীর মুয়াযযমকে তিরস্কার করেছিলেন এবং পদাবনতির শাস্তি দিয়েছিলেন। জুলফিকার খানও চেন কালীজ খানের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতেন এবং আলমগীরের আমল থেকেই উভয়ের মধ্যে মনকষাকষি চলে আসছিল। এসব প্রতিক্রিয়া মিলিত হয়ে বাহাদুর শাহের শাসনামলকে তুরানী ওমরাদের জন্য গঞ্জনার আমলে পরিণত করে। সে সময়ে ফিরোজ জংকে দাক্ষিণাত্য থেকে আহমদাবাদে বদলী করা হয়। আহমদবাদে তিনি শেষ অবধি ভগ্ন হৃদয়ে অবস্থান করেন। মুহাম্মদ আমীন খানকে মুরাদাবাদের ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। তিনিও এ কাজে খুশী ছিলেন না। চেন কালীজ খানকে যদিও বাহ্যত অনেক সমাদর করা হয়, আযমের প্রদত্ত 'ছয় হাজারী পদ এবং খানে দাওরানী' খেতাবে ভূষিত করা হয়, সেই সাথে অযোধ্যার সুবেদার ও লক্ষ্ণৌ-এর ফৌজদারও নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু শাহী

দরবারের অশোভন আচরণে তিনি এতটা মনোক্ষুণ্ন হন যে, ১১২৩ হিজরীর জিলহজ্জ মাসে মোতাবেক ১৭১১ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর সকল পদ থেকে ইস্তফা দেন, খেতাব বর্জন করেন এবং নিজের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি দরিদ্র লোকদের মধ্যে বন্টন করতঃ দরবেশের বেশ ধারণ করে নির্জনবাস অবলম্বন করেন।[১] বলতে গেলে এভাবে সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ বাহাদুর শাহের শাসনকালে স্থায়ীভাবে বিকল থেকে যায়।

খেতাব ও পদ বন্টনের হিড়িক

বাহাদুর শাহের আর একটা ত্রুটি ছিল এই যে, তিনি খেতাব ও পদবী বন্টনে এত উদারতা ও বদান্যতা দেখান যে, এ জিনিসগুলোর আর কোন মূল্যমান অবশিষ্ট থাকেনি। শোনা যায়, তিনি আল্লাহর কাছে মানত করেছিলেন যে, আমি যদি শাসন ক্ষমতা পাই, তবে কারোর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করবো না। এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে গিয়ে তিনি 'না' বলা নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। যে যা চেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নগণ্য থেকে নগণ্যতর লোকেরা অসংখ্য খেতাব লাভ করেছে। এমনকি ঐতিহ্যগত প্রথা লংঘন করে একই খেতাব একাধিক ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে। অত্যন্ত নিম্নমানের লোকেরা পাঁচ হাজারী, ছয় হাজারী সম্মানসূচক পদবী লাভ করেছে। খান বাহাদুর, নিযামুল মুল্‌ক, ফিরোজ জং, রায়, রাজা ইত্যাকার খেতাব এত সস্তা হয়ে গিয়েছিল যে, বড় বড় খেতাবধারীরা অসহায়ভাবে যত্রতত্র ঘুরতে থাকে। একবার হামিদুদ্দীন খান স্বীয় সেক্রেটারী কেশরী সিং-কে 'রায়' খেতাব দেয়ার আবেদন জানালে সম্রাট তা মঞ্জুর করেন এবং নিম্নরূপ মন্তব্য লেখেন ঃ

"ঘরে ঘরে যখন 'খান' এবং হাটে ঘাটে যখন 'রায়' বিরাজ করছে, তখন তোমার মন রক্ষার্থে এই 'গেদী'কেও (অথর্ব লোকটিকে) রায় খেতাব দেয়া হলো।"

ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে লোকেরা তাকে 'গেদী রায়' 'গেদী রায়' বলে ডাকতে শুরু করলো এবং দীর্ঘদিন যাবত এই খেতাব একটা কৌতুকের

---

১. এ সময় সম্রাট তাঁর জন্য বাৎসরিক ৪ হাজার রুপিয়া পেনশন নির্ধারণ করে দেন। পরে তাঁকে তাঁর পিতার গাজীউদ্দীন খান বাহাদুর ফিরোজ জং খেতাব প্রদান করে রাজকীয় চাকরীতে পুনঃ নিয়োগের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি নির্জনবাস ত্যাগ করেননি। মানসারাম লিখেছেন যে, তৎকালে তাঁর সংসার বিরাগ এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, কেউ সাংসারিক বিষয়ে কথা বললেই তিনি বিরক্ত হয়ে যেতেন। একটি ফারসী কবিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর মানসিক অবস্থা নিম্নরূপ ফুটিয়ে তোলেন ঃ

"নির্জনতাকে ভালোবাসা ও নীরবতা পালনে অভ্যস্ত হওয়া ছাড়া আমার আর করার কী আছে? পার্থিব চিন্তা মানুষকে উচ্চাভিলাসের ফাঁদে আটকায়। এই হীনতার ফাঁদ থেকে মুক্ত হওয়া ছাড়া আমার করণীয় কী আছে? বন্দেগীর পথ খুঁজতে গিয়ে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে নিজেকে উদ্ধার করেছি। সংসার ত্যাগী হয়ে ইবাদাত করা ছাড়া আমার বিকল্প কিছু নেই।" তৎকালে তিনি আলেম ও দরিদ্র লোকদের ছাড়া কারোর সাহচর্য পছন্দ করতেন না।

বিষয় হয়ে রইল। তৎকালে প্রাচ্যের রাজা বাদশাহরা খেতাব ও পদবী বিতরণ করতেন অত্যন্ত উঁচুমানের কৃতিত্ব ও সর্বাত্মক আনুগত্য প্রদর্শনের প্রতিদান স্বরূপ। ঐসব খেতাব ও পদবী লাভের অভিলাষে লোকেরা বড় বড় কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ হতো। কিন্তু খেতাব ও পদবী বিতরণে যখন আর মান ও মর্যাদার তারতম্য রইল না এবং নির্বিচারে তা দেয়া হতে লাগলো, তখন উৎসাহী মানুষকে সম্রাট ও সাম্রাজ্যের খাতিরে প্রাণোৎসর্গ করতে প্রেরণা দিতে পারে এমন কোন জিনিস অবশিষ্ট রইল না। খেতাব ও পদবী সস্তা হয়ে যাওয়ায় আরো একটা কুফল দেখা দিল এই যে, অতি নগণ্য শ্রেণীর লোকেরা উচ্চতর পদবী লাভ করে যখন উর্ধতন ওমরাদের সমপর্যায়ে উঠে এল, তখন আলমগীরের সময়কার বাছবিচার, মানমর্যাদার তারতম্য ও ভক্তি শ্রদ্ধার জাঁকজমক যারা দেখেছে সেইসব প্রাচীন আমীর ওমরা রাজ দরবার ত্যাগ করে নির্জন প্রকোষ্ঠে আশ্রয় নিল। কেননা নয়া নবাবগণ এসে স্বীয় অযোগ্যতা ও অশোভন আচরণ দ্বারা শুধু রাজনীতির অঙ্গনকেই কলুষিত করেননি বরং গোটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে পর্যন্ত নোংরা করে ছেড়েছেন। ঐতিহাসিকগণ চেন কালীজ খানের পদত্যাগ ও নির্জনবাসের জন্য এ জিনিসটাকেও একটা কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন।

ধর্মীয় কোন্দলের উস্কানী

বাহাদুর শাহের গুরুতর রাজনৈতিক ত্রুটিসমূহের মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি আপন শাসনকালের সূচনাতেই এই মর্মে নির্দেশ জারী করেন যে, নামাযের খুতবায় হযরত আলী (রা)-এর নামের সাথে "ওসী" [অর্থাৎ রাসূল (সা)-এর ওছিয়তের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত খলিফা] শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। এ নির্দেশ দ্বারা প্রকারান্তরে সাম্রাজ্যে সুন্নী ধারার পরিবর্তে শীয়া ধারা প্রবর্তনের ঘোষণা দেয়া হয়। ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্বের শুরু থেকেই সরকারী পর্যায়ে সুন্নী ধারা অনুসৃত হয়ে আসছিল এবং তার অধিকাংশ অধিবাসীও সুন্নী মুসলমান ছিল। তদুপরি আলমগীরের মত কট্টর সুন্নী সম্রাট ইতিপূর্বে ৫০ বছর যাবত ক্ষমতাসীন ছিলেন। এমন একটি দেশে বাহাদুর শাহ কর্তৃক স্বীয় শাসনকালের সূচনাতেই প্রকাশ্যে শীয়া মতবাদ অবলম্বন করা এবং জুময়ার খুৎবা পরিবর্তন করা রাজনৈতিক দিক দিয়ে একটা নিদারুণ নির্বুদ্ধিতার কাজ ছিল। এর ফলে ভারতের সকল মুসলমানের মনে সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে গেল। দিল্লী, আগ্রা এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে এ নিয়ে দাংগা সংঘটিত হলো। দিল্লীতে খুৎবা পরিবর্তনের নির্দেশ পৌছলে আসাফুদ্দৌলা আসাদ খান বললেন ঃ "ভারতে এমনটি হতে পারে না। এটা ইরান নয়।" আহ্মাদাবাদে জুময়ার খতীবের মুখ থেকে "ওসী" শব্দটা শোনামাত্রই মুসল্লীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মেম্বর থেকে টেনে নামিয়ে তাকে অপমান-

জনকভাবে হত্যা করলো। কাশ্মীরেও একইভাবে এক ইমামকে হত্যা করা হলো। লাহোরে দীর্ঘদিন যাবত জুময়ার খুৎবা বন্ধ রইল। কেননা আলেম সমাজ সর্বসম্মতভাবে এ ধরনের খুৎবা প্রদান ও শ্রবণ অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যখন সম্রাট স্বয়ং লাহোর পৌছলেন, তখন তিনি আলেমদেরকে আলাপ আলোচনার জন্য সাক্ষাতের আহবান জানালেন। এই আলেমদের মধ্যে হাজী ইয়ার মুহাম্মদ ছিলেন অন্যতম। আলোচনা চলাকালে তিক্ত বাদানুবাদও হলো। হাজী ইয়ার মুহাম্মদকে সম্রাট ধমক দিয়ে বললেন ঃ "তুমি কি সম্রাটকে ভয় পাও না ?" হাজী সাহেব জবাব দিলেন ঃ "আমি আল্লাহর কাছে চারটে জিনিস চেয়েছিলাম। তন্মধ্যে ইসলামের বিশদ জ্ঞান, পবিত্র কুরআন মুখস্ত করা এবং হজ্জ—এই তিনটে নিয়ামত আমি ইতিমধ্যেই অর্জন করেছি। এখন শুধু চতুর্থ নিয়ামত শাহাদাত অর্জন করা বাকী। এটা আমার প্রয়োজন।" শহরের মানুষ এত ক্ষুব্ধ ও ক্রুব্ধ ছিল যে, সকল গণমান্য নাগরিক এবং আফগান সরদাররা হাজী ইয়ার মুহাম্মদের নিকট সমবেত হয়ে এক লক্ষ সশস্ত্র লোক দিয়ে তাঁকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করে। স্বয়ং শাহজাদা আজীমুশশান এবং খাজেস্তা আখতার ওরফে জাহান শাহ গোপন বার্তা পাঠিয়ে তাঁকে সমর্থন দানের আশ্বাস দেন। সম্রাট সকল বিরুদ্ধবাদী আলেমকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর এবং লাহোরকে 'যুদ্ধক্ষেত্র' ঘোষণা করার নির্দেশ দিলেন। এর ফলে শাহজাদা মুইজ্জুদ্দীন জাহানদার শাহ আলেমদের সমর্থনে স্বীয় সেনাবাহিনী ও কামান বাহিনীকে সমবেত হবার নির্দেশ দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, রাজকীয় সৈন্যরা আলেমদের ওপর আক্রমণ চালালে আমি তাদের পক্ষে লড়াই করবো। এত বড় তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর সম্রাটের বোধোদয় হলো যে, একনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষ অধ্যুষিত কোন দেশে সরকারী ধর্মবিশ্বাস পাল্টানো এত সহজ নয়।

দাক্ষিণাত্যের নয়া সুবেদার পদ প্রবর্তন

হায়দারাবাদ বিজয়ের পর বাহাদুর শাহ্ দাক্ষিণাত্যের ৬টি প্রদেশকে একীভূত করে জুলফিকার খানকে তার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মন্ত্রী মোনেম খান এত বড় দেশকে এক ব্যক্তির শাসনাধীন করাকে অযৌক্তিক ও অকল্যাণকর আখ্যা দিয়ে খান্দেশ ও বেরার পাইন ঘাট এলাকাকে জুলফিকার খানের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে ফেললেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আওরংগাবাদ, বেদার, হায়দারাবাদ ও বিজাপুর—এই চারটে বড় বড় প্রদেশ জুলফিকার খানের শাসনাধীনে এসে গেল। এই চারটে প্রদেশ পূরনন্দী থেকে রাসকুমারী পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়ে বিস্তৃত। জুলফিকার খান আগেই মীর বখশী ও সহকারী নায়েব মুতলাক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবার সেই সাথে যুক্ত হলো পুরো দক্ষিণ ভারতের সুবেদারী। এ কাজটা বাহাদুর শাহের অদক্ষতা ও রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানহীনতার আরো একটা দৃষ্টান্ত। বলতে গেলে এ কাজটির মাধ্যমে তিনি

দাক্ষিণাত্যের ভবিষ্যত স্বাধীনতার পথ খুলে দিলেন। ইতিপূর্বে দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক প্রদেশের জন্য সম্রাটের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক সুবেদার নিযুক্ত হতো। কর্ণাটক বিজাপুর এবং কর্ণাটক হায়দারাবাদের ফৌজদারও সরাসরি সম্রাটের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হতো। দাক্ষিণাত্যকে প্রায় ৮টি প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছিল। এতে কখনো কোন বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও তা একটা প্রদেশ বা একটা প্রশাসনিক এলাকায় সংঘটিত হতো। অন্যান্য প্রদেশের সাহায্যে তা দমন করা সম্ভব হতো। গোটা দাক্ষিণাত্য এক সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়া দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু বাহাদুর শাহ এ ব্যাপারটা বুঝলেন না। তিনি এই বিভক্ত শক্তিকে একত্রিত করে এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করলেন। এই সম্মিলিত শক্তি এত ভয়ংকর হয়ে দাঁড়ালো যে, স্বয়ং সম্রাটের শক্তি ছাড়া এর মোকাবিলা করার ক্ষমতা সারা ভারতে আর কারোর রইল না। দাক্ষিণাত্যের শাসক বিদ্রোহ করলে পার্শ্ববর্তী কোন প্রদেশের শাসককে দিয়ে তা দমন করার আর কোন উপায় রইল না। এ ধরনের সম্ভাব্য কোন বিদ্রোহ দমন করতে হলে খোদ সম্রাটের সর্বশক্তি নিয়োগ করা ছাড়া গত্যান্তর ছিল না। আর সম্রাট যদি দুর্বল হন কিংবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকেন তাহলে এ অঞ্চলটির স্বাধীন হওয়া ঠেকাতে পারে এমন সাধ্য কারো ছিল না। বাহাদুর শাহ নিজের এই অবিজ্ঞচিত পদক্ষেপ দ্বারা স্বীয় সাম্রাজ্যের মোকাবিলায় আর একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বসলেন। সৃষ্টির শুরু থেকেই স্বভাবগতভাবে স্বাধীনতা প্রিয় গোটা দাক্ষিণাত্য অঞ্চলকে তিনি একটি একক কেন্দ্র ও একক শাসনকর্তার পদ দান করলেন। এরপর সেই পদটিতে একজন ধড়িবাজ ব্যক্তি এসে তাকে ভারত সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার বাস্তব পদক্ষেপ নিলেই হলো। জুলফিকার খান ছিলেন ক্ষমতালোভী। তাই দাক্ষিণাত্যে নিজের একচ্ছত্র ও নিরংকুশ শাসন প্রতিষ্ঠার সাধ তার প্রথম দিন থেকেই ছিল। কিন্তু নিখিল ভারতীয় রাজনীতিতে বাজিমাত করার উচ্চাভিলাস তাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, এই সুযোগকে তিনি লুফে নিতে পারলেন না। এরপর হোসেন আলী খানকে এই সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু তিনিও ছিলেন সর্বভারতীয় শাসন ক্ষমতা লাভের স্বপ্নে বিভোর। তাই দাক্ষিণাত্যের সংকীর্ণ ভূখণ্ডে তার স্বপ্ন ডানা মেলতে পারলো না। তথাপি যে নীতিগত ভুল করা হলো, আজ হোক কাল হোক, তার খেসারত দেয়া অবধারিত ছিল। সে খেসারত কিভাবে দিতে হয়েছিল, সেটা পরে বর্ণনা করা হবে।

মারাঠাদের সাথে আচরণ

শিবাজীর পৌত্র ও শম্ভার পুত্র রাজা সাহুর প্রতি আলমগীরের আমল থেকেই জুলফিকার খানের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আলমগীরের মৃত্যুর কিছুদিন

আগেই তিনি সাহুকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেন।[১] তাকে সাথে নিয়ে বখসিন্দা (কান্দানা) দুর্গ অভিযানে যান। সম্রাটের মৃত্যুর পর যখন আযম বাহাদুর শাহের সাথে যুদ্ধ করতে আহমদনগর থেকে আগ্রা অভিমুখে রওনা হন তখন জুলফিকার খান সাহুকে অনুকম্পা প্রদর্শনের সুপারিশ করেন। তিনি সাহুর মা, বোন ও ভাইকে জিম্মী হিসেবে নিজের কাছে রেখে এই শর্তে সাহুকে মুক্তি দেন যে, সে যদি মারাঠা রাজার গদী দখল করতে সক্ষম হয়, তাহলে মোগল সম্রাটের অনুগত থাকবে। সে সময় সাহুর চাচা রাম রাজার বিধবা স্ত্রী তারাবাই মারাঠাদের রাণী ছিল। সকল মারাঠা সরদার তার শাসন মেনে নিয়েছিল। কিন্তু যেই শিবাজীর আসল উত্তরাধিকারী সাহু মুক্তি পেল এবং মারাঠাদেরকে নিজের নেতৃত্ব মেনে নেয়ার ডাক দিল, অমনি মারাঠা জাতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। একটা বিরাট অংশ তারাবাই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহুর পক্ষ নিল এবং তারা ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে তাকে নিয়ে শিবাজীর গদীতে বসিয়ে দিল। তার বিপক্ষে ক্ষুদ্র হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী একটি গোষ্ঠী তারাবাইর আনুগত্য বজায় রাখলো এবং সাহুকে অনধিকার চর্চাকারী সাব্যস্ত করে তাকে মারাঠা জাতির রাজা হতে দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করলো। এ নিয়ে উভয় গোষ্ঠীতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং তা প্রায় ২২ বছর ধরে চলে।

এ পর্যন্ত জুলফিকার খানের কৌশল সফলতা লাভ করে। কেননা তিনি বিরোধী পক্ষের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দেন। কিন্তু এরপর তিনি যখন বাহাদুর শাহের সাথে কাম বখ্সের বিদ্রোহ দমনের জন্য হায়দারাবাদ যান, তখন সেখানে সাহুর একটি প্রতিনিধি দল বাহাদুর শাহের সাথে সাক্ষাত করে এবং জুলফিকার খানের মাধ্যমে এই মর্মে আবেদন জানায় যে, রাজা সাহুকে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশের রাজস্বের শতকরা ৩৪ ভাগ দেয়া হোক। এর বিনিময়ে সে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেবে এবং মারাঠীদেরকে লুঠতরাজ থেকে নিবৃত্ত রাখবে। জুলফিকার খান এই আবেদনের স্বপক্ষে প্রবলভাবে সুপারিশ করেন এবং বাহাদুর শাহ স্বীয় দুর্বলতার কারণে তা মঞ্জুর করেন।[২] কিন্তু ইতিমধ্যে তারাবাইও সম্রাটের নিকট নিজস্ব প্রতিনিধি দল

১. সাহু ১৬৮৯ সালে স্বীয় পিতা সম্ভাজীর সাথে বন্দী হয়ে আসে। তখন তার বয়স ছিল সাত আট বছর। তখন থেকেই সে আলমগীরের সাথে থাকতো। আলমগীর তাকে রাজা খেতাব ও সাত হাজারী পদে অভিষিক্ত করে রেখেছিলেন। তিনি তাঁকে অত্যধিক আদর স্নেহ করতেন। এই উপকার সে আলমগীরের মৃত্যুর পরও ভোলেনি। আযমের সঙ্গ ত্যাগ করে সে সর্বপ্রথম খুলদাবাদ গিয়ে আলমগীরের কবর জিয়ারত করে ও সেখানে গরীব দুঃখীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করে।

২. মায়াসেরুল উমারা গ্রন্থের লেখক শাহনেওয়াজ খান বলেন যে, সাহু শুধুমাত্র শতকরা ৯ বা ১০ ভাগরাজস্ব দাবী করেছিল আর তাও দাক্ষিণাত্যের ছয়টি রাজ্যে নয় বরং আওরংগাবাদ, বেরার, খান্দেশ, বেদার ও বিজাপুর এই পাঁচটি রাজ্যের। তবে উপরোক্ত তথ্য খাফী খানের বর্ণনা থেকে গৃহীত।

পাঠায় এবং সে মন্ত্রী মোনেম খানের মাধ্যমে আবেদন জানায় যে, আমাদেরকে শুধু শতকরা ১০ ভাগ রাজস্ব প্রদানের ঘোষণা দিলেই আমরা সকল দুষ্কৃতিকারীকে প্রতিহত করবো এবং শান্তি ও নিরাপত্ত রক্ষার নিশ্চয়তা দেবো। যেহেতু জুলফিকার খান সাহুকে সমর্থন দিচ্ছিলেন, তাই মোনেম খান তাঁর বিপক্ষে তারাবাইর প্রতিনিধি দলের পক্ষ নিলেন। সম্রাট এমন স্বভাবের লোক ছিলেন যে, কারুর আবেদনই অগ্রাহ্য করতেন না। এমনকি অনেক সময় সকাল বেলায় একজনের পক্ষে এবং বিকাল বেলায় ঐ ব্যক্তির শত্রুর পক্ষে ফরমান জারী করতেন। তাই তিনি জুলফিকার খান ও মোনেম খান কারোর কথাই অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। অগত্যা তিনি একটা নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি শতকরা দশ ভাগ রাজস্ব দেয়ার পক্ষে ফরমান জারী করে দিলেন বটে, তবে যতক্ষণ না উভয় পক্ষ যুদ্ধ করে মারাঠা রাজার গদীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী কোন্ পক্ষ তা নির্ধারণ না করবে, ততক্ষণ এই ফরমানের কার্যকারিতা স্থগিত রাখলেন।

যদিও এই সময়ে মারাঠারা তাদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং মোনেম খানের বিজ্ঞজনোচিত হস্তক্ষেপের দরুন (এ হস্তক্ষেপ তিনি সচেতনভাবে করেছিলেন না অবচেতনভাবে, তা জানা যায় না।) শতকরা দশ ভাগ রাজস্বের পক্ষে ফরমান লাভে সফল হয়নি। কিন্তু তাদের জন্য এটাই একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল যে, মোগল সম্রাট প্রথমবারের মত দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলোতে তাদের রাজস্ব আদায়ের অধিকার মেনে নিলেন। মোগল সম্রাট একথাও স্বীকার করে নিলেন যে, তাঁর রাজকীয় সরকার নিজ দেশে শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদেরকে প্রতিহত করার যোগ্যতা রাখে না, বরং এ কাজে সে মারাঠা রাজার মুখাপেক্ষী।

মারাঠা রাজা এসে মোগল সম্রাটের প্রজাদেরকে অত্যাচারীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করুক, লুটতরাজ বন্ধ করুক এবং রাজকীয় পুলিশ ও সৈন্যদের যা করণীয়, তা করুক—এটাই কামনা করলেন। একটা সুসংগঠিত ও আইনসম্মত সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো নিজ শাসনাধীন দেশে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা এবং জনগণের জানমালের হেফাজত করা। যে সরকার নিজে এ দায়িত্ব পালন করতে পারে না এবং তা পালন করতে অন্য কোন শক্তির মুখাপেক্ষী হয়, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের দেশ শাসনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে এবং শাসন কার্য পরিচালনার অধিকার থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে—একথাই ঘোষণা করে।

এমতাবস্থায় যে শক্তি সরকারের আসল দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম, সে-ই দেশ শাসনের অধিকারী। একথাই প্রকারান্তরে মেনে নেয়া হয়। কিন্তু বাহাদুর শাহের দৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রে শুধু এতটুকুই বিবেচ্য বিষয় ছিল যে, তিনি জুলফিকার

খানের সুপারিশ মেনে নেবেন, না মোনেম খানের সুপারিশ মঞ্জুর করবেন। এর চেয়ে বেশী কোন নিগূঢ় রাজনৈতিক তত্ত্ব বুঝবার তিনি চেষ্টাই করেননি। আর এই না বুঝার কারণে তিনি এমন একটা কাজ করে ফেললেন, যা মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে মারাঠাদের সামনে প্রথম পরাজয়ের স্বীকারোক্তি এবং ভবিষ্যতে আরো বহু পরাজয়ের পথ সুগম করার শামিল। সম্রাট আওরংগজেব যে চল্লিশ বছর ধরে শিবাজীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিলেন, সেটা শুধু এ জন্যই যে, শিবাজী ও তার উত্তরাধিকারীরা মোগল শাসিত অঞ্চলে অরাজকতা সৃষ্টি করে সরকারকে বুঝাতে চেয়েছিল যে, এ দেশের শান্তি-শৃংখলা আমাদের মুঠোর মধ্যে, মোগল সরকার যদি শান্তি চায় তাহলে আমাদেরকে রাজস্বের ভাগ দিক। আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করবো। পক্ষান্তরে আলমগীর তাদেরকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, আমার দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা আমারই হাতে নিবদ্ধ। যতক্ষণ আমি সম্রাট আছি, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা আমার দায়িত্ব। দেশের রাজস্ব আমার সরকারেরই প্রাপ্য—অন্য কারো নয়। এ দায়িত্ব এবং অধিকারে কেউ ভাগ বসাতে পারে না। এই কথার ভিত্তিতেই আলগমীর ও মারাঠাদের মধ্যে প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী যুদ্ধ চলে। শিবাজী, সম্ভাজী ও রাম রাজা এ জন্যই যুদ্ধ করতে করতে জীবন দিয়ে দেয়। তারা তাদের এই প্রগাভতা ও আস্ফালনের সামনে তাঁর মাথা নুইয়ে দিতে সক্ষম হয়নি। সবার শেষে তারাবাই ক্রমাগত আক্রমণ ও লুটতরাজ চালিয়ে এই দাবী আদায় করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেও সফল হয়নি।[১] এসব যখন সংঘটিত হয়েছে, তখন মারাঠারা ঐকবদ্ধ ছিল। কিন্তু বাহাদুর শাহের আমলে রাজকীয় সরকারের হাতে সেই একই সৈন্য, একই সেনাপতি, একই সমরাস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম বিদ্যমান এবং তার মোকাবিলায় মারাঠাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে। তাদের শক্তি দ্বিধাবিভক্ত এবং তারা স্বয়ং একে অপরকে কাবু করার চেষ্টায় লিপ্ত। এতদসত্ত্বেও মারাঠারা মোগল সম্রাটের কাছ থেকে সেই একই দাবী মঞ্জুর করিয়ে নিতে সক্ষম হলো—আর তাও তলোয়ারের বলে নয়। নিছক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। এর একমাত্র কারণ এটাই হতে পারে যে, তখন সরকারের মধ্যমণি আওরংগজেব নয়—বাহাদুর শাহ্।

---

১. ঐতিহাসিক আযাদ বলগ্রামী স্বীয় গ্রন্থ 'খাজানায়ে আমেরা'তে লিখেছেন যে, সর্বশেষে তারাবাইর আবেদনক্রমে সম্রাট বাহাদুর শাহ মারাঠাদের জন্য রাজস্ব থেকে শতকরা ৫ ভাগ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং দূত তা নিয়ে রওনাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অকস্মাৎ তিনি মত পাল্টে ফেলেন এবং তিনি স্বীয় ফরমান ফেরত নিয়ে তা ছিড়ে ফেলেন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে এই বক্তব্যই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্য কোন ইতিহাস থেকে এ তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় না। খাফী খান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন যে, "তারাবাইর দূতরা যতবারই দাক্ষিণাত্যের ছয়টি রাজ্যের রাজস্বের শতকরা ৯ ভাগ দেয়ার শর্তে আপোষ রফার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, ইসলামের মর্যাদার খাতিরে ততবারই সম্রাট তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

সম্রাট আওরংগজেব আপন জীবদ্দশায় মারাঠা দমন অভিযানকে অনেকটা সাফল্যের দ্বার প্রান্তে এনে রেখে গিয়েছিলেন। তাদের অধিকৃত সকল অঞ্চল, এমনকি শিবাজী যেখানে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই কোকন পর্যন্ত রাজকীয় বাহিনীর দখলে এসে গিয়েছিল। তাদের পার্বত্য দুর্গগুলোরও একটা বিরাট অংশ বিজিত হয়ে গিয়েছিল। মাত্র গুটিকয়েক দুর্গই তাদের হাতে অবশিষ্ট ছিল। একটি সুসংহত ও সুশৃংখল জাতিসত্ত্বা হিসেবে মারাঠা শক্তির বিলুপ্তি ঘটেছিল। তথাপি চাল চুলোহীন দাঙ্গাবাজ ও লড়াকু স্বভাবের মারাঠীরা সুদক্ষ সরদারদের নেতৃত্বে হাজার কি দু' হাজার জনের এক একটি লুটেরা বাহিনী গঠন করে আওরংগাবাদ, বেদার, বিজাপুর, বেরার, খান্দেশ, মালুহ ও গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তো এবং গ্রামে গ্রামে ও ছোট ছোট শহরে লুটতরাজ ও দুস্যবৃত্তি চালাতো। আশেপাশে কোথাও মোগল সৈন্যদের উপস্থিতি টের পেলেই সেখান থেকে তারা পালিয়ে যেত। যেখানে কোন শান্তিরক্ষী বাহিনী থাকতো না সেখানে কৃষিজীবি মানুষের কাছ থেকে সন্ত্রাসী কায়দায় জোর করে এক-চতুর্থাংশ কর আদায় করতো। সড়ক পথে চলাচলকারী বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোকে থামিয়ে তাদের পণ্যের এক-চতুর্থাংশ ছিনিয়ে নিত। সম্রাট আলমগীর এই লুটেরা দলগুলোকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সারা দেশে সেনাবাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মোগল সৈন্যদের সাথে এই লুটেরা গোষ্ঠীগুলোর সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। এ পরিস্থিতির কোন চূড়ান্ত পরিণতি ঘটার আগেই সম্রাট মৃত্যু বরণ করেন। আর সেই সাথেই শুরু হয়ে যায় মারাঠাদের মধ্যে এক সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ। এ গৃহযুদ্ধ আলমগীরের পুত্রদের গৃহযুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর ফলে কয়েক বছর মোগল শাসনাধীন অঞ্চলে মারাঠাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বন্ধ থাকে এবং তারা নিজেরা পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আলমগীরের উত্তরসূরীর পক্ষে মারাঠা সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে ভালো উপায় ছিল তারাবাই এর বিপক্ষে সাহুকে দাঁড় করিয়ে দেয়া এবং মোগল সম্রাটের অনুগত মারাঠা সরদারদের মাধ্যমে তাদেরকে সর্বপ্রকারের সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দেয়া। এ কাজটা করতে পারলে সাহু তারাবাইর দাপট চূর্ণ করতে পারতো। তারপর তাকে কোকন ও তার আশপাশের এলাকায় স্বায়ত্বশাসিত একটা আধাস্বাধীন করদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে তা মোগল সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধানে রেখে দেয়া যেত। অতপর সেই রাজ্যের হাতেই মারাঠা সরদারদেরকে ভূসম্পত্তি দিয়ে এতটা সচ্ছল ও স্বাবলম্বী করে দেয়ার দায়িত্ব অর্জন করা যেত, যাতে তাদের আর মোগল অঞ্চলে এসে লুটতরাজ চালানোর প্রয়োজন ও ইচ্ছা —কোনটাই না থাকে। এই কৌশল খানিকটা অবলম্বন করা হয়েছিল কিন্তু তা ছিল আধগিরি ধরনের। তাও ভালোভাবে ভেবে চিন্তে করা হয়নি। সাহুকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল বটে। তবে উপযুক্ত সময়ে দেয়া হয়নি। তাকে মুক্তি দেয়ার প্রকৃত সময় ছিল শিবাজীর উত্তরসূরী কে হবে, তা স্থির হওয়ার পর—গৃহযুদ্ধ

বেধে যাওয়ার পরে নয়। তা ছাড়া সাহুকে শুধু মুক্তি দেয়াই যথেষ্ট ছিল না। তাকে পুরোপুরি সামরিক ও আর্থিক সাহায্যও দেয়া উচিত ছিল, যাতে সে নিজের সাফল্যকে নিজের শক্তি ও চেষ্টার ফসল মনে করতে না পারে বরং সবসময় মনে করতে থাকে যে, রাজকীয় সাহায্যের ওপরই তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। তাকে ও তারাবাইকে যুদ্ধ করে উত্তরাধিকারের ফায়সালা করে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়াটাও ছিল একটা মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত। এর ফলে দু' পক্ষের এক পক্ষ যে, অপর পক্ষকে শক্তির জোরে দমিয়ে দেবে এবং তারপর বিজয়ী শক্তি গোটা মারাঠা শক্তির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, সেটা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অনিবার্য। বাস্তবিক পক্ষে হয়েছেও তাই। তাদেরকে এভাবে লড়াই করে ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে স্বয়ং মোগল সরকারেরই মধ্যস্থতা করে মীমাংসা করে দেয়া উচিত ছিল। সমস্যাটার এমনভাবে নিস্পত্তি করা উচিত ছিল, যাতে সেতারা ও কুলহাপুর —এই দু'টি রাজ্য দিল্লীর সমর্থনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতো। এতে করে প্রয়োজনের সময় একটির বিদ্রোহ দমনে অপরটিকে ব্যবহার করা যেত এবং দাড়িপাল্লার উভয় পাল্লাকে ওঠানো নামানো মোগল সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকতো। এই কৌশলটি পরবর্তীকালে নিযামুল মুল্ক দাক্ষিণাত্যের প্রথম সুবেদারীর আমলে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হবার আগেই তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয়বার যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে যান, তখন আর এ কৌশলটির সফলতা লাভের অবকাশ ছিল না।

হায়দারাবাদের অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পর ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে যখন বাহাদুর শাহ দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন জুলফিকার খান নিজের পক্ষ থেকে দাউদ খান পন্নীকে সহকারী সুবেদার নিযুক্ত করলেন।[১] এই ব্যক্তি তৎকালে জুলফিকার খানের অধীনে কর্ণাটক বিজাপুর এবং কর্ণাটক হায়দারাবাদের সেনানায়ক ছিলেন। একজন সেনানায়ক হিসেবে তিনি নিসন্দেহে একজন সুযোগ্য ব্যক্তি ও বীর পুরুষ ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে দাক্ষিণাত্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য সামরিক যোগ্যতার চেয়ে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার প্রয়োজন ছিল বেশী। অথচ দাউদ খান পন্নীর মধ্যে এটা ছিল না। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের সাথে মারাঠীদের মর্যাদার তারতম্য মোটেই বোঝেননি। তাই সাহু ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের পেছনে তিনি নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। আর এর ফলে মহারাষ্ট্রের শক্তির ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। এতে সাহুর শক্তি এত মজবুত হয়ে যায় যে, প্রয়োজনে কখনো যে তারাবাই এর গোষ্ঠীকে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে, সে সুযোগ প্রায় লোপ পায়। এভাবে

১. মুনিম খানের মৃত্যুর পর খান্দেশ এবং বেরার পাইনঘাটের সুবেদারীও তাঁকে দেয়া হয়। এভাবে তিনি দাক্ষিণাত্যের ৬টি প্রদেশেরই দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে বসেন।

মারাঠা রাজত্ব সুসংহত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর চেয়েও বড় যে ভুল তিনি করেন তা ছিল এই যে, মোগল সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই তিনি আপন এখতিয়ার বলে মারাঠাদেরকে দাক্ষিণাত্যের ৬টি প্রদেশে এক-নবমাংশ ও এক-চতুর্থাংশ কর আদায়ের অধিকার প্রদান করেন। এর বিনিময়ে তিনি মারাঠাদের সাথে এই মর্মে সমঝোতায় উপনীত হন যে, তারা দাউদ খান ও মোগল যুবরাজদের মালিকানাভুক্ত ভূসম্পত্তিতে কর আদায় করতে যাবে না। এ সমস্ত ভূসম্পত্তি ছাড়া বাদবাকী সকল মোগল শাসিত অঞ্চল থেকে স্বয়ং দাউদ খানের নায়েব হিরামন এক-চতুর্থাংশ কর আদায় করে সাহুকে দিতে লাগলো। অধিকাংশ মহলে[১] দাউদ খানের কর্মচারীরা মারাঠা সরদারদের সাথে স্বার্থের ভাগাভাগির ভিত্তিতে আপোষ রফা করে।

এসব মৌলিক ভুলত্রুটির কারণে কয়েক বছর পরেই দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের এমন প্রচণ্ড উৎপাত শুরু হয় যে তা শুধু দাক্ষিণাত্যে নয় বরং গোটা ভারত উপমহাদেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং মোগল সাম্রাজ্যকে ভেংগে খান খান করে দেয়।

৩—বাহাদুর শাহের পুত্রদের গৃহযুদ্ধ

এবার আমরা অন্য একটি যুগে পদার্পণ করবো, যেখান থেকে প্রকৃত অর্থে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। একথা সত্য যে, বাহাদুর শাহ আপন শাসনমলে অনেক ভুল করেছেন এবং কোন কোন ভুল এমন মারাত্মক ছিল যে, পরবর্তীকালে তার দরুন মোগল সাম্রাজ্যের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যক্তি। আর সাম্রাজ্যকে কোন রকমে ঐক্যবদ্ধ রাখা যায় অন্তত এতটা যোগ্যতা তার ভেতরে ছিল। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে কারোর এতটুকু যোগ্যতাও ছিল না। এই মরাণাপন্ন বৃদ্ধ সম্রাট মোগল সাম্রাজ্যকে কোন রকমে সামাল দিয়ে টিকিয়ে রাখলেও তার মৃত্যুর পর এই বিশাল সাম্রাজ্যকে যে কোন শক্তিই আর রক্ষা করতে পারবে না, তা সুনিশ্চিত ছিল। সম্রাট বাহাদুর শাহ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি ছিলেন ৬৫ বছরের বৃদ্ধ। তার জীবনী শক্তি তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কোন রকমে আরো চার পাঁচ বছর তা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে। অবশেষে ১১২৪ হিজরী সনের মুহাররম মাসে মোতাবেক ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর আয়ুষ্কাল নিঃশেষিত হয় এবং তিনি লাহোরে মৃত্যু বরণ করেন।

বাহাদুর শাহের পুত্রগণ এবং তাঁদের কলহ-কোন্দল

তাঁর পুত্রদের মধ্যে চারজন ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ঃ

---

১. প্রাচীন পরিভাষায় একটি একটি ক্ষুদ্র প্রশাসনিক অঞ্চল বা তহশিলকে মহল বলা হতো।

(১) মুইজ্জুদ্দীন—সম্রাট বাহাদুর শাহ সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পর যাঁকে জাহাঁদার শাহ খেতাব দিয়ে চাট্টা ও মুলতানের সুবেদার নিয়োগ করেন।

(২) মুহাম্মদ আযীম—এর খেতাব ছিল আযীমুশ শান এবং ইনি বাংলা ও বিহারের সুবেদার ছিলেন।

(৩) রফীউল কদর—ইনি রফীউশ্ শান খেতাবে ভূষিত এবং কাবুলের সুবেদার নিযুক্ত ছিলেন।

(৪) খাজেস্তা আখতার—ইনি জাহাঁশাহ খেতাব পান এবং মালুহ প্রদেশের সুবেদারীতে নিয়োজিত ছিলেন।

জৈষ্ঠ্য পুত্র জাহাঁদার শাহ প্রথম জীবনে একজন বীর সৈনিক ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের অভিযানগুলোতে এবং মুলতানের শাসনকালের প্রাথমিক যুগে তিনি অসাধারণ যোগ্যতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এ কারণে বাহাদুর শাহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সময় আযম এই যুবরাজকেই সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর এই মহৎ গুণগুলো লোপ পায় এবং তার স্থলে তার চরিত্র নানা দোষে কলংকিত হয়ে ওঠে। মদের নেশায় ও লাল কানোর নাম্নী এক নারীর প্রেমে বিভোর থাকা ছাড়া আর কোন জিনিসের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল না।[১] এসব কারণে বাহাদুর শাহ তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। তৃতীয় পুত্র রফিউশ্ শানের রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহের সাথে দূরতম সম্পর্কও ছিল না। তাঁর সমস্ত সখ ও ঝোঁক কেন্দ্রীভূত ছিল বিলাসিতা, জাঁকজমক, সাজসজ্জা এবং রকমারি পোশাক, দামীদামী রত্ন ও গহনাদি সংগ্রহ করা নিয়ে। এ কারণে যুবরাজ আজীমুশ শান তাঁকে ব্যংগবিদ্রূপ করে নিম্নরূপ শ্লোক বলতেন ঃ

"আয়না আর চিরুনী নিয়ে সর্বক্ষণ
নারীসম করে ভায়া কেশের যতন।"

বাহাদুর শাহ যখন যুবরাজ, তখন এই ছেলেই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে স্নেহধন্য। সে সময়ে দীর্ঘদিন যাবত তাকে একমাত্র উপদেষ্টা হিসেবে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখেন। পরে তার স্থলাভিষিক্ত হয় চতুর্থ পুত্র জাহাঁশাহ। জাহাঁশাহের দাপট এত বেড়ে যায় যে, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তাঁর সুপারিশক্রমেই মোনেম খান মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বাহাদুর শাহের শেষ জীবনে দ্বিতীয় পুত্র আজীমুশ্ শান তাঁর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র পরিণত হন। সম্রাট দেশ শাসনের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। রাজকীয় সিল তাঁর কাছেই থাকতো। মোনেম খানের পর ওজারতির যাবতীয় কাজ কার্যত তিনিই সম্পন্ন

১. এই নারী ছিল জনৈকা গায়িকা। এর সৌন্দর্যে জাহাঁদার শাহ এতই মোহিত ছিলেন যে, যাবতীয় সাংসারিক কাজকর্ম বাদ দিয়ে তাঁর সাথেই সর্বক্ষণ আমোদ-ফূর্তিতে লিপ্ত থাকতেন। শোনা যায়, এই রমণী তানসেনের বংশোদ্ভূত ছিল।

করতেন। সম্রাট থেকে শুরু করে সভাসদ ও রাজকর্মচারী পর্যন্ত সকলের ওপর ছিল তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব। তা ছাড়া বাংলা ও আগ্রার কোষাগার থেকে তিনি যে বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন হস্তগত করেন এবং যে পরিমাণ উপকরণ ও সৈন্য সামন্ত তিনি সংগ্রহ করেন, তার দরুন তিনি তাঁর অন্য সকল ভাই অপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। সাধারণভাবে লোকেরা তাঁকেই বাহাদুর শাহের পরবর্তী সম্রাট মনে করতো।

বাহাদুর শাহের জীবদ্দশাতেই এই চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শত্রুতার পর্যায়ে উপনীত হয়। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকেন। তবে আজীমুশ শানের ভয়ে সকলেই কম্পিত ছিলেন। সম্রাট যখন অন্তিম রোগশয্যায়, তখন একবার আজীমুশ শান ও জাহাঁদার শাহ উভয়ে তাঁর নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। আজীমুন শান হঠাৎ তলোয়ার বের করে তার সাথে খেলতে আরম্ভ করলেন। জাহাঁদার শাহ ভাবলেন যে, খেলার ওজুহাতে সে তাকে হত্যা করতে চায়। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে এমন বেশামাল-ভাবে পালাতে লাগলেন যে, দরজার সাথে ধাক্কা খেয়ে পাগড়ী পড়ে গেল। পাগড়ী ও জুতা দুটোই ফেলে রেখে তিনি নগ্ন পায়ে ও নগ্ন মাথায় স্বীয় পালকীর দিকে ছুটলেন এবং তাবুর দড়িতে বেধে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর আজীমুশ শানের দাপট দেখে তিনি স্থির করে ফেলেন যে, পিতার মৃত্যুর পর মুলতান চলে যাবেন এবং সেখানে নিজের সমর্থকদেরকে সংঘবদ্ধ করে ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। এভাবে অন্যান্য ভাইরাও ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েন এবং আজীমুশ শানের সিংহাসন লাভ নিশ্চিত বলেই প্রতীয়মান হয়।

জুলফিকার খানের চক্রান্ত

কিন্তু সকল ওমরাদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তি এবং সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি আজীমুশ শানের বিরোধী ছিলেন। এই ব্যক্তির শক্তি ও প্রতিপত্তি তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটালো। ইনি ছিলেন জুলফিকার খান। এই দু'জনের বিরোধ ও তার কারণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর কিছু দিন আগে তিনি আজীমুশ শানের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে ও তার সমর্থকদের অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুবরাজ তাঁর আপোষ প্রস্তাব অবাঞ্ছিত রূঢ় ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে দেন। এতে জুলফিকার খান রুষ্ট হন এবং জাহাঁদার শাহের দলে যোগ দেন। তিনি রফিউশ্ শান এবং জাহান শাহকেও জাহাঁদার শাহের সাথে সংঘবদ্ধ হবার আহবান জানান। অবশেষে তার চেষ্টায় তিন ভাই এই মর্মে একমত হন যে, জাহাঁদার শাহ বড় ভাই বিধায় তাঁকেই সম্রাট করা হবে এবং খুৎবা ও মুদ্রা তাঁর নামেই চালু হবে। রফিউশ শানকে কাবুল, কাশ্মীর, মুলতান, ঠাট্টা ও ভকর প্রদেশসমূহের শাসনভার দেয়া হবে। নর্বদা থেকে রাসকুমারী পর্যন্ত সমগ্র দাক্ষিণাত্য জাহাঁশাহের শাসনের আওয়াত আসবে। আর আজীমুশ শানের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে যেসব ধন-সম্পদ

পাওয়া যাবে, তা তিন ভাইয়ের মধ্যে সমান হারে বন্টন করা হবে। সেই সাথে একটা উদ্ভট শর্ত এও স্থির হলো যে, জুলফিকার খান এক সাথে তিন ভাই এরই মন্ত্রী থাকবেন। এটা এমন হাস্যোদ্দীপক প্রস্তাব ছিল যে, জুলফিক্কার খান রসিকতা করে বলতেন ঃ "তিনজন সম্রাট হওয়া তো তেমন বিস্ময়কর নয়। তবে তিন সম্রাটের এক মন্ত্রী হওয়া বড়ই অদ্ভুদ ব্যাপার।" যাহোক, এ চুক্তি কুরআনের ওপর লিখিত হলো এবং তিন ভাই এই চুক্তি মেনে চলার শপথ নিলেন। এই তিন ভাই এর সাথে জুলফিকার খানের মিলিত হওয়ায় সমগ্র পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পাল্টে গেল। কোথায় অর্থাভাব ও সৈন্য স্বল্পতার কারণে তিন ভাই ভয়ে কাঁপছিলেন। আর এখন জুলফিকার খানের নাম শুনতেই সৈন্যরা ও সমরনায়করা দলে দলে তাদের চারপাশে সমবেত হতে লাগলো। সফর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো, তখন এই তিন ভাই-এর কাছে সামষ্টিকভাবে ৫০ হাজার অশ্বারোহী ও ৬০ হাজার পদাতিক সৈন্য প্রস্তুত। আর তার বিপক্ষে আজীমুশ শানের বাহিনীতে ছিল সর্বসাকুল্যে ৩০ হাজার অশ্বারোহী ও ৩০ হাজার পদাতিক। নিজের এই দুর্বলতা আজীমুশ শান একেবারে শেষ মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন। তখন এর প্রতিকারের জন্য চেন কালীজ খানকে ত্বরিত বার্তা পাঠালেন যে, আমার সাহায্যের জন্য অবিলম্বে চলে এস। এ কৌশলটি নিসন্দেহে তাঁর জন্য উপকারী ছিল। কেননা সে সময়ে ওমরাদের মধ্যে জুলফিকার খানের মোকাবিলা করতে সক্ষম যদি কেউ থেকে থাকে, তবে সংসার ত্যাগী নির্জনবাসী এই চেন কালীজ খানই ছিলেন। কিন্তু আজীমুশ শান যখন তার সাহায্য চাইলেন, তখন আর প্রতিকারের সময় ছিল না। তাঁর বার্তা পেয়েই চেন কালীজ খান উপলব্ধি করলেন যে, সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে হলে এক্ষুণি সক্রিয় হওয়া দরকার। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের অনুগত লোকজনকে জড় করে তীব্র গতিতে দিল্লী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু সামান্য একটু অগ্রসর হতেই লাহোর থেকে খবর এলো, আজীমুশ শান পরাজিত ও নিখোঁজ। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি নিজের নিভৃত নিবাসে প্রত্যাবর্তন করলেন।

আজীমুশ শানের পরাজয়

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর আগেই জনগণ বলাবলি করতে শুরু করে দেয় যে, দেশে একটা প্রলয়ংকরী গোলযোগ আসন্ন হয়ে উঠেছে। যে রাতে সম্রাট মারা গেলেন, সেই রাতেই দু' একজন বাদে প্রত্যেক সরদার নিজ নিজ দলবল নিয়ে সিংহাসন প্রত্যাশী উভয় গোষ্ঠীর কোন একটির সাথে দেখা করতে রাজকীয় সেনাশিবির ছেড়ে চলে গেল। চাকর-বাকর সামরিক শিক্ষানবিশ এবং সেনানিবাসের পণ্য সরবরাহকারীরা চরম আতংকে ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ আসবাবপত্র মাথায় করে স্ত্রী ও সন্তানদের হাত ধরে শহরের দিকে পালিয়ে গেল। দেখতে দেখতে সমগ্র সেনানিবাস খালি হয়ে গেল এবং রাজকীয়

সেনানিবাস থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত এক সর্বগ্রাসী উত্তেজনায় ভরে উঠলো। সিংহাসন লোভী পুত্ররা সম্রাটের মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে প্রহর গুণছিল। মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই তারা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পাঁয়তারা শুরু করে দিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে সেনাবাহিনীর চলাচলও শুরু হয়ে গেল। আজীমুশ শান যদি সাহস করে প্রথম সুযোগেই প্রতিদ্বন্দ্বি গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ চালাতেন তাহলে সিংহাসন হয়তো তাঁর দখলেই এসে যেত। কিন্তু তিনি নিজে আক্রমণ চালানোর পরিবর্তে প্রতিরোধের পথ বেছে নিলেন এবং দুর্গের পরিখায় বসে বসে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে লাগলেন। তার সেনাপতিরা আক্রমণ পরিচালনার অনুরোধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেল। কিন্তু তিনি "ব্যারাকের ভেতরে থাক" অবিরাম এই নির্দেশ দিতেই লাগলেন। এর কারণ হয়তোবা এই ছিল যে, জুলফিকার খানের সেনানায়কোচিত দক্ষতায় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, নতুবা তাঁকে এরূপ মতিভ্রমে পেয়ে বসেছিল যে, বিরোধী পক্ষের কাছে টাকা পয়সা ও সামরিক সরঞ্জাম কম রয়েছে। তারা কেবল সৈন্য সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে। তাই তাদেরকে যদি সময় দেয়া হয় তাহলে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আজীমুশ শানের আর একটা ভুল ছিল এই যে, তিনি সিপাহী ও সেনাপতিদের আনুগত্য ক্রয় করার জন্য অর্থ ব্যয় করেননি, বরং কৃপণের মত আচরণ করে সকলের বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন। তার কার্পণ্য প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। লোকজন বলাবলি করতো যে, শাহজাদা আজীমুশ শানের রান্নাঘর সবচেয়ে ঠাণ্ডা জায়গা। মোটকথা, এসব ত্রুটিবিচ্যুতি দ্বারা তিনি জুলফিকার খানকে প্রস্তুতি গ্রহণের পুরো সুযোগ দেন। জুলফিকার খান পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে ১লা সফর, ১১২৪ হিঃ মোতাবেক ৯ই মার্চ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তিন যুবরাজের সম্মিলিত বাহিনীকে নিয়ে আজীমুশ শানের মোকাবিলায় উপস্থিত হলেন। এক সপ্তাহ ধরে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চললো। এই সময়ে আজীমুশ শানের সৈন্যরা ভগ্নোৎসাহ হয়ে একে একে রাতের অন্ধকারে পালাতে লাগলো। তাঁর ৬০/৭০ হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র ১০/১২ হাজার অবশিষ্ট রইল। [illegible] সফর এক ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আজীমুশ শানের সৈন্যদের বিরাট অংশ যোগ দেয়। কিন্তু স্বয়ং আজীমুশ শান নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু নড়লেন না। এর ফলে যারা এযাবত তাঁর সাথে ছিল তারাও তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। ১০ই সফরের চূড়ান্ত যুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল ছাড়া কেউ তার সাথে থাকলো না। কেউ কেউ তাকে বাংলাদেশে অথবা দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে গিয়ে কিছুকাল পরে প্রস্তুতি নিয়ে পুনরায় আক্রমণ চালানোর পরামর্শ দিল। কিন্তু তিনি বললেন যে, পালিয়ে গিয়ে দারা শেকোহ ও মুহাম্মদ সুজার যে পরিণতি হয়েছে, আমারও তাই হবে। অবশেষে তিনি যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধ চলাকালে তাঁর হাতির গায়ে একটা গোলা লাগলে হাতিটি এমন উর্দ্ধশ্বাসে রাবি নদীর দিকে ছুটলো যে, এরপর উক্ত হাতি ও তার আরোহী কারোরই কোন

পাত্তা পাওয়া গেল না। এরপর আজীমুশ শানের বড় ছেলে মুহাম্মদ করীমও গ্রেফতার ও নিহত হয়।

রফিউশ শান ও জাহাঁশাহের মৃত্যু

যুদ্ধ শেষে কনিষ্ঠ যুবরাজদ্বয় চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের দাবী জানালেন। কিন্তু ঐসব চুক্তি ও শপথ বাস্তবায়নের ইচ্ছাই ছিল না জুলফিকার খানের। তিনি কয়েক দিন টালবাহানা করে কাটানোর পর অবশেষে তাদেরকে সাফ জবাব দিয়ে দিলেন। রফিউশ শান ও জাহাঁশাহের জন্য যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকলো না। তবে তারা উভয়ে ঐকবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করলেন না। প্রথমে জাহাঁশাহ ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। ১৮ ও ১৯শে সফরের যুদ্ধে প্রথমে জাহাঁদার শাহের সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি স্বীয় প্রেয়সী লাল কানোয়ারকে নিয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হন। কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে জুলফিকার খান অগ্রণী হয়ে রণাঙ্গন পরিস্থিতি পাল্টে দেন এবং তার এক হামলাতেই জাহাঁশাহ পরাজিত ও নিহত হন। এবার দ্বিতীয় দাবীদার রফিউশ শানের পালা। তিনি এতক্ষণ নীরব দর্শক সেজে তামাশা দেখছিলেন। কেননা তাঁর জ্যোতিষী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত সিংহাসন তাঁর অধিকারেই আসবে। ২০শে সফর জুলফিকার খান আক্রমণ চালিয়ে তাঁকেও খতম করে দেন। অবশেষে ২১শে সফর ১১২৪ হিজরী মোতাবেক ২৯শে মার্চ ১৭১২ খৃষ্টাব্দ আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ মুইজুদ্দীন জাহাঁদার শাহকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়।

৪—জাহাঁদার শাহের শাসনকাল

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য জুলফিকার খান বাহাদুর শাহের সবচেয়ে অযোগ্য পুত্রকে মনোনীত করেছিলেন এই ভেবে যে, সে একজন আরামপ্রিয় ব্যক্তি। রাজকার্যের সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না। সে রাজত্ব চালাবে খাসমহলে আর আমি চালাবো সারা ভারতবর্ষে। কিন্তু যে ব্যক্তি দেশ ও জাতির ক্ষতি সাধন করে আপন স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় সে শেষ পর্যন্ত ক্ষতি ছাড়া আর কিছু লাভ করে না। জুলফিকার খান স্বীয় কার্যকলাপ দ্বারা দেশ ও সরকারকে তো ধ্বংস করেছিলই, সেই সাথে নিজের জন্যও সর্বনাশ ডেকে এনেছিল।

সাম্রাজ্যের পুরোনো কর্মকর্তাদের বিলুপ্তি এবং নয়া কর্মকর্তাদের অযোগ্যতা

সিংহাসনে আরোহণের পর জাহাঁদার শাহ জুলফিকার খানকে প্রধানমন্ত্রী এবং তার সেক্রেটারী সভাসদকে একান্ত সচিব নিয়োগ করেন। কিন্তু এ দু'টো পদ ছাড়া আর সকল পদে নিয়োগ করলেন এমন লোকদেরকে, যারা জুলফিকার খানের কট্টর বিরোধী ছিল। বিশেষভাবে যে পদবিন্যাসটা জুলফিকার খানের

পক্ষে একেবারেই অসহনীয় ছিল তা ছিল এই যে, জাহাঁদার শাহ স্বীয় দুধ ভাই কোকিলতাশ খান আলী মুরাদকে খান জাহান খেতাব দিয়ে প্রধান সেনাপতি এবং তাঁর ভগ্নিপতি খাজা হোসেন (কিংবা খাজা হাসান)-কে খানে দাওরান খেতাব দিয়ে দ্বিতীয় প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন। কৈশরে তিনি কোকিলতাশ খানকে কথা দিয়েছিলেন যে, আমি যখন সম্রাট হব তখন তোমাকে উজীর বানাবো। তখন থেকেই কোকিলতাশ ওজারতির প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু এক্ষণে জুলফিকার খানকে মন্ত্রী নিয়োগ করায় সে ও তার গোটা পরিবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সে প্রত্যেক ব্যাপারে মন্ত্রীর বিরোধিতা করতে লাগলো। স্বভাবতই এ ব্যাপারে তার ভগ্নিপতি খাজা হোসেন খানে দাওরান তার সহযোগী ছিল। এই দুই ব্যক্তি সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা ও যুদ্ধের রীতিনীতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। সেনাবাহিনীতে কোন ক্ষুদ্রতম পদ লাভেরও তারা উপযুক্ত ছিল না। তা সত্ত্বেও গোটা সেনাবাহিনী তাদেরই কর্তৃত্বে চলে গেল। তারা উভয়ে জুলফিকার খানের মত অভিজ্ঞ সেনাপতির মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে লাগলো এবং সম্রাটও তাদেরকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এর এমন ভয়াবহ পরিণতি দেখা দিল যে, সম্রাট স্বয়ং, খানজাহান, খানে দাওরান ও জুলফিকার খান—সকলেই একই ধ্বংসাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল।

বিদ্রোহী যুবরাজদের পক্ষাবলম্বনকারী যত নামকরা সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ছিল এবং যারা আলমগীরের আমল থেকেই এসব উচ্চপদে আসীন ছিল, তাদের অধিকাংশকে এক এক করে ধরে ধরে হত্যা করা হলো। যারা বেঁচে গেল, তাদেরকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়ার উদ্দেশ্যে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো। রোস্তম দিল খান, মুখলিস খান, ইলাহবর্দী খান প্রমুখকে অমানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। মাহাবত খান (সাবেক মন্ত্রী মোনেম খানের পুত্র) হামিদুদ্দীন খান (যিনি আলমগীরের শাসনামলে পুলিশ প্রধান ছিলেন এবং সম্রাটের ঘনিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন) সারফরাজ খান, আমীনুদ্দীন খান, সবলী প্রমুখকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সুযোগ্য লোকদের অভাবে সাম্রাজ্য যখন দিশেহারা, তখন এমন সব দক্ষ লোককে নিছক গৃহযুদ্ধের সময় বিরোধী যুবরাজদের সহযোগিতা করেছে এই ওজুহাতে নিঃশেষ করে দেয়া চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ ছিল। ইতিপূর্বে বাহাদুর শাহ ও আযমের গৃহযুদ্ধের সময়ও অনেক কর্মকর্তা আযমের পক্ষাবলম্বন করেছিল। কিন্তু বাহাদুর শাহ বিজয়ী হওয়ার পর তাদের সকলকে এই বলে ক্ষমা করে দেন যে, "এ ধরনের পরিস্থিতিতে লোকেরা কোন না পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। আমার পুত্র যদি দাক্ষিণাত্যে থাকতো, তাহলে সে তার চাচার পক্ষ না নিয়ে পারতো না।"

সম্রাটের দুষ্কৃতিকারী লালন প্রবণতা

১১২৪ হিজরীর জমাদিউল উলা মোতাবেক ১৭১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যখন জাহাঁদার শাহ্ লাহোর থেকে দিল্লী পৌঁছলেন, তখন থেকে জাহির হতে লাগলো একজন অথর্ব বিলাসপ্রিয় লোককে সম্রাট বানানোর কি পরিণতি হতে পারে। সম্রাট লাল কানোরকে ইমতিয়াজ মহল খেতাব দিয়ে সাম্রাজ্যের কোষাগারে এবং যাবতীয় পদমর্যাদায় তাঁর ও তাঁর আপনজনদের অবাধ অধিকার দিয়ে দিলেন। মননশীল ও গুণধর লোকদের জন্য শাহী আনুকুল্যের দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। আর লাল কানোরের আত্মীয়স্বজন যাদের সকলেই ছিল দুষ্ট প্রকৃতির, নীরাশয়, নির্বোধ, গুণ্ডাপাণ্ডা ও গায়ক-বাদক—তাদেরকে পাঁচ হাজারী ও সাত হাজারী পদবী এবং অসংখ্য খেতাব, পুরস্কার ও পতাকায় ভূষিত করলেন।[১] লাল কানোরের সহোদর ভাই খোশহাল খানকে আগ্রার এবং চাচাতো ভাই নিয়ামত খানকে মুলতানের সুবেদার নিয়োগ করেন। স্বয়ং লাল কানোরের ঘরোয়া ব্যয় নির্বাহের জন্য তাকে বার্ষিক দু' কোটি রুপিয়া উৎপাদনযোগ্য ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। তাকে রাজকীয় পতাকা, বাদ্য ও অন্যান্য সরকারী উপকরণ ব্যবহারের অনুমতি দেন, তার নামে মুদ্রা চালু করেন এবং নানাভাবে তাকে এত খুশী করেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরও নূরজাহানকে এত খুশী করতে পারেননি। তাঁর বাসনা পূরণে সম্রাট উন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। একবার লাল কানোর যমুনা নদীতে যাত্রীভর্তি এক নৌকা চলতে দেখে আক্ষেপ করে বললো যে, আমি আজ পর্যন্ত নৌকা ডোবার দৃশ্য দেখিনি। একথা শোনামাত্রই সম্রাট নির্দেশ জারী করলেন এবং যাত্রীভর্তি সেই নৌকাখানি তার সামনে এনে ডুবিয়ে দেয়া হলো। আলমগীরের কন্যা এবং জাহাঁদার শাহের ফুফু জিনাতুল নেসা লাল কানোরের সামনে উপস্থিত হতে অস্বীকার করায় জাহাঁদার স্বীয় ফুফুর মুখ পর্যন্ত দেখতে চাননি। স্বয়ং জাহাঁদারের দুই পুত্র আয়াজ্জুদ্দৌলা ও মুইজ্জুদ্দৌলাকে লাল কানোর পছন্দ করতো না বলে পিতা তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

রাজকীয় ভাবগাম্ভীর্যের বিলুপ্তি

যাবতীয় রাজকীয় রীতি প্রথা পদদলিত করে ৫২ বছরের এই ভিমরতি গ্রস্ত বৃদ্ধ প্রেমিক স্বীয় প্রেমিকা ও তার গায়ক গায়িকা ও বাদক বাদিকা সঙ্গীদের সাথে বসে মদ খেত ও নাচতো গাইত। সবাই মাতাল হয়ে যাওয়ার পর তার সাথে চড় থাপ্পড় মেরেও রসিকতা করতো। লাল কানোরের সাথে রথে

১. জাহাঁদার শাহ্ সরকারী খেতাব ও পদবীসমূহের মান এত নীচে নামিয়ে ফেলেন যে, নগণ্যতম চাকর বাকরকে মামুলী কাজের বিনিময়ে এমন এমন খেতাব ও পদ দান করতেন, যা ইতিপূর্বে বড় বড় কর্মকর্তারাও বহু বছরের সাধনা ছাড়া পেতো না। উদাহরণ স্বরূপ, খাস মহলের জনৈক পরিচারিকাকে তিনি "রেজা বাহাদুর রুস্তমে হিন্দ" খেতাব ও পাঁচ হাজারী পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন শুধু এই জন্য যে, একবার কিছু লোক জাহাঁদার শাহকে হত্যার চেষ্টা করলে সে সময় মত হৈচৈ করে প্রাসাদবাসীকে জাগিয়ে তোলে এবং লোকজন আসা পর্যন্ত সে আক্রমণকারীদের সাথে একাকিনী লড়তে থাকে।

বসে বাজারে যাওয়া এবং পানশালায় যেয়ে মদ খাওয়া তার নিত্যকার রীতি হয়ে দাঁড়ায়। একবার দু'জনে এক পানশালায় যেয়ে আচ্ছামত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যায়। আসবার সময় পানশালার বেয়ারারকে একটা গ্রাম জাইগীর হিসেবে দিয়ে অনুকম্পা দেখানো হয়। রথে আরোহণ করে উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রাসাদে পৌঁছার পর লাল কানোরকে তো পরিচারিকারা তুলে নিয়ে গেল কিন্তু সম্রাটকে তোলার কথা কারোর মনে থাকলো না। রথ চালক রথটা নিয়ে গাড়ীখানায় রেখে দিল। রাতের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কেটে যাওয়ার পর প্রাসাদে সম্রাটের খোঁজ পড়লো। অনেক খোঁজাখুজির পর ভারত সাম্রাজ্যের এই অধিপতিকে প্রাসাদ থেকে দু' মাইল দূরে অবস্থিত গাড়ীখানার এক রথে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেল। আলমগীরের মৃত্যুর পর তখনো পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়নি। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ আকাশ পাতাল ব্যবধান দেখে জনগণ সম্রাটের ওপর এত বিরূপ হয় যে, সম্রাট রাস্তায় বেরুলে কেউ তাকে এতটুকু সম্মান দেখাতো না এবং কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তার সম্মানার্থে সামান্য একটু পথও হেটে এগিয়ে দিত না।

মন্ত্রীর ভোগবিলাস

সম্রাটকে এমন ভোগের আনন্দে গা ভাসিয়ে দিতে দেখে জুলফিকার খানেরও ৫৯ বছর বয়সে ভোগবিলাসে মত্ত হবার সখ জাগলো। রাজকার্যের তদারকীর দায়িত্ব সভাচাঁদের হাতে অর্পণ করে সেও খাসমহলের আমোদ ফূর্তিতে যোগ দিল। এ দিকে সভাচাঁদের অশ্রাব্য ও অশ্লীল কথাবার্তায় সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং জুলফিকার খানের স্বভাব-চরিত্র এবং আচার-ব্যবহারও আলমগীরের আমলে যেমন ছিল, তেমন আর রইল না। সে খুবই অনুদার, সংকীর্ণমনা ও হিংসুটে হয়ে উঠলো। কারুর উপকার করতে সে খুবই মর্মযাতনা ভোগ করতো। কাউকে উন্নতির পথে এগুতে দেখলে তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে কিভাবে পেছনে ঠেলে দেয়া যায় তাই ভাবতো। তার প্রতিশ্রুতি ভংগ ও মিথ্যাচার সর্বশ্রেণীর মানুষের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এক সময় এই জুলফিকার খানই আলমগীরের সর্বোত্তম সামরিক অধিনায়ক ও নামকরা দক্ষ প্রশাসক ছিল। আর আজ তার অস্তিত্ব সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠলো এবং তার বিচক্ষণতা অথর্বতায় ও সুনাম দুর্নামে পর্যবসিত হলো।

মন্ত্রী ও সম্রাটের বিবাদ

এতদসত্ত্বেও জুলফিকার খানের মধ্যে তখনো এতটা চেতনা বিদ্যমান ছিল যে, সে জাহাঁদার শাহকে তাঁর মারাত্মক পরিণতি বহনকারী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখতো এবং কখনো কখনো লাল কানোর ও তার আপনজনদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতো। লাল কানোর ও তার আত্মীয় নিয়ামত খান

কালানউতকে[১] যখন মুলতানের সুবেদারীর সনদ দেয়া হয়, তখন জুলফিকার খান সেই সনদ আটকে রাখে এবং তার কাছে সনদ লেখার ফি হিসেবে কয়েক হাজার ঢোল ও তানপুরা দাবী করে। কালানউত এ ব্যাপারে লাল কানোরের মধ্যস্থতায় সম্রাটের কাছে নালিশ করে। সম্রাট জুলফিকার খানের কাছে কৈফিয়ত তলব করলে সে জবাব দেয় যে, প্রদেশগুলো শাসন করা ও রাজকীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা খান্দানী আমীর ওমরাদের কাজ ছিল, আর গানবাজনা করা ছিল নর্তকী ও কালানউতদের কাজ। এখন শাসনকার্যে যখন এদেরকেই লাগানো হচ্ছে, তখন আমীর ওমরাদেরকে কিছু ঢোল তানপুরাই সরবরাহ করা হোক—যাতে এই বেচারারা অন্তত গানবাজনা করে কিছু কামাই করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। লাল কানোরের সহোদর ভাই খোশহাল খান নতুন প্রাচুর্য ও নবাবীর নেশায় মত্ত হয়ে অভিজাত পরিবারের বউ ঝিদের মানসম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করে দিয়েছিল। একবার এ ধরনের একটা অপকর্মের অভিযোগ জুলফিকার খানের গোচরে আনা হলে সে সিপাই পাঠিয়ে খোশহাল খানকে ধরে নিয়ে আসে এবং নিজের সামনে এমন পিটুনি খাওয়ায় যে, সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। পরে তাকে সেলিমগড়ের দুর্গে আটক করে এবং তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।

চেন কালীজ খানের ঘটনা

চেন কালীজ খানের সাথে যে ঘটনা ঘটে সেটা আরো গুরুতর। দিল্লীর এক পতিতা লাল কানোরের সতিন হয়ে বসেছিল। ভারত সম্রাজ্ঞী হওয়ার পর লাল কানোর তাকে জোহরা বেগম নাম দিয়ে একটা জমী বরাদ্দ করিয়ে দিল। সে যখন হাতীর পিঠে আরোহণ করে লাল কানোরের সাথে সাক্ষাত করতে রাজপ্রাসাদে যেত, তখন বিরাট একদল ভৃত্য পরিবেষ্টিত হয়ে যেত। চলার পথে এসব ভৃত্য ভদ্র অভদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক পথিককে উত্যক্ত করতো। একবার তারা চেন কালীজ খান বাহাদুরের মুখোমুখী হলো। ইনি সে সময় রাজকীয় চাকুরী ছেড়ে নির্জনবাসী হয়েছিলেন। তাঁর বাহনের সাথে মুষ্টিমেয় ক'জন লোক ছিল। জোহরার ভৃত্যরা তাদেরকেও উত্যক্ত করলো। যখন তার বাহন চেন কালীজ খানের কাছাকাছি হলো, অমনি সে পর্দা থেকে মুখ বের করে বললো ঃ "অন্ধ ফিরোজ জং-এর পুত্র চেন কালীজ খান তুই নাকি রে ?" এই অসভ্যপনায় চেন কালীজ খান রেগে গেলেন এবং স্বীয় সহযাত্রী কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিলেন জোহরা ও তার সঙ্গীদেরকে শাস্তি দিতে। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তারা তরবারী বের করে তাদের ওপর হামলা চালালো। ভৃত্যদেরকে হতাহত করে তারা স্বয়ং জোহরাকেও হাতির পিঠ থেকে নামিয়ে আচ্ছামত লাথি ঘুষি মারে। এরপর চেন কালীজ খান সোজা চলে যান

১. কোন কোন ঐতিহাসিক এটিকে নিয়ামত খানের পরিবর্তে লাল কানোরের সহোদর খোশহাল খানের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। খোশহাল খানকে আগ্রার সুবেদার নিয়োগ করা হয়েছিল।

জুলফিকার খানের কাছে এবং তাকে পুরো ঘটনা অবহিত করেন। জুলফিকার খান তৎক্ষণাৎ সম্রাটকে বার্তা পাঠান যে, "আমরা অভিজাত পরিবারের সবাই অভিন্ন এবং আমি এই ব্যাপারে চেন কালীজ খানের পক্ষে।" এই বার্তার দরুন সম্রাটের কিছু করার সাহস হলো না। নচেত লাল কানোর তাঁকে প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করার চেষ্টার ক্রটি করেনি। এ ধরনের ঘটনাবলী একদিকে সকল আমীর ওমরা ও সাম্রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তাদের মনকে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও ঘৃণাজর্জরিত করে তোলে। অপর দিকে সম্রাট ও তার মন্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

পূর্ব ভারতে ফররুখ শিয়ারের বিদ্রোহ

রাজধানীতে যখন পরিস্থিতি এহেন বিস্ফোরন্মুখ পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন পূর্ব ভারতে আর একটি বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছিল। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর যে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে যুবরাজ আজীমুশ শান ও তাঁর পুত্র মুহাম্মদ করীমের নিহত হওয়ার বিবরণ আগেই দেয়া হয়েছে। আজীমুশ শান সম্রাট আওরংগজেবের আমলে বংগ ও বিহারের সুবেদার ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আলমগীর যখন তাঁকে আহমদনগরে তলব করেন, তখন সে তার দ্বিতীয় পুত্র ফররুখ শিয়ারকে বংগদেশের তত্ত্বাবধানে রেখে যায়।[১] বাহাদুর শাহের আমলে আজীমুশ শান আর বাংলা ও বিহারের যাওয়ার সুযোগ পায়নি। যুবক ফররুক্ষ শিয়ার তার পিতার অবর্তমানে বাংলাদেশেই থেকে যায়। ১১২২ হিঃ সালে বাহাদুর শাহ দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে আয়াজুদ্দৌলা খানে আলমকে (খানে জাহান কোকিলতাশ আলমগিরীর পুত্র) বাংলার সহকারী সুবেদার করে পাঠান এবং ফররুখ শিয়ারকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। ফররুখ শিয়ার রাজমহল থেকে রওনাও হয়েছিল। কিন্তু পিতা ও পিতামহের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না। তাই সে ঢিমে তেতালা গতিতে চলতে থাকে। পাটনা পর্যন্ত পৌছার পর সে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর খবর পেল। সে আর কোন নির্দেশের অপেক্ষা না করে পাটনাতে স্বীয় পিতা আজীমুশ শানের রাজত্ব ঘোষণা ও তাঁর নামে খুৎবা ও মুদ্রা চালু করে দিল। কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই সে জানতে পারলো যে, আজীমুশ শান জাহাঁদার শাহের কাছে পরাজিত হয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছেন। প্রথমে তো সে খুবই হতভম্ব হয়ে পড়লো এবং দাক্ষিণাত্য কিংবা বাংলাদেশে পালানোর কথা ভাবতে লাগলো। কিন্তু তাঁর মা ও কতিপয় বন্ধু তাকে ঝুঁকি নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দিল। সে অনুসারে সে কোন সাজসরঞ্জাম ও প্রস্তুতি ছাড়াই ১১৩৪ হিঃ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৭১২ খৃঃ এপ্রিল মাসে নিজেকে দিল্লীর সম্রাট বলে ঘোষণা করলো। সে সময় তার সাথে মাত্র ৪০০ সৈন্য ছিল। যেসব প্রতাপশালী আমীর ওমরা তার পিতার আনুকূল্য পেয়ে উচ্চতর পদ লাভ করেছিল, তারা তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলি

১. ফররুখ শিয়ার ৯ই রমজান, ১০৯৪ হিঃ মোতাবেক ১১ই সেপ্টেম্বর ১৬৮৩ খৃঃ দাক্ষিণাত্যের আওরংগাবাদে জন্মগ্রহণ করে।

খান, বাংলা প্রদেশের সহকারী সুবেদার আয়াজ্জুদ্দৌলা খানে আলম, সারবলন্দ খান[১] আটাওয়ার ফৌজদার আলী আসগর খান, কাড়া মানিকপুরের ফৌজদার সিলা রাম নাগর প্রমুখ সকলেই তাকে সমর্থন দিতে অস্বীকার করলো। এমতাবস্থায় সে আজীমাবাদের (পাটনা) সুবেদার সৈয়দ হোসেন আলী খানের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালো। তাঁর মাও হোসেন আলী খানের কাছে অত্যন্ত করুণভাবে কাকুতি মিনতি জানালো। অগত্যা হোসেন আলী খান এলাহাবাদের সুবেদার স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাসান আলী খানকে সাথে নিয়ে তার সাহায্যে এগিয়ে এলো।

ফররুখ শিয়ারের সমর্থনে সৈয়দ পরিবার

প্রসিদ্ধ সৈয়দ পরিবারের এই দুই ভাই ইতিহাসে "রাজা বানানো কারিগর" নামে খ্যাত। এরা উভয়ে ঐ পরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। সম্রাট আকবরের আমল থেকেই সৈয়দ পরিবারের বীরত্ব ও সমর দক্ষতার দিক জোড়া খ্যাতি ছিল। তাদের পিতা সৈয়দ আবদুল্লাহ খান আলমগীরের আমলে বিজাপুর ও আজমীরের সুবেদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সৈয়দ হাসান আলী খান আলমগীরের আমলে সুলতানপুর নাদারবার, সিউনী ও দাক্ষিণাত্য আওরংগাবাদের ফৌজদার এবং সৈয়দ হোসেন আলী রানথাম্বোর ও হাণ্ডোরা বিয়ানার ফৌজদার ছিলেন। ১৬৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন আলমগীর যুবরাজ মইজ্জুদ্দীন (জাহাঁদার শাহ)-কে মুলতানের সুবেদার নিযুক্ত করেন, তখন এই দুই ভাইকে তাঁর সাথে পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁর সাথে বনিবনা না হওয়ায় উভয়ে লাহোর চলে যান। এই সময় থেকেই তাদের পক্ষ থেকে জাহাঁদার শাহের বিরোধিতার সূচনা হয়। আলমগীরের মৃত্যুর পর যখন শাহ আলম বাহাদুর শাহ সিংহাসন দখলের চেষ্টায় পেশোয়ার থেকে লাহোর পৌছেন, তখন তিনি একজনকে তিন হাজারী ও অপরজনকে দুই হাজারী পদ দিয়ে সাথে নেন। জাজাও-এর যুদ্ধে উভয়ে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এর প্রতিদানে উভয়কে চার হাজারী পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। বড় ভাই হাসান আলী খানকে সৈয়দ আবদুল্লাহ খান খেতাব দেয়া হয়। কিন্তু যুবরাজ জাহাঁদার শাহ ও প্রধানমন্ত্রীর পুত্র খানাজাদ খানের বিরোধিতার কারণে তারা চাকুরী পাননি এবং বেশ কিছুকাল বেকার থাকতে বাধ্য হন। অবশেষে ফররুখ শিয়ারের পিতা যুবরাজ আজীমুশ শান তাদেরকে সহায়তা করেন। তিনি সৈয়দ আবদুল্লাহ খানকে স্বীয় সহকারী হিসেবে এলাহাবাদ প্রদেশে এবং সৈয়দ হোসেন আলী খানকে বিহার প্রদেশে নিয়োগ দান করেন। এ থেকেই ফররুখ শিয়ারের সাথে তাদের সখ্যতার সূচনা ঘটে। জাহাঁদার শাহ সিংহাসনে আরোহণের পর সৈয়দ আবদুল্লাহ খানকে এলাহাবাদ থেকে অপসারণ করে সৈয়দ রাজী মুহাম্মদ খানকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। নয়া সুবেদার সৈয়দ আবদুল গাফফার খান

১. এই ব্যক্তি আজীমুশ শানের দুধ ভাই ছিল। এই সম্পর্কের কারণেই সে পদোন্নতি পেয়েছিল।

নামক এক ব্যক্তিকে স্বীয় সহকারী নিযুক্ত করে পাঠান। কিন্তু আবদুল্লাহ খান তাকে রুখে দাঁড়াম এবং তাকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। এবার জাহাঁদার শাহ স্বীয় কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে উদ্যোগী হলেন এবং আবদুল্লাহ খানকে সুবেদার হিসেবে মেনে নিয়ে সনদ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ খানের মনে আগে থেকেই যে ক্ষোভ দানা বেধেছিল, তা আরো ঘনীভূত হলো এবং তিনি ফররুখ শিয়ারের সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য হাসান আলী খানের অনুরোধে সম্মতি দিলেন।

ফররুখ শিয়ারের অন্যান্য সমর্থক

এ সময়ে আরো কিছু লোক ফররুখ শিয়ারের পক্ষে যোগ দেয় এবং তারা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন খাজা আসেম। ইতিপূর্বে তিনি আজীমুশ শানের প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ফররুখ শিয়ারের সাথে শৈশবে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি মল্ল যুদ্ধ, তীর নিক্ষেপ, ঘোড় সওয়ারী এবং অনুরূপ অন্যান্য খেলায় তার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। তার ঘনিষ্ঠতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, ফররুখ শিয়ারের অন্যান্য সাথীরা আজীমুশ শানের কাছে সে সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ফলে আজীমুশ শান বাহাদুর শাহের মৃত্যুর কিছুদিন আগে খাজা আসেমকে লাহোরে ডেকে পাঠান। জাহাঁদার শাহ ও আজীমুশ শানের যুদ্ধের সময় এই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আজীমুশ শান নিহত হওয়ার পর তিনি প্রাণ নিয়ে আগ্রার দিকে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকে সরাসরি ফররুখ শিয়ারের কাছে পৌছেন। এখানে আসার পর সাবেক সম্পর্ক পুনর্বহাল হয় এবং ফররুখ শিয়র তাকে আশরাফ খান খেতাব দিয়ে দেওয়ানে খাস ও তোপখানার দারোগা পদে নিযুক্ত করেন। তিনি তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও সহচরে পরিণত হন। খাজা আসেম সভাসদগিরীতে সুদক্ষ ছিলেন এবং স্বল্প বিদ্যার অধিকারী হয়েও মিষ্টভাষী ও বাহ্যত সদাচারী হওয়ার কারণে অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। তাই ফররুখ শিয়ারের মেজাজের ওপর তার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল। ওবায়দুল্লাহ নামক অপর একজন তুরানী বংশোদ্ভূত স্বল্প বিদ্যার ধর্মীয় নেতা ফররুখ শিয়ারের বিশিষ্ট সুহৃদ ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি ভারতে এসেছিলেন। সম্রাট আলমগীর প্রথমে তাঁকে জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকা) ও পরে আজীমাবাদের (পাটনা) বিচারপতি নিয়োগ করেন। এই সময়ে আজীমুশশানের সাথে এবং বিশেষভাবে ফররুখ শিয়ারের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তরুণ যুবরাজের ওপর তিনি গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। পরবর্তীকালে তাকে শরিয়তুল্লাহ খেতাব প্রদান করা হয়। উল্লিখিত দুই ব্যক্তি খাজা আসেম ও ওবায়দুল্লাহ ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে যে ভূমিকা রাখেন আগামীতে তার বর্ণনা দেয়া হবে।

ফররুখ শিয়ারের প্রথম সাফল্য

জাহাঁদার শাহের কাছে যখন একের পর এক খবর আসতে থাকে যে, বিহার ও এলাহাবাদের সুবেদারদ্বয় ফররুখ শিয়ারের পক্ষে সক্রিয় সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে এবং সে সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়াজ্জুদ্দীনকে জমাদিউস্সানী ১১২৪ হিঃ মোতাবেক জুলাই ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ৫০ হাজার সৈন্য সহকারে আগ্রা অভিমুখে পাঠান, যাতে করে ফররুখ শিয়ারের অগ্রযাত্রা যথাসময়ে রোধ করা যায়। কিন্তু সৎ মা লাল কানোয়ের সাথে তার সম্পর্ক ভালো না থাকার কারণে সম্রাটও তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি খাজা হোসেন খানে দাওরান ও লুৎফুল্লাহ খান সাদেককে তার আতালীক (সামরিক সচিব) করে পাঠান। জুলফিকার খান এই পদক্ষেপের কঠোর বিরোধিতা করেন। কেননা উভয় সামরিক সচিব সমর বিদ্যা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। খানে দাওরান তো কখনো রণাঙ্গনই দেখেননি। স্বয়ং যুবরাজ আয়াজ্জুদ্দীন সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্বে তার সাথে দু' ব্যক্তিকে সহযোগী করে দেয়ায় ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন। বিশেষ করে তারা যখন নিছক সহযোগী নন, বরং তার ওপর কর্তত্বশীল ছিলেন। কিন্তু কোকিলতাস খানের প্রভাবে সম্রাট মন্ত্রী ও যুবরাজ উভয়ের মতের বিরুদ্ধে কাজ করলেন। এর ফল দাঁড়োলো এই যে, আয়াজ্জুদ্দীন মনে মনে যুদ্ধ বিমুখ হয়ে উঠলেন এবং সেনাবাহিনী পরিচালনার ভার কার্যত এমন লোকদের হাতে থাকলো, যারা ৫০ হাজার তো দূরের কথা, ৫০ জন সৈন্য পরিচালনারও যোগ্য ছিল না।

শাবান (সেপ্টেম্বর) মাসে ফররুখ শিয়ার পাটনা থেকে ২৫ হাজার সৈন্য সাথে করে রওনা হলেন। পথিমধ্যে হোসেন আলী খান ও সৈয়দ আবদুল্লাহ খান নিজ নিজ বাহিনী সমেত তার সাথে মিলিত হলেন। এই সম্মিলিত বাহিনী আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করলো। ওদিকে আয়াজ্জুদ্দীন আগ্রায় বসে সময়ের অপচয় করতে লাগলেন। তাঁকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল্লী থেকে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি এক কদমও এগুলেন না। অবশেষে যখন প্রবলভাবে চাপ দেয়া হলো, তখন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' করতে করতে কচ্ছপ গতিতে রওনা হলেন। ইতিমধ্যে তার এই যুদ্ধবিমুখ মনোভাব গোটা সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি সেনাবাহিনী ও কামান বাহিনীর অনেক অফিসার ফররুখ শিয়ারের সমর্থকদের সাথে গোপন পত্রালাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এভাবে তারা আগেই ষড়যন্ত্র পাঁকায় যে, মোকাবিলার সময় তারা ২০ হাজার সৈন্য ভাগিয়ে নিয়ে ফররুখ শিয়ারের বাহিনীর সাথে যোগ দেবে। এ পরিস্থিতিতে উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখী এগুতে থাকে। শাওয়ালের শেষের দিকে এলাহাবাদ ও আটাওয়ার মধ্যবর্তী খাজরা নামক স্থানে দুই বাহিনী মুখোমুখী শিবির স্থাপন করে। ২৯শে শাওয়াল মোতাবেক ২৮শে নভেম্বর যুদ্ধের দিন ধার্য হয়। কিন্তু ২৮ ও ২৯ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে

পরামর্শ সভা বসে। এতে খাজা হোসেন খানে দাওরান এবং লুতফুল্লাহ খান সাদেক যুবরাজকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। তিনি পালাতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, তৈমুর বংশের কোন ব্যক্তি আজ পর্যন্ত বিনা যুদ্ধে ময়দান ত্যাগ করেনি। তখন খানে দাওরান লাল কানোর ও কোকিলতাশ খানের জাল চিঠি দেখায়। এতে লেখা ছিল যে, "সম্রাট মারা গেছে। যুবরাজ আয়াজুদ্দীন যদি এক্ষুণি চলে আসে তবে সে সিংহাসন লাভ করবে।" এর ফল যা হবার কথা ছিল তাই হলো। মধ্যরাতে আয়াজুদ্দীন ও তার উভয় সামরিক সচিব মুষ্টিমেয় কিছুলোক সাথে নিয়ে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে গেল। আর ৫০ হাজার সৈন্য রসদপত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সবকিছু শত্রুর করুণা নির্ভর হয়ে রইল।

প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য জাহাঁদার শাহের প্রস্তুতি

এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে জাহাঁদার শাহের চৈতন্যোদয় হলো। তিনি স্বয়ং হানাদার বাহিনীর মোকাবিলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিশ্বাসঘাতকরা পরামর্শ দিল যে, দূরে যাওয়ার দরকার নেই। তোগলকাবাদের (দিল্লী থেকে ৮ মাইল দক্ষিণে) বসেই মোকাবিলা করলে চলবে। কিন্তু তিনি আগ্রা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেনাবাহিনীকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। সেনাবাহিনীর অবস্থা তখন শোচনীয়। এগারো মাস ধরে বেতন বন্ধ। তদুপরি যুদ্ধ সরঞ্জাম, অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রয়োজনীয় উপকরণের নিদারুণ ঘাটতি। কোষাগারে যা কিছু ধন-সম্পদ ছিল, তা সম্রাটের বিলাসব্যসনে প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। জমীদার ও কর্মচারীরা ক্ষমতার হাত বদল ও কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখে রাজস্ব আদায়ে ব্রতী হয়নি। প্রায় এক বছর যাবত ভারতের কোষাগারে কোন অঞ্চল থেকে কোন রাজস্ব জমা পড়েনি। কিন্তু এখন সৈন্য সংগ্রহ করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তাই কোষাগারের অবশিষ্ট অর্থ ব্যয় করার পর সোনা-রূপার যাবতীয় আসবাব ও তৈজসপত্র, মনিমুক্তার গহনা, এমনকি ছাদ ও প্রাচীরের স্বর্ণখচিত নকশাসমূহ পর্যন্ত তুলে বিক্রি করা হলো। এতেও যখন সংকুলান হলো না, তখন শাহী গুদামের দরজা খুলে দেয়া হলো এবং নগদ অর্থের বদলে সৈন্যদের মধ্যে খাদ্য শস্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিতরণ করা হলো। এভাবে কোন রকমে ৮০ হাজার সৈন্য যোগাড় করা গেল। এসব প্রস্তুতি চলাকালে তাৎক্ষণিকভাবে আগ্রার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন বিচক্ষণ লোক নিয়োগ করার প্রয়োজন অনুভূত হলো, যাতে সম্রাটের পৌঁছার আগেই ফররুখ শিয়ার আগ্রা দখল করে না বসে। এ কাজের জন্য রাজকীয় ওমরাদের মধ্যে অনুসন্ধান চালালে চেন কালীজ খানের চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কাউকে পাওয়া গেল না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজ দরবারের ভাবগতিক দেখে চেন কালীজ খান বাহাদুর শাহের আমলেই সংসার ত্যাগী হয়ে যান। তারপর থেকে এ যাবতকালের মধ্যে তিনি একবার মাত্র রাষ্ট্রীয়

কার্যকলাপে অংশ নেয়ার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে আজীমুশ শানের সমর্থনে (কারণ বাহাদুর শাহের পুত্রদের মধ্যে তিনি যথার্থই সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন) ক্ষুদ্র একটি সেনাবাহিনী নিয়ে দিল্লী থেকে অল্প কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যেই তিনি জানতে পারলেন যে, জাহাঁদার শাহ জয় লাভ করেছেন, অমনি দিল্লী ফিরে গিয়ে আবার সাবেক নিভৃত কোষ্ঠে আশ্রয় নেন। অতপর আবার যখন যুবরাজ আয্যাজুদ্দীনকে ফররুখ শিয়ারের মোকাবিলায় পাঠানো হয় এবং যুবরাজ আগ্রায় নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন, তখন আসাদ খানের মাধ্যমে জুলফিকার খান চেন কালীজ খানের সাথে আপোষ রফা করলেন এবং তার সাবেক খেতাব ও পদ পদবী পুনর্বহাল করে তাঁকে আগ্রা পাঠালেন। কিন্তু এত বড় একজন নামকরা সেনাপতিকে আয্যাজুদ্দীনের মত এক অনভিজ্ঞ ছোকরা এবং খাজা হোসেন ও লুত্‌ফুল্লাহ খান সাদেকের মত নিরেট মূর্খ লোকের অধীনস্থ করে দিয়ে তার কাছ থেকে বড় রকমের সামরিক কৃতিত্ব আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। বাস্তবে হলোও তাই। তিনি চুপচাপ আগ্রায় গিয়ে বসে রইলেন এবং সক্রিয়ভাবে কিছুই করলেন না। এবার পুনরায় তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলো আগ্রার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। অপর দিকে তুরানী সেনানায়কদের মধ্যে চেন কালীজ খানের পরেই যিনি সবচেয়ে দক্ষ সেই মুহাম্মদ আমীন খান চেন বাহাদুরকেও সারহিন্দ ডেকে আনা হলো এবং রাজকীয় বাহিনীর একটি অংশের অধিনায়ক করা হলো।

জাহাঁদার শাহের পরাজয়

১১২৪ হিজরী সনের জিলকদ মোতাবেক ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাজধানীর তদারকীর ভার আসাদ খানের হাতে অর্পণ করে জাহাঁদার শাহ ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে আগ্রা অভিমুখে রওনা হলেন। জিলহজ্জ মাসের শুরুতে এই বাহিনী আগ্রার নিকটবর্তী সমুগড়ে গিয়ে তাঁবু স্থাপন করলেন। এখানেই আওরংগজেব দারা শেকোহকে পরাজিত করেছিলেন। অপর দিকে ফররুখ শিয়ারও প্রায় একই সময়ে শমুগড় থেকে উত্তরপূর্ব দিকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত ইতিমাদপুরে গিয়ে থামলেন। উভয় সেনাবাহিনীর মধ্যে যমুনা নদী আড়াল হয়ে রইল। প্রায় এক সপ্তাহ যাবত উভয় বাহিনী মুখোমুখী চুপটি মেরে রইল। কেউ নড়াচড়া করলো না। ফররুখ শিয়ারের নিষ্ক্রিয়তার কারণ ছিল তার সৈন্য ও সামরিক সাজসরঞ্জামের কমতি। আর জাহাঁদার শাহের নিস্তব্ধতার কারণ ছিল এই যে, তার নিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিল না, আর তার সেনাপতিদের মধ্যে পরস্পরে প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। জুলফিকার খান ও কোকিলতাস খান পরস্পরের কট্টর দুশমন ছিল। এঁদের একজন যে রায় দিত, অপরজন তার বিরোধিতা করাকে যেন কর্তব্য মনে করতো। তৃতীয় গোষ্ঠী ছিল তুরানী সমর নায়কদের। উপরোক্ত

দু'জনই এদেরকে অগ্রগামী হতে এবং কোন উল্লেখযোগ্য সামরিক কৃতিত্ব দেখানোর সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিল না। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একদিকে মুহাম্মদ আমীন খান ও চেন কালীজ খানের মনে জাহাঁদার শাহের সমর্থনে যেটুকু আবেগ জন্মেছিল তা আবার নষ্ট হয়ে গেল এবং ফররুখ শিয়ারের বন্ধু ওবায়দুল্লাহ খান ওরফে শরিয়তুল্লাহ খান গোপন পত্রালাপের মাধ্যমে দু'জনকেই ফররুখ শিয়ারের সমর্থক বানিয়ে ফেললো। অপর দিকে জুলফিকার খান ও কোকিলতাস খানের পারস্পরিক বিরোধের কারণে আদৌ যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করাই সম্ভব হলো না। এক সপ্তাহ পর্যন্ত রাজকীয় সেনাবাহিনী নিষ্ক্রিয় পড়ে রইল। অবশেষে সৈয়দ আবদুল্লাহ খান ও সৈয়দ হোসেন আলী খান বিপক্ষ দলের অজান্তে সমগ্র সেনাবাহিনী নিয়ে যমুনা পার হয়ে চলে এল। ১৩ই জিলহজ্জ মোতাবেক ১৭ই জানুয়ারী ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ সংঘটিত হলো। প্রথম দিকে জাহাঁদার শাহ বিজয়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো এবং ফররুখ শিয়ারের পরাজয় নিশ্চিত মনে হতে লাগলো। কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে সৈয়দ আবদুল্লাহ খান একটি দুর্ধর্ষ সেনাদল নিয়ে ঠিক জাহাঁদার শাহের অবস্থান স্থলে আক্রমণ চালালো। এই কৌশলটি এমন অব্যর্থ প্রমাণিত হলো যে, সামান্য কিছুক্ষণ প্রতিরোধ করার পর জাহাঁদার শাহের উদ্যম ভেঙ্গে পড়লো এবং তিনি লাল কানোরকে সঙ্গে নিয়ে সোজা দিল্লী পালিয়ে গেলেন। জুলফিকার খানের পরিকল্পনা ছিল এই যে, সে যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে বসে তামাশা দেখতে থাকবে। যখন কোকিলতাস খান ও তার দলবল যুদ্ধ করে খতম হয়ে যাবে, তখন চূড়ান্ত মুহূর্তে সে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয়ের কৃতিত্ব নিয়ে যাবে। কিন্তু জাহাঁদার শাহের পলায়নে তার এই স্বার্থপ্রণোদিত কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল এবং সে রণাঙ্গনে একাই দাঁড়িয়ে রইল। তার বন্ধুরা তাকে পরামর্শ দিল যে, আপনি নিজেই ফররুখ শিয়ারের সাথে যুদ্ধ করুন এবং তাকে পরাজিত করে ভারত সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে যান। কেননা রাজত্ব কারো উত্তরাধিকার নয়। কিন্তু সে বললো যে, এমন কাজ করলে আমার ও আমার পরিবারের ওপর নেমকহারামীর কলংক লেগে যাবে। কেউ কেউ পরামর্শ দিল যে, দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান এবং দাউদ খানের সাহায্য নিয়ে পুনরায় যুদ্ধ করুন। কিন্তু সভাচাঁদ বললো যে, বৃদ্ধ পিতাকে দুশমনের মুঠোর মধ্যে রেখে নিজে জান বাঁচিয়ে পালানো কাপুরুষতার কাজ। অবশেষে আর কোন গত্যান্তর না দেখে সেও রাতের আঁধারে দিল্লী পালিয়ে গেল। এভাবে ফররুখ শিয়ারের বিজয় পূর্ণতা লাভ করলো।

৫—ফররুখ শিয়ারের শাসনকাল

১৪ই জিলহজ্জ মোতাবেক ১১ই জানুয়ারী ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ফররুখ শিয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। চেন কালীজ খান, মুহাম্মদ আমীন খান এবং অন্যান্য যেসব সেনানায়ক সক্রিয়ভাবে জাহাঁদার

শাহের সমর্থন থেকে বিরত ছিলেন, তাদেরকে ক্ষমা করে নিজের কর্মচারী হিসেবে গ্রহণ করলেন। জিজিয়া রহিত করার ঘোষণা দিলেন এবং সৈয়দ আবদুল্লাহ খানকে দিল্লী অধিকার করার জন্যে দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ খান ১৭ তারিখ আগ্রা থেকে রওনা দিয়ে ২৫ তারিখ দিল্লীর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেন। দিল্লীতে তখন আসাদ খান গভর্ণরের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। জুলফিকার খান রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়। এরপর স্বয়ং জাহাঁদার শাহও তার আশ্রয় নিতে চলে আসেন। জুলফিকার খানের অভিমত ছিল এই যে, জাহাঁদার শাহকে সাথে নিয়ে মুলতানে, কাবুলে অথবা দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যাওয়া উচিত এবং পুনরায় যুদ্ধ করে ভাগ্য পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু আসাদ খান সেটা পছন্দ করলেন না। তিনি এমন ন্যক্কারজনক কৌশল অবলম্বন করলেন যে, জাহাঁদার শাহকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন এবং সৈয়দ আবদুল্লাহ খানের নিকট নিজের ও জুলফিকার খানের পক্ষ থেকে আনুগত্যের অংগীকারনামা পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে অনায়াসে আবদুল্লাহ খানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। সাবেক সম্রাট ও তার সমর্থকরা তাঁর নিয়ন্ত্রণে এলো এবং রাজধানী অধিকৃত হলো।

আসাদ খান ও জুলফিকার খানের শোচনীয় পরিণতি

এরপর স্বয়ং ফররুখ শিয়ার আগ্রা থেকে যাত্রা করলেন। ১৫ই মুহাররম তিনি দিল্লীর নিকটবর্তী বারাপুলাতে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন। এখানে আসাদ খান ও জুলফিকার খান করজোড়ে সম্রাটের নিকট ক্ষমা চাইতে হাজির হলো। এই দুই পিতাপুত্রকে সৈয়দ আবদুল্লাহ খান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তারা যদি তাঁর মধ্যস্থতায় সম্রাটের কাছে উপস্থিত হন তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের প্রাণ রক্ষা করবেন। পক্ষান্তরে শরিয়তুল্লাহ খান ছিল একজন অতিশয় সংকীর্ণমনা ও নীরাশয় ব্যক্তি। প্রাচীন সেনানায়কদেরকে সপরিবারে ধ্বংস করতে হবে এই ছিল তার পণ। কেননা তা না হলে তার মত নিম্নস্তরের লোকদের উচ্চতর মর্যদায় অধিষ্ঠিত হওয়া দুষ্কর ছিল। তাই সে একদিকে সম্রাট ফররুখ শিয়ারকে স্বীয় পিতা আজীমুশ শান ও ভাই মুহাম্মদ করীমের হত্যার প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করলো। অপর দিকে জুলফিকার খান ও আসাদ খানকে কুরআনের শপথ করে আশ্বস্ত করলো যে, সে সুপারিশ করে তাদের উভয়ের ক্ষমা তো আদায় করে দেবেই সেই সাথে তাদের পদমর্যাদাও বহাল রাখবে। তাই পিতাপুত্র এহেন প্রতারণার শিকার হয়ে আবদুল্লাহ খানের পরিবর্তে শরিয়তুল্লাহ খানের মাধ্যমে সম্রাটের কাছে হাজির হলো। সম্রাট তাদের সাথে অত্যন্ত নৃশংস আচরণ করলেন। তিনি জুলফিকার খানকে হত্যা করালেন এবং আসাদ খানকে তার সমস্ত সহায় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বৃদ্ধ বয়সে বিলাপ করে দিন কাটানোর জন্য জ্যান্ত ছেড়ে দিলেন।

ফররুখ শিয়ারের দিল্লী প্রবেশ

পরের দিন কারা ভোগরত সাবেক সম্রাট জাহাঁদার শাহের ছিন্ন মস্তকও দিল্লী থেকে এসে গেল। ১৭ই মুহাররম নয়া সম্রাট এক ভয়াল ভংগীতে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। সবার আগে ছিলেন তিনি স্বয়ং, আর মাত্র এক মাস আগে যিনি এ দেশের সম্রাট ছিলেন তার ছিন্ন মস্তক যাচ্ছিল তাঁর পেছনের এক হাতির পিঠে। অন্য একটি হাতির পিঠে রক্ষিত ছিল সাবেক সম্রাটের খণ্ডিত লাশ, আর তার লেজে বাঁধা ছিল জুলফিকার খানের ঝুলন্ত মরদেহ। আর যিনি ৩০ বছর ধরে সম্রাট আলমগীরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং যিনি সম্রাট শাহজাহানের প্রতাপান্বিত শাসনকালের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, সেই ৯০ বছরের বুড়ো আসাদ খান সবকিছু হারিয়ে সীমাহীন শোকদুঃখে মুহ্যমান হয়ে মাতম করতে করতে যাচ্ছিলেন সবার পেছনের এক পালকিতে চড়ে।[১] এই শিক্ষাপ্রদ মিছিলটি দিল্লীর জনগণের অশ্রুসিক্ত নয়নের সামনে দিয়ে অতিক্রান্ত হলো এবং তারা বুঝতে পারলো যে, এবার তাদের শাসনভার যে সরকারের হাতে পড়েছে, তা আর যাই হোক, কোন মানুষের সরকার নয়। এরপর যারা ফররুখ শিয়ারের পিতার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল কিংবা অংশ নিয়েছিল বলে তিনি সন্দেহ পোষণ করেন, তাদের সকলকে তিনি হয় কারারুদ্ধ, নতুবা হত্যা, অথবা চোখ উপড়ে অন্ধ করে দিতে শুরু করেন। তার জুলুম অত্যাচারে জনগণের মধ্যে এমন আতংক ছড়িয়ে পড়ে যে, সম্রাট আলমগীর ও বাহাদুর শাহের আমলের উর্ধতন কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ যখন তার দরবারে যেত, তখন পরিবার পরিজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেত। আর যদি কেউ জীবিত ফিরে আসতো, তবে সে প্রচুর সদকা ও মান্নত দিত।

ফররুখ শিয়ারের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ

ফররুখ শিয়ার সিংহাসন লাভের পর যাদের সাহায্যে তার এই সাফল্য অর্জিত হয়েছিল তাদের সকলকে উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেন। সৈয়দ আবদুল্লাহ খানকে কুতবুল মুলক, ইয়ামীনুদ দৌলা, জাফর জং, সিপাহ সালার ও ইয়ারে ওয়াফাদার খেতাবে ভূষিত করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সৈয়দ হোসেন খানকে উমদাদুল মুলক, আমীরুল উমারা, ফিরোজ জং ও সিপাহ সরদার খেতাব প্রদান এবং প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন। খাজা আসেমকে সামসামুদ্দৌলা, খানে দাওরান বাহাদুর ও মানসুরে জং খেতাব প্রদান এবং রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করেন। বিচারপতি আবদুল্লাহকে (অর্থাৎ শরিয়তুল্লাহ খানকে) মুতামাদুল মুল্ক, মীর জুমলা,

১. এহেন শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া এই পরিবারটি আসলে মোগল সাম্রাজ্যের আমীর ওমরাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিল। আসাদ খান ছিলেন আমীনুদ্দৌলা আসফ খানের জামাতা, সম্রাট শাহজাহানের ভায়রা এবং সম্রাট আওরংগজেবের আপন খালু। আর জুলফিকার খান সম্রাট আওরংগজেবের আপন খালাতো ভাই ছিলেন। সর্বাধিনায়ক শায়েস্তা খানের মেয়ে এবং আলমগীরের মামাতো বোনের সাথে তার বিয়ে হয়।

মুয়াজ্জম খানে খানান বাহাদুর ও মুজাফফর জং খেতাব দেন। অধিকন্তু বিশেষ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক এবং রাজকীয় গোসলখানা ও ডাক বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করেন। এসব লোক ছাড়া তুরানী আমীরদেরকেও বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেন। কারণ একেতো তারা সাবেক সম্রাটের আমলে নিগৃহীত ছিলেন। তদুপরি তাদের গোপন সাহায্যে ফররুখ শিয়ার উপকৃত হয়েছিলেন। মুহাম্মদ আমীন খানকে চেন বাহাদুর, ইতিমাদুদ্দৌলা ও নুসরাত জং খেতাব ও সহকারী সেনাপতি পদ দান করেন। তাঁর পুত্র কামরুদ্দীন খানকেও একটি সেনাদলের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। চেন কালীজ খানকে স্থায়ীভাবে নির্জনবাস থেকে বের করে আনা হয় এবং তাকে সাত হাজারী পদবী ও নিযামুল মুলক বাহাদুর ফাতাহ জং খেতাব দিয়ে দাক্ষিণাত্যের ৬টি প্রদেশের সুবেদার নিযুক্ত করা হয়। এ ছাড়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলোতেও সম্রাটের হীতাকাংখী ব্যক্তিবর্গকেই নিয়োগ করা হয়। এঁদের অধিকাংশই আলমগীর ও বাহাদুর শাহের আমলে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিলেন। তাই বাহ্যত সাম্রাজ্যের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে না চলার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সম্রাটের নিজের অযোগ্যতা, তার সভাসদ ও উপদেষ্টাদের অথর্বতা এবং সঠিক পদে সঠিক লোক নিয়োগ না করার ভুল—এই তিনটে উপাদান মিলিত হয়ে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। আর এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি প্রথম দিন থেকেই দেখা দিতে শুরু করে।

ফররুখ শিয়ার ও তার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চরিত্র

বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, শাসকসুলভ দক্ষতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা—এর কোনটাই ফররুখ শিয়ারের ছিল না। উপরন্তু তার মেজাজ মর্জিরও কোন স্থীতি ছিল না। কানে কম শুনার কারণে অন্যের বুঝা ও শুনার ওপর নির্ভরশীলতা, সেই সাথে কাপুরুষতা ও ভীরুতা তার বৈশিষ্ট্য ছিল। কে কি ধরনের মেধা, যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং কে কোন্ মর্যদার মানুষ, তা চেনা ও বুঝা একজন রাষ্ট্রনায়কের অত্যাবশ্যকীয় গুণ। অথচ এ গুণটি তার মধ্যে একেবারেই ছিল না। তিনি নিজের চারপাশে অসৎ, তোষামোদী ও কুচক্রী লোকদেরকে একত্রিত করেছিলেন এবং তারা তাঁকে যে দিকে চাইত নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাতো। তার উপদেষ্টা ও সভাসদদের মধ্যে মীর জুমলার ব্যক্তিত্ব ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী। ভীষণ ধড়িবাজ, হিংসুটে, কপট ও ষড়যন্ত্রী স্বভাবের এই ব্যক্তির হাতে ফররুখ শিয়ার দু' বছর পর্যন্ত কলের পুতুলের মত নাচতে থাকেন। যদিও নিজের পরিচিত ও সাধারণ অভাবী লোকদের উপকার সাধনে তিনি উদার ছিলেন এবং অনেকেই তার দ্বারা উপকৃত হতো। কিন্তু তিনি এরূপ বিচিত্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন যে, কেউ তার

চেয়ে উচ্চতর পদে উঠে গেলে তাকে একেবারে সর্বনিম্নস্তরে নামিয়ে দিতেন আর যারা অধোপতিত, তাদেরকে এতটা ওপরে তুলে দিতেন যে, স্বয়ং তাঁর কিছুটা নীচে থাকতো এবং নিজের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষায় তাঁর কৃপার ওপর নির্ভরশীল থাকতো, তিনি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের তাগিদে যোগসাজশে লিপ্ত হন এবং চক্রান্তের এমন ব্যাপক ফাঁদ বিস্তার করেন যে, সেই ফাঁদে জড়িয়ে তিনি স্বয়ং, তার বিরোধীরা এবং সম্রাট-সকলেই ধ্বংস হয়। ফররুখ শিয়ার স্বীয় সেনাপতি ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনেও ভুল করেছিলেন এবং তার পরিণামও তার নিজের ও সাম্রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। সন্দেহ নেই যে, সৈয়দ আবদুল্লাহ খান এবং সৈয়দ হোসেন আলী খান বীরত্বে, দানশীলতায়, মহানুভবতায়, সাহসিকতায় এবং অন্য সকল সৎগুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে সেই সৎবুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক যোগ্যতা ছিল না, একটা বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসন চালাতে যা অত্যাবশ্যক। তাদের গোটা পরিবার তরবারী চালনায় ওস্তাদ ছিল এবং তারা নিজেরাও এ ক্ষেত্রে কারোর চেয়ে পেছনে ছিলেন না। কিন্তু তরবারী চালনা ছাড়া তারা আর কোন কাজেরই যোগ্য ছিলেন না। সম্রাট আকবরের আমল থেকে বাহাদুর শাহের আমল পর্যন্ত তাদেরকে এ কাজেই নিয়োজিত রাখা হয়। এর চেয়ে বেশী সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য তাদেরকে কখনো উপযুক্ত মনে করা হয়নি, সুযোগও দেয়া হয়নি। সৈয়দ পরিবারের সমগ্র ইতিহাস সাক্ষী যে, রাজনীতি, রাজ্য পরিচালনা ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাজে কোন রকম ঝোঁক রাখে, এমন এক ব্যক্তিও এই পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেনি। এই দুই ভাইও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাদের ব্যাপারে আলমগীরের আমলে [illegible] খান পদোন্নতির সুপারিশ করেছিলেন। মানুষের যোগ্যতা ও গুণাগুণ নির্ণয়ে দূরদর্শিতায় আলমগীরের জুড়ি ছিল না। তিনি মন্তব্য করেন যে, সৈয়দ পরিবারের প্রতি মমত্ব ও ভালোবাসা পোষণ আমার এবং প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের অংশীভূত। কিন্তু তাদেরকে এমন পদোন্নতি দেয়া সমীচীন নয় যাতে তারা মতিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারেন। এতে আমার ইহকাল ও পরকাল দু'টোই বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এই সৈয়দ পরিবারটির কাউকে অপ্রত্যাশিত পদোন্নতি দিলে সে দাম্ভিক হয়ে পড়ে, নিজের যথাযথ অবস্থান ভুলে গিয়ে অধিকতর উচ্চাভিলাষী স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায় এবং উচ্ছৃংখল আচরণে লিপ্ত হয়।" এমনকি এ পরিবারটিকে কেন্দ্র করে বিপদাশংকা অনুভব করে স্বীয় মৃত্যুকালীন অছিয়তনামাতেও আলমগীর লিখেছিলেন যে ঃ

"'বারেহার পরম ভাগ্যবান সৈয়দ পরিবার সম্পর্কে আত্মীয় স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও' পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা উচিত। যতদূর সম্ভব তাদেরকে সম্মান ও আনুকূল্য দিতে হবে। 'আমি তোমাদের কাছে আপনজনদের প্রতি অনুকম্পা ছাড়া আর কোন প্রতিদান চাই না।' কুরআনের এই উক্তি অনুসারে এই পরিবারকে ভালোবাসা নবুয়াতের প্রতিদান হিসেবে

বিবেচিত। [কেননা সৈয়দ পরিবার রসূল (সা)-এর বংশধর] এ ব্যাপারে কোন ত্রুটির প্রশ্রয় দেয়া চাই না। কারণ এতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত। তাই বলে সৈয়দ পরিবারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতাও অবলম্বন করা উচিত। হৃদয় দিয়ে ভালোবাসায় কোন কমতি থাকা চাই না। তবে বাহ্যিক পদমর্যাদায় তাদেরকে বেশী এগিয়ে দেয়া সমিচীন নয়। কেননা তারা অধিকতর প্রতিপত্তিশালী অংশীদার হবার অভিলাশী, এমনকি গোটা দেশ কুক্ষিগত করার মতলবও তাদের রয়েছে। সামান্য শৈথিল্য দেখালেও পরে পস্তাতে হবে।"

সম্রাট আলমগীরের এই ভবিষ্যদ্বাণী এই দুই ভাই-এর ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। তাদেরকে যখন সাধারণ সৈনিকের কাতার থেকে বের করে ওজারতী ও প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করা হলো, তখন তাদের মধ্যে অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও স্বেচ্ছাচারমূলক মনোভাব জন্ম নিল এবং তারা নিজেদেরকে সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ও সম্রাটকে নিজেদের দাবার গুটি ভাবতে লাগলো। বিরোধীরা তাদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে অক্ষম হয়ে গোপন ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশের পথ অবলম্বন করলো এবং সাত বছর ব্যাপী বিরামহীন দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ক্ষমতার রশী টানাটানি চলতে থাকলো। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত সাম্রাজ্যকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তার ভিত্তি নড়বড়ে করে দিল।

ফররুখ শিয়ার ও সৈয়দ পরিবারের মধ্যে বিরোধ

যেহেতু ফররুখ শিয়ারের রাজত্বের প্রশাসনিক কাঠামোটাই এসব রকমারি লোকজনের মিশ্র উপাদানে গড়ে উঠেছিল, তাই যেদিন তার গঠনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেদিনই তার ভাঙনের পালাও শুরু হয়। আগ্রা যুদ্ধের পর দিল্লী অধিকার করতে সৈয়দ আবদুল্লাহ খানকে পাঠানো হয়েছিল। আর হোসেন আলী খান যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হওয়ার পর দরবারের সার্বিক রাজনীতিতে যোগদানে অক্ষম হয়ে পড়েন। মীর জুমলা এই সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি সম্রাটের পুরানো বন্ধু খানে দাওরান (খাজা আসেম)-কে সাথে নিয়ে একটা দল গঠন করেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সৈয়দদের দাপট চূর্ণ করা ও জব্দ করা। এই দলটি সম্রাটের মনে সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি করতে শুরু করে যে, তারা নিজেদেরকে সাম্রাজ্যের আসল মালিক মনে করে এবং তাদের ধারণা এই যে, ফররুখ শিয়ারকে তারাই সম্রাট বানিয়েছে। তাই তারা তাকে নামেমাত্র সম্রাট রেখে নিজেরাই শাসন চালাতে চায়। দুর্বলচেতা ও সন্দিগ্ধমনা ফররুখ শিয়ারের মনে এ সন্দেহ ত্বরিত গতিতে শেকড় গেড়ে বসলো। অপর দিকে হোসেন আলী খানকেও তার সমর্থকরা এ খবর জানিয়ে দিল। তিনি স্বীয় ভাইকে চিঠি লিখলেন যে, "সম্রাটের কথাবার্তা ও আচরণ দেখে মনে হয়, আমাদের সেবা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার তার কাছে

কোন গুরুত্ব নেই। উপকারের স্বীকৃতি, বন্ধুত্বের মর্যাদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সে আদৌ ইচ্ছুক নয়, এমনকি তার কোন লজ্জা-শরম ও আত্মসম্ভ্রমবোধেরও বালাই নেই। সুতরাং নিজেদের মঙ্গলের কথা আমাদের নিজেদেরই ভাবতে হবে।" এসব কারণে উভয় পক্ষে বিরোধিতার মনোভাব ধুমায়িত হয়ে উঠলো। এর মাস খানেক পর যখন সম্রাট নিজে দিল্লী গেলেন, তখন তার ও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্ট হয়ে উঠলো। সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড শুরু হলে পদ বন্টনের ক্ষেত্রে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দিল। সম্রাট যাকে নিয়োগ দান করেন মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি তাকে নামঞ্জুর করেন আর মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি যাকে নিয়োগ দান করেন, সম্রাট তাকে নামঞ্জুর করেন। উভয় তাই চাইতেন যে, সাম্রাজ্যের কোন কাজ যেন তাদের মতের বিরুদ্ধে না হয়। আর সম্রাট চেষ্টা করতেন প্রতিটি ব্যাপারে তার রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে। মধ্যবর্তীরা এই বিরোধকে আরো উস্কিয়ে দিত। একদিকে মীর জুমলা ও খানে দাওরান সম্রাটের ওপর চড়াও হয়ে থাকতেন। বিশেষত মীর জুমলাকে তো সম্রাট নিজের বিশেষ স্বাক্ষর দেয়ার ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি সম্রাটের অজান্তেই ও বিনা অনুমতিক্রমেই তাঁর পক্ষ থেকে বিভিন্ন দলীলপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে দিতেন। আর যে ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রধান সেনাপতির বিরোধিতা করতে চাইতেন, সে ব্যাপারে সম্রাটের স্বাক্ষর দিতেন না। অপর দিকে সৈয়দ আবদুল্লাহ খান জানষটের জনৈক ব্যবসায়ী রতন চাঁদকে নিজের সচিব নিয়োগ করে সাম্রাজ্যের যাবতীয় কাজকর্ম তার হাতে সোপর্দ করে দেন এবং নিজে এতটা আরাম আয়েশে নিমজ্জিত হন যে, প্রায়ই তিন-চার মাস যাবত প্রশাসনের খোঁজ খবর নিতেন না। রতন চাঁদ ছিল একজন চরম লোভী, সংকীর্ণমনা, স্বার্থপর ও একটি মূর্খ লোক। সে ঘুষ না নিয়ে কোন কাজই করতো না। মীর জুমলা যাদেরকে রাজকীয় স্বাক্ষর দিয়ে কোন দরখাস্ত মঞ্জুর করে পাঠাতেন তাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হতো। আর যারা রতন চাঁদকে ঘুষ দিত তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়ে যেত। চরম স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে সে গোটা প্রশাসনকে অচল এবং কর্মচারীদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল। আর্থিক ও কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহের ওপর তার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল এবং সে খাস-মহলগুলোকে ইজারা দিয়ে লাখ লাখ রুপিয়া আদায় করতো। শেষের দিকে সে দেওয়ানী কার্যক্রমের সীমা অতিক্রম করে শরিয়ত সংক্রান্ত ব্যাপারেও নাক গলাতে আরম্ভ করে এবং কাজী পর্যন্ত তার পছন্দ মোতাবেক নিযুক্ত হতে থাকে। সম্রাটের ক্রীড়নক মীর জুমলা এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্রীড়নক রতন চাঁদ —এই দুই কুচক্রী ব্যক্তির অস্তিত্ব সাম্রাজ্যের জন্য একটা স্থায়ী উপদ্রবের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের কারণে একদিকে সাম্রাজ্যের গোটা প্রশাসন পংগু ও বিকারগ্রস্ত হতে থাকে। অপরদিকে পারস্পরিক কলহ-কোন্দল ও শত্রুতা ক্রমে ব্যাপকতর হয়ে দেশকে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

ষড়যন্ত্র ও দুমুখো নীতির সূচনা

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, যেসব রাজা ও গোত্রপতি মোগল সম্রাটকে কর দিত, তাদের মধ্যে কর প্রদানে অনিহা প্রদর্শনের ঔদ্ধত্য জন্মে যায় এবং তাদের অধিকাংশ কর দেয়া ও মোগল সম্রাটের নির্দেশ মানা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু যোধপুরের রাজা অজিত সিং এর চেয়েও বেশী ধৃষ্ঠতা দেখায়। সে নিজ রাজ্যের সীমানায় গরু জবাই করা ও আযান দেয়া নিষিদ্ধ করে দেয়, বহু সংখ্যক মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে এবং তার রাজ্যে নিয়োজিত মোগল কর্মচারীদেরকে বহিষ্কার করে। তার এসব বাড়াবাড়িও বরদাশত করা হয়। কিন্তু যখন যে মোগল শাসিত এলাকায় প্রবেশ করে আজমীর শহর দখল করে তখন তা প্রতিহত করা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। ফররুখ শিয়ার নিজেই তাকে প্রতিরোধ করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মীর জুমলা ও তার অনুচররা তাকে এই বলে বাধা দেয় যে, আপনি বরং হোসেন আলী খানকে প্রতিরোধ অভিযানে পাঠান এবং গোপনে অজিত সিংকে নির্দেশ পাঠিয়ে দিন যে, সে যেন হোসেন আলী খানের সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে একদিকে হোসেন আলী খানকে রাজার মোকাবিলায় পাঠানো হলো। অপর দিকে অজিত সিংকে এই মর্মে চিঠি লেখা হলো যে, সে যদি হোসেন আলী খানকে হত্যা করতে পারে, তাহলে তাকে হোসেনের যাবতীয় সহায় সম্পদ তো দেয়া হবেই, অধিকন্তু আরো অনেক কৃপা ও অনুগ্রহে ভূষিত করা হবে। যে উদ্দেশ্যে এই জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অজিত সিং হোসেন আলী খানের মত দুর্ধর্ষ বীরের সামনে আসতেই সাহসী হলো না। সে পালিয়ে বিকেনিরের মরুভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। অবশেষে সে শুধু সম্রাটের বশ্যতাই স্বীকার করলো না, বরং স্বীয় কন্যাকে ফররুখ শিয়ারের সাথে বিয়ে দেয়ার অংগীকার করে সন্ধি করলো।

সৈয়দ পরিবার ও সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ

১৭১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হোসেন আলী খান রাজপুতানার অভিযান থেকে ফিরে আসেন। এই অভিযান চলাকালে অথবা দিল্লী ফিরে আসার পর তার বিরুদ্ধে অজিত সিং-কে লেখা ষড়যন্ত্রমূলক চিঠিগুলো তার হস্তগত হয়। এর ফলে সম্রাট ও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে শত্রুতা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে। একাধিকবার পরিস্থিতি এতদূর গড়ায় যে, উভয় ভাই দরবারে যাওয়াই বন্ধ করে দেন। তারা নিজেদের সরকারী বাসভবনের সামনে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন এবং সেনাবাহিনী জমায়েত করে সরকারী হামলা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। সম্রাটের মা কয়েকবার হস্তক্ষেপ করেন এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির কাছে গিয়ে নিস্পত্তি করানোর চেষ্টা

করেন। কিন্তু গোলযোগের উৎসমুখ উন্মুক্তই ছিল এবং সেই সয়লাবের চাপ ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। তাই তা রোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে উভয় ভাই-এর ঔদ্ধত্য যাতে সহজেই গুড়িয়ে দেয়া যায় সে জন্য পর্যাপ্ত সেনা সমাবেশের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়। এ জন্য মীর জুমলা ও খানে দাওরানকে আরো এক ধাপ পদোন্নতি দেয়া হয়। অতপর মীর জুমলার অধীন ৫ হাজার রাজকীয় সৈন্য এবং খানে দাওরানের অধীন আরো ৫ হাজার মোগল সৈন্য নিয়োজিত করা হয়। এ ছাড়া মীর জুমলাকে ৬ হাজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত মোগল সৈন্য সমন্বয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এত সৈন্য সংগ্রহ করা সত্ত্বেও মীর জুমলা ও খানে দাওরান—এ দু'জনের একজনের মধ্যেও এতটা সাহস জন্মালো না এবং সৈন্য পরিচালনা ও যুদ্ধ চালনার ততটুকু যোগ্যতার সৃষ্টি হলো না যে, হোসেন আলী খান ও আবদুল্লাহ খানের মত বীর সেনানীর মোকাবিলায় আসতে সক্ষম হয়। অগত্যা সম্রাট শরাণাপন্ন হলেন ইতিমাদুদ্দৌলা মুহাম্মদ আমীন খানের। তাঁকে বলা হলো যে, সমগ্র মোগল বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে খতম করে দিন। কিন্তু আমীন খান জানতেন যে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে উৎখাত করার পর সম্রাট তাকেও খতম করে দেয়ার চক্রান্ত আঁটবেন। তাই তিনি এই ষড়যন্ত্রে অংশ নিতে সরাসরি অস্বীকার করলেন। ফররুখ শিয়ার এবার একেবারেই নিরূপায় হয়ে পড়লেন। তিনি কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে শালিশ নিয়োগ করলেন। তাঁরা উভয় ভাই-এর সাথে তার আপোষ রফা করিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালালো। এদের মধ্যস্থতায় এই শর্তে নিস্পত্তি হলো যে, মীর জুমলাকে বিহার এবং হোসেন আলী খানকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার বানিয়ে পাঠানো হবে। চুক্তি মোতাবেক ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে মীর জুমলা পাটনা অভিমুখে এবং ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে প্রধান সেনাপতি হোসেন আলী খান দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। প্রধান সেনাপতি যদিও ইতিপূর্বেই ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারীর নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং সেখানে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি ভেবেছিলেন জুলফিকার খানের মত দাউদ খানকে পুনরায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে সেখানে পাঠাবেন। কিন্তু এবার আপোষ চুক্তির শর্তানুসারে তাঁকে বাধ্য হয়ে সেখানে যেতে হলো। তিনি এই শর্তে সেখানে যেতে সম্মত হলেন যে, দাক্ষিণাত্যের ৬টি প্রদেশে ছোট বড় যে কোন কর্মকর্তাকে এমনকি দুর্গের অধিনায়কদেরকে পর্যন্ত নিয়োগ বা পদচ্যুত করার এখতিয়ার তার হাতে থাকবে। অথচ মোগল সাম্রাজ্য দুর্গের অধিনায়কের পদটি এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তা স্বয়ং সম্রাট ছাড়া আর কারোর অধিনতা মানতো না। এসব শর্তে হোসেন আলী খান দাক্ষিণাত্যে চলে গেলেন এবং যাওয়ার সময় সম্রাটকে হুশিয়ারী দিয়ে গেলেন যে, আমার ভাই-এর ওপর কোন রকম অত্যাচার করা হলে আমি ২০ দিনের মধ্যে দিল্লীর সম্মুখে উপনীত হব।

হোসেন আলী খান দিল্লীর বাইরে কদম রাখা মাত্রই ফররুখ শিয়ার পুনরায় তার কুচক্রী বন্ধুদের প্রভাবাধীন এসে গেলেন। অজিত সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় যে দোমুখো নীতির পরীক্ষা চালানো হয়েছিল, সম্রাট পুনরায় সেসব পন্থা অবলম্বন করে কার্যোদ্ধার করতে চাইলেন। তিনি গুজরাটের সুবেদার দাউদ খানকে বুরহান পুরের সুবেদারীতে নিয়োগ করলেন এবং তাকে গোপনে লিখে পাঠালেন যে, যেভাবেই হোক হোসেন আলী খানকে ঠেকাও, আর সম্ভব হলে তাকে হত্যা কর। এ কাজ সম্পন্ন করতে পারলে তাঁকে স্থায়ীভাবে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার বানানো হবে।[১] এই ষড়যন্ত্র অনুসারে দাউদ খান বুরহান পুরে হোসেন আলী খানের গতিরোধ করলেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে দাউদ খান নিহত হয় এবং হোসেন আলী খানের জন্য দাক্ষিণাত্যের সুবেদারীর পথ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কন্টক ও শত্রুমুক্ত হয়।

এবার আমি দাক্ষিণাত্যে নিযামুল মুলকের শাসনকালের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করবো। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে আমি শুরুতে এ সময়কার ইতিহাস বর্ণনা স্থগিত রেখেছিলাম।

দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সাথে নিযামুল মুলকের আচরণ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের শুরুতে নিযামুল মুল্‌ককে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার করে পাঠানো হয়েছিল এবং দাউদ খানকে গুজরাটের সুবেদার করে বদলী করা হয়েছিল। দাউদ খান মারাঠাদেরকে দাক্ষিণাত্যের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব আদায়ের সুবিধা দিয়ে যে সমঝোতা করে রেখেছিলেন তার সমর্থনে কোন শাহী সনদ ছিল না। তাই তাঁর অপসারণের সাথে সাথেই ঐ সমঝোতা বাতিল হয়ে যায়। নিযামুল মুলক তাদেরকে এক-চতুর্থাংশ কিংবা রাজস্বে অন্য কোন রকমের অংশ দিতে দ্ব্যর্থহীনভাবে অস্বীকার করেন। সেই সাথে দাউদ খানের কর্মচারীরা জেলা কর, ফৌজদারী কর, সড়ক নিরাপত্তা কর ইত্যাদি নামে যেসব অবৈধ কর আদায় করতো, তাও সম্পূর্ণরূপে রহিত করে দেন। তিনি সকল কর্মচারীকে প্রজাদের কাছ থেকে আইনানুগভাবে আরোপিত কর ব্যতীত এক পয়সাও কর আদায় না করতে কঠোর নির্দেশ দেন। সামরিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি আওরংগাবাদ পৌঁছা মাত্রই সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা ছিল এই যে, মারাঠা অধ্যুষিত এলাকার সন্নিহিত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সেনাবাহিনী নিয়োগ করেন এবং শান্তি রক্ষার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করেন। এতে মারাঠাদের দস্যুবৃত্তি অনেকটা কমে আসে। মারাঠা রাজা সাহু সামরিক আক্রমণ চালিয়ে এ ক্ষতি পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। সে স্বীয় সেনাপতি চন্দ্র

১. দাউদ খান নিহত হওয়ায় এই চিঠি হোসেন আলী খানের কাছে ধরা পড়ে এবং তিনি পরে তা স্বীয় ভাই আবদুল্লাহ খানের কাছে পাঠিয়ে দেন।

সেনকে সেতারা থেকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে মোগল শাসিত এলাকায় এক-চতুর্থাংশ, এক-দশমাংশ এবং খাদ্যশস্য আনতে পাঠায়। এই অভিযানে সাহু বালাজি বিশ্বনাথ নামক একজন সাধারণ কর্মচারীকে চন্দ্র সেনের সাথে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দেয়। বিশ্বনাথ চন্দ্র সেনের পিতার কর্মচারী ছিল। এই লোকটাকে হিসাব রক্ষক নিযুক্ত করে তার সাথে পাঠানোতে চন্দ্র সেন ক্ষুব্ধ হয়। মোগল অঞ্চলে পৌছার আগেই বালাজির সাথে চন্দ্র সেনের লড়াই হয়ে যায়। বালাজি প্রাণ নিয়ে পালায় এবং সাহুর নির্দেশে পাণ্ডগড়ের দুর্গ রক্ষক তাকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু খোদ সাহু বালাজির পক্ষ নেয়া সত্ত্বেও চন্দ্র সেন দমলো না। সে পাণ্ডুগড় অবরোধ করলো। সাহু তাকে প্রতিহত করতে বিপিত রাও বুনালকে পাঠালো। এই ব্যক্তি মারাঠা সেনাবাহিনীতে সেনাপতি মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। উভয়ের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে চন্দ্র সেন পরাজিত হলো। সে পালিয়ে সরাসরি আওরংগাবাদে নিযামুল মুলকের কাছে চলে গেল। নিযামুল মুলক পরম সম্মান ও সমাদরের সাথে তাকের চাকুরী দিলেন এবং বেদার থেকে ২৫ মাইল দূরে ভালকি ও তার পার্শবর্তী একটা বিরাট এলাকা তাকে জাইগীর হিসেবে দিলেন। তার সঙ্গীদের মধ্য থেকে সারজা রাও ঘটকে এবং সুম্বাজি নিবালকরকেও তিনি জাইগীর দেন।[১] এবার মারাঠারা বুঝতে পারলো নিযামুল মুল্ক তাদের কি মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছেন। তাই তারা নানাভাবে চন্দ্র সেনকে ভাগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু নিযামুল মুলক মানুষের মন জয় করার এমন অব্যর্থ কৌশল জানতেন যে, একবার তার কৃপা ও অনুগ্রহে ধন্য হবার পর কোন ছলাকলা ও প্রলোভন তাকে আর সেতারায় ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। এই ঘটনাটি স্বয়ং নিযাম ফররুখ শিয়ারকে উদ্দেশ্য করে লেখা এক চিঠিতে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

"রাজার সুন্দরী স্ত্রী (তারাবাই) এবং কদর্য স্বভাবের রাজা সাহু তার কাছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে তাকে গুরুত্বপূর্ণ পদ ও সর্বময় ক্ষমতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আমি অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোক দিয়ে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হাত করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেই এবং নানা রকমের পাল্টা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঐসব প্রলোভন ও প্ররোচনা তার মন থেকে মুছে ফেলে অনুগত করার চেষ্টা চালাই। অবশেষে ২১শে জিলহজ্জ তারিখে রাজা চন্দ্র সেন তার দলবল সহ যাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠ আনুগত্য সহকারে আমার কাছে হাজির হয়। বৈঠকে নেতৃবৃন্দের কথাবার্তা শুনে অন্যরাও আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ হয়।----সম্ভবত অতিশীঘ্র রাজার সাথে সাথে তারাও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে।"

চন্দ্র সেন প্রতিশোধ স্পৃহায় উজ্জীবিত ছিল। আর নিযামুল মুলক নাশকতা ও লুটতরাজ প্রতিরোধের পরিকল্পনা করছিলেন। তাই উভয়ে একমত হয়ে

---

১. সুম্বাজিকে পরবর্তীকালে রাও সুম্বা খেতাবে ভূষিত করা হয়। এই খেতাব এখন পর্যন্ত তার বংশধরের মধ্যে চালু রয়েছে।

একটি সম্মিলিত বাহিনী মারাঠা বাহিনীর মোকাবিলায় পাঠালেন। ওদিকে সাহু বালাজি বিশ্বনাথের নেতৃত্বে একটি সহায়ক বাহিনী দিয়ে মূল মারাঠা বাহিনীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করলো। পুরন্দরের নিকট তুমুল যুদ্ধ হলো। সাহুর বাহিনী পরাজিত হয়ে সালপি ঘাটের দিকে পিছিয়ে গেল। সুবাজি সামনে অগ্রসর হয়ে পুনা এলাকা দখল করলো। নিযামুল মুলক এই এলাকার পাশেই তাকে জাইগীর দিয়ে দিলেন। এ অবস্থা দেখে সাহু প্রমাদ গুণলো, সে নিযামুল মুলকের সাথে কতিপয় শর্তে সন্ধি স্থাপন করলো। এসব শর্ত কোন ইতিহাসে আমি পাইনি। তবে মনে হয়, তা অবশ্যই মোগল সরকারের স্বার্থের অনুকূল ছিল এবং ভবিষ্যতে মোগল শাসিত অঞ্চলে মারাঠাদের লুটতরাট বন্ধ হবে এরূপ অংগীকার সম্বলিত ছিল। কিন্তু স্বয়ং সাহুর অংগীকার ভংগের কারণেই হোক, অথবা তার লোকজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অক্ষমতার দরুনই হোক —এই সন্ধির পরেও কয়েকবার মারাঠাদের দস্যুবৃত্তির ঘটনা ঘটে। তাই নিযামুল মুল্‌ক তাদেরকে জব্দ করার জন্যে অধিকতর কার্যকর অন্য একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি সাহুর কুলহাপুরস্থ প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত শক্তিশালী করার মাধ্যমে সাফল্যের সাথে মারাঠাদের দৌরাত্ম্য খর্ব করলেন।

নিযামুল মুলকের দাক্ষিণাত্যে আসার আগে দাউদ খানের সহকারী সুবেদারগিরির আমলের ঘটনা। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রাম ও তারাবাই এর পুত্র শিবাজি মারা যায় এবং সেই সাথেই তারাবাই-এর শাসনেরও অবসান ঘটে। রাজ্যের অন্যান্য নেতা ও কর্মকর্তাগণ রাজা রামের দ্বিতীয় পুত্র শম্ভুজিকে গদিতে বসিয়ে দিল। আর তারাবাইকে নিক্ষেপ করলো কারাগারে। ক্ষমতার এই হাত বদলের ফলে কুলহাপুর রাজ্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে। কেননা তারাবাই এর মত বুদ্ধিমতী ও বীরাঙ্গনা নারীর নেতৃত্ব থেকে তা বঞ্চিত থাকে। সাহু আগে থেকেই দাউদ খানের সমর্থন ও সহায়তা পেয়ে আসছিল। তারাবাই ক্ষমতা থেকে হটে যাওয়ায় তার আরো সুবিধা হয়ে গেল। মারাঠা জাতির ওপর তার আধিপত্য ও কর্তৃত্ব আরো সংহত হলো। নিযামুল মুল্‌ক আওরংগাবাদ পৌঁছা মাত্রই স্বীয় পূর্বসুরীর এই ভ্রান্তি উপলব্ধি করেন এবং শুরু থেকেই তিনি সাহুর বিপক্ষে শম্ভুজিকে শক্তি জোগানোর কথা ভাবতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে সাহুর আচরণ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুন তিনি এই কৌশলটির প্রয়োজন আরো তীব্রভাবে অনুভব করেন। তিনি স্বীয় প্রভাব খাটিয়ে প্রধান প্রধান মারাঠা গোত্রপতিকে সম্ভুজির প্রতি সমর্থন দানে উদ্বুদ্ধ করেন। খ্যাতনামা মারাঠা নেতা সান্তাজি ঘোড়পড়ার ভ্রাতুষ্পুত্র সাইদুজি ঘোড়পড়া শম্ভুজির প্রশাসনে যোগদান করেন। সেই সাথে ঘোড়পড়া গোত্রের বহু সরদার কুলহাপুর সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। সাইদুজির বিশিষ্ট বন্ধু এবং নিযামুল মুলকের অনুগত নবাব সাদানুরও শম্ভজির সহায়ক হয়ে যান। আরো একজন প্রতাপশালী মারাঠা সরদার ওদাজি চৌহান সাহুকে এত বিব্রত করে যে, সে নিজের কয়েকটি তালুকের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব তাকে দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

এছাড়া ছোট বড় আরো বহু সরদার শম্ভুর সমর্থক হয়ে যায়। কানহুজি আংড়িয়া ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ। সাননদাড়ি থেকে বোম্বে পর্যন্ত সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় তার আধিপত্য বিরাজ করতো এবং কোকেনের উপকূলীয় এলাকায় তার প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করছিল। এসব কারণে কয়েক মাসের মধ্যেই সাহুর দাপট অর্ধেকের চেয়েও বেশী চূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু সাহুকে একেবারে উৎখাত করে শম্ভুকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হোক—এটাও নিযামুল মুল্কের মনোপূত ছিল না। তাই তিনি ভারসাম্য বজায় রাখা ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার স্বার্থে তাকেও টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালান। ফররুখ শিয়ারকে অনুরোধ করে তার জন্য দশ হাজারী পদ বরাদ্দ করিয়ে দেন। এই সময় সাহুর কাছ থেকে আর একবার এই মর্মে স্বীকৃতি আদায় করেন যে, সে যতই নিজেকে হিন্দুদের বাদশাহ্ মনে করুক, মোগল সাম্রাজ্যে তার মর্যাদা ও অবস্থান একজন সাধারণ জমিদারের চেয়ে বেশী নয়।

নিযামুল মুলকের অপসারণ ও দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে তার প্রভাব

নিযামুল মুলক তার এই নীতি কৌশল দ্বারা মারাঠা শক্তিকে বশে আনা ও দাক্ষিণাত্যের অরাজক পরিস্থিতিকে শান্ত করার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু এই নীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া প্রাথমিক অবস্থায় থাকতেই দু'টো ঘটনা গোটা পরিস্থিতিকে পাল্টে দেয়। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে এক রাজকীয় ফরমান বলে নিযামুল মুলককে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী থেকে পদচ্যুত করে দিল্লীতে ডেকে পাঠানো হয়। তাঁর স্থলে প্রধান সেনাপতি সৈয়দ হোসেন আলী খানকে দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়। অথচ হোসেন আলী খান এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। এমনকি খোদ রাজনীতি সম্পর্কেই তার আদৌ কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। তিনি ছিলেন নিরেট একজন সৈনিক মানুষ। অন্য দিকে একই বছর রাজা সাহু বালাজি বিশ্বনাথকে স্বীয় পেশোয়া বা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করে এবং নিজে হেরেমে আমোদ ফূর্তিতে মগ্ন হয়ে রাজ্যের যাবতীয় কাজ কর্ম তার হাতে সোপর্দ করে দেয়।[১] যোদ্ধা হিসেবে তো হোসেন আলী খানের সাথে বালাজির কোন তুলনাই হতো না। কিন্তু রাজনৈতিক ধড়িবাজিতে হোসেন আলী খান তার ধারে কাছেও ঘেষতে পারতেন না। সে পেশোয়া হয়েই মারাঠা রাজার মুমূর্ষ দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করে। অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতার অবসান ঘটায়। বিদ্রোহী সরদারদেরকে দমন করে এবং অল্প দিনের মধ্যেই নতুন করে এক মজবুত ও স্থীতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে। অপর দিকে দাক্ষিণাত্যের গণ্ডমূর্খ সুবেদার হোসেন আলী খানকে সে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে।

১. মারাঠা রাজ্যে পেশোয়া শাসনের সূচনা হয় এখান থেকেই। এই সময় থেকেই সেতারার রাজা নামমাত্র রাজা হয় এবং বালাজি বিশ্বনাথের পরিবার নিরংকুশ শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়। সেই থেকে এই পরিবার পেশোয়া পরিবার নামে পরিচিত হয়।

নিছক নিজের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার জোরে সে তার সাথে এমন এক চুক্তি সম্প্রাদন করে, যার বলে মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের ৬টি প্রদেশে মোগল রাজস্বের শতকরা ৩৫ ভাগ আদায় করার অধিকারই শুধু লাভ করেনি, বরং ভবিষ্যতে গোটা মোগল সাম্রাজ্যের কার্যক্রমে নাক গলানোর এবং সমগ্র দেশে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগও লাভ করে। তার সাফল্য ও কৃতিত্ব দেখে অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাকে শিবাজির পর মারাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত এ আখ্যা যথার্থ। শিবাজির পরে তার বংশধরদের মধ্যে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেনি, যার পক্ষে মোগল সাম্রাজ্যের মোকাবিলায় মারাঠা রাজত্বের পতাকা সমুন্নত রাখা সম্ভব। শম্ভুজি যে অযোগ্য ও অথর্ব ছিল, তা অনস্বীকার্য। রাম রাজা ছিল নিরেট যোদ্ধা। গঠনমূলক যোগ্যতার কোন পরিচয়ই সে দেয়নি। তারাবাই বুদ্ধিমতীও ছিল, বীর যোদ্ধাও ছিল একথা ঠিক। কিন্তু সম্রাট আলমগীরের মোকাবিলায় বিধ্বস্ত মারাঠা রাজ্যের পুনর্নির্মাণ সে-ও করতে পারেনি। সাহু স্বভাবতই দুর্বল ও ভোগে আসক্ত লোক ছিল।[১] পনেরো বিশ বছর বয়স পর্যন্ত মোগল দরবারে থাকতে থাকতে তার মধ্যেও তৎকালীন মোগল আমীরদের চারিত্রিক দোষ সংক্রমিত হয়ে গিয়েছিল। নগর জীবনের এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট এত গভীরভাবে বদ্ধমূল হওয়ার দরুন তার ভেতরে এমন একটা বেদুইন জাতির নেতৃত্ব দেয়ার সামর্থ ছিল না, যে জাতি তখনো সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে ছিল এবং মোগলদের মোকাবিলায় প্রতিপত্তি লাভ করতে যে জাতির আরো অনেক সংগ্রাম করা দরকার ছিল। তার অযোগ্যতার সাথে গৃহযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রভাব মিশ্রিত হয়ে মারাঠা রাজত্বকে চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিকে বালাজি বিশ্বনাথ এসে রাতারাতি পাল্টে দেয়। বস্তুত এ কাজটা তার এমন উচ্চাংগের যোগ্যতার পরিচায়ক ছিল যে, তা মারাঠা রাজত্বকে শুধু পুনরুজ্জীবিতই করেনি বরং শিবাজির আমলের চেয়েও বহুগুণ বেশী শক্তিশালী করে দিয়েছিল। তাই তাকে মারাঠা রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার এই যে, বালাজির কৃতিত্ব ও সাফল্যের মূলে শুধু তার যোগ্যতা ও বিচক্ষণতারই অবদান রাখেনি বরং সেই সাথে মোগল সম্রাট এবং তার উপদেষ্টা ও কর্মকর্তাদের অথর্বতা ও নিবুদ্ধিতাও সমান ভূমিকা রেখেছিল। এই নাজুক মুহূর্তে তারা যদি নিযামুল মুলকের মত সুযোগ্য সুবেদারকে না সরাতেন, তা হলে হোসেন আলী খানের সুবেদারীতে যে সাফল্য সে অর্জন করেছিল, তা কখনো তার কপালে জুটতো না। নিযামুল মুল্‌ক ও

১. লক্ষী নারায়ণ শফিক স্বীয় গ্রন্থ 'বিসাতুল গানায়েম'-এ লিখেছেন যে, "সাহু চরম ব্যভিচারী ছিল। যেখানেই সে শুনতে পেত যে কোন সামরিক অথবা বেসামরিক নাগরিকের কাছে সুন্দরী রমনী আছে, টাকার বিনিময়ে তাকে কাছে আনাতো ও ধর্ষণ করতো, প্রায়শ কোন বাড়ীতে সুন্দরী নারী দেখলে নিজেই চলে যেত এবং বলপূর্বক তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে রাতের পর রাত কাছে রাখতো।" এই গ্রন্থকার সাহুর মৃত্যু সম্পর্কেও এক লজ্জাকর ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

বালাজির তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে যে কেউ স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, নেতৃত্ব, সামরিক অধিনায়কত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিচারে নিযামুল মুল্‌কের মর্যাদা বালাজির চেয়ে বহুগুণ বেশী ছিল। ঐতিহাসিক গ্রান্ট ডোভ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, তার নীতি ও শক্তি এমন তেজস্বী ছিল যে, তিনি মারাঠাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনেকটা সফল হয়েছিলেন। তাকে যদি এই নীতি অব্যাহত রাখার সুযোগ দেয়া হতো এবং বালাজির শাসনামলের শুরুতেই তার শঠতা চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে হোসেন আলী খানের কল্যাণে সে মারাঠা রাজ্যকে উন্নতির সুউচ্চ সোপানে পৌছাতে যে কৃতকার্যতা লাভ করেছিল তা সে লাভ করতে পারতো —এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

মারাঠাদের দৌরাত্ম প্রতিরোধে হোসেন আলী খানের ব্যর্থতা

নিযামুল মুলকের দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তন এবং হোসেন আলী খানের আগমনের মাঝে যে বিরতি কাল অতিবাহিত হয়, তাতে মারাঠারা পুনরায় মোগল শাসিত এলাকায় লুঠতরাজ শুরু করে দেয়। খান্ডো রাও ভাকে[১] এক নাগাড়ে কয়েক বছর ধরে গুজরাট ও কাঠিয়ার অঞ্চলে লুটতরাজ চালানোর পর খান্দেশ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। সে মাটির মূর্তি বানিয়ে স্থানে স্থানে থানা প্রতিষ্ঠা করে। সুরাট বন্দর থেকে যেসব বাণিজ্যিক কাফেলা দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতের দিকে যেত, তাদেরকে এই পথ দিয়েই যেতে হতো। খান্ডো এসব কাফেলার গতি রোধ করে তাদের কাছ থেকে এক-চতুর্থাংশ কর আদায় করতে আরম্ভ করে দেয়। খান্দেশের পার্শবর্তী পল্লী অঞ্চলে তার লোকজন ছড়িয়ে পড়ে এবং কর আদায়ের ধুম পড়ে যায়। হোসেন আলী খান দাউদ খানকে পরাজিত করে যখন আওরংগাবাদে উপনীত হন, তখন তিনি নিজের সেনাপতি জুলফিকার বেগকে খান্ডোর উপদ্রব দমন করতে পাঠান। আওরংগাবাদ থেকে ৭০ ক্রোশ দূরে ভানিয়ার পরগনায় (বাগলানা ও কালনার সীমান্তে অবস্থিত) উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। কিছুক্ষণ সংঘর্ষ হওয়ার পর মারাঠারা তাদের চিরাচরিত যুদ্ধ রীতি অনুসারে প্রতারনাচ্ছলে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। জুলফিকার বেগ এই পলায়নকে পরাজয়মূলক পলায়ন ভেবে তাদের পিছু নেন। অনেক দূরে জংগলে গিয়ে যখন জুলফিকার বেগের সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন খান্ডো রাও পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং তার বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। স্বয়ং জুলফিকার বেগও এই যুদ্ধে মারা যান। এরপর হোসেন আলী খান স্বীয় ভ্রাতা সাইফুদ্দীন আলী খান ও স্বীয়

---

১. ইতিহাসে এই লোকটির একাধিক নাম ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে। কোথাও দিহার, কোথাও বেডর আবার কোথাও পাহাড়। তবে আমার মনে হয়, এটা মূল লেখকদের নয় বরং ছাপার ভুল।

সচিব মুহাকিম সিংকে পাঠান। আর চন্দ্র সেনকে তাদের সহযোগী করে পাঠান। কিন্তু তারা খান্ডো রাওয়ের দৌরাত্ম খর্ব করতে, তার থানাগুলো তুলে দিতে এবং কাফেলাগুলোকে তার উপদ্রব থেকে বাঁচাতে সক্ষম হলেন না। মোগল সৈন্যরা কোন থানার কাছে পৌঁছলেই মারাঠারা থানা ছেড়ে পালাতো আর সৈন্যরা সেখান থেকে সরে গেলে আবার তারা সেখানে চলে আসতো। সম্মুখ সমরে শাহী সৈন্যরা মারাঠাদেরকে একাধিক ক্ষেত্রে পরাজিত করে এবং 'মায়াসেরুল' উমারা' গ্রন্থের ভাষ্য অনুসারে তারা তাদেরকে ধাওয়া করে সুরাট ও সারা পর্যন্ত চলে যায়। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় তারা সফল হতে পারেনি। অবশেষে হোসেন আলী খান স্বীয় সৈন্যদেরকে আওরংগাবাদে ফিরিয়ে আনেন এবং রাজা সাহু খান্ডো রাওকে তার সাফল্যের জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করে।

মারাঠাদের সাথে হোসেন আলীর সন্ধি

এই সময়ে ফররুখ শিয়ারের মাথায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের শত্রুতার এমন উন্মত্ততার রূপ নেয় যে, তিনি তাদেরকে খতম করার জন্য যে কোন জঘন্য ষড়যন্ত্র করতে প্রস্তুত ছিলেন, চাই তাতে তার সম্রাজ্যের ও দেশের সর্বনাশ হয়েই যাক না কেন। তাই তিনি পুনরায় অজিত সিং ও দাউদ খানের বেলায় যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, সেই গোপন চক্রান্তের আশ্রয় নেন। দাক্ষিণাত্যের একজন দেওয়ান (প্রশাসনিক কর্মকর্তা) একজন জমীদার ও একজন কর্মচারীকে সম্রাটের পক্ষ থেকে গোপন নির্দেশ পাঠানো হয় যে, তারা যেন সুবেদারের আদেশ না মানে এবং সাধ্যমত তার এতটা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে যে, তার প্রশাসন অচল হয়ে যায়। এমনকি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধরত রাজা সাহুর কাছেও হোসেন আলী খানের বিরুদ্ধে চিঠি লেখা হয়। এভাবে মোগল সম্রাট আপন সুবেদারের বিরুদ্ধে নিজের ও সাম্রাজ্যের দুশমনকে আস্কারা দেন। এর ফলশ্রুতিতে কর্ণাটক, বিজাপুর ও হায়দারাবাদ প্রদেশে মোগল কর্মকর্তারা প্রকাশ্যভাবে সুবেদারের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে। আর যেসব প্রদেশ রাজধানী আওরংগাবাদের নিকটবর্তী ছিল, সেখানেও ছোট বড় সকল সরকারী কর্মচারীর মধ্যে আনুগত্যহীনতা ও বিদ্রোহের মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে। সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোতে ও কর্মকাণ্ডে এক বিরাট বিপর্যয় নেমে আসে। সুবেদারের প্রশাসন আভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিপতিত এবং মোগল সরকারের সমর্থন থেকেও বঞ্চিত দেখে মারাঠাদের স্পর্ধা এত বেড়ে যায় যে, তাদের লুটেরা বাহিনীগুলো এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ রাজস্ব আদায় করতে করতে আওরংগাবাদের উপকণ্ঠে যেয়ে উপনীত হতে লাগলো।

হোসেন আলী খান বিলক্ষণ জানতেন যে, এসব কিছুই সম্রাটের ইংগীতে হচ্ছে। একই সাথে তিনি দিল্লী থেকেও খবরের পর খবর পাচ্ছিলেন যে, তার

ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লাহর বিরুদ্ধেও সম্রাট ও তার সভাসদরা অবিরাম চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনিও দেশ ও সাম্রাজ্যের স্বার্থের মুখে পদাঘাত করে নিজের জন্য লাভজনক যে কোন কর্মপন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জনৈক প্রবীণ মারাঠা ব্রাহ্মণ লাভবান হয়। শাকরাজি মালাহার নামক এই ব্রাহ্মণ এক সময় শিবাজি ও শম্ভুজির কর্মচারী ছিল। শম্ভুজির পর রাম রাজা তাকে প্রধান সচিব পদে বরণ করে। ঝাঁসির দুর্গ বিজিত হওয়ার পর যখন রাম রাজা সেখান থেকে পলায়ন করে, তখন সে সন্ন্যাসী হয়ে বেনারসে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন মোগল সরকারে চাকুরী বাগিয়ে নেয় এবং হোসেন আলী খানের দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার সময় সে-ও তার সঙ্গী হয়ে যায়। এখানে সে মারাঠা রাজ্যের কর্মকর্তাদের সাথে গোপন চিঠি আদান প্রদান শুরু করে এবং ক্রমে ক্রমে হোসেন আলী খানের কাছেও বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। সে যখন দেখলো যে, হোসেন আলী খান খোদ সম্রাট, নিজের অধীনস্থ কর্মচারী ও মারাঠাদের ত্রিমুখী আক্রমণে দিশেহারা হয়ে গেছেন, তখন সে সহানুভূতি ও হীতাকাঙ্খিতার ভান করে তাকে পরামর্শ দিল যে, মারাঠাদের দাবী-দাওয়া মেনে নেয়া হোক। তাহলে দেশে শান্তি-শৃংখলাও ফিরে আসবে, আবার বিরোধীদের শায়েস্তা করার জন্য মারাঠাদের পক্ষ থেকে সামরিক সাহায্যও পাওয়া যাবে। হোসেন আলী খানের আরেক বিশ্বস্ত সহচর মুহাম্মদ আনোয়ার খান বুরহানপুরীও এই অভিমত সমর্থন করলো। আরো কতক কর্মকর্তাও এতে সায় দিল। অমনি হোসেন আলী খান রাজী হয়ে গেলেন এবং স্বয়ং শংকরাজিকে দূত হিসেবে মারাঠা রাজ্যের রাজধানী সেতারায় পাঠালেন তার পক্ষ থেকে মারাঠাদের সাথে সন্ধি ও ঐক্যের ব্যাপারে আলোচনা চালানোর জন্য। অতপর কুজিন্নাগ্র বর্ষণরত এই হিংস্র হায়েনাটি মুক্তিয়ানীর মিশন নিয়ে সেতারা গিয়ে সাহুর কুচক্রী মন্ত্রী বালাজি বিশ্বনাথের সাথে বিস্তর সলাপরামর্শ করলো এবং ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মোতাবেক ১১৩০ হিজরী সনে[১] একটি চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করলো। এই চুক্তির ধারাগুলো নিম্নরূপ ঃ

চুক্তির ধারাসমূহ

(১) দাক্ষিণাত্যের ৬টি প্রদেশে (তন্মধ্যে কর্ণাটক বিজাপুর ও কর্ণাটক হায়দারাবাদের সামরিক এলাকা এবং মহিশুর, তৃস্তাপল্লী ও তিনজাওর নামক করদ রাজ্যগুলোও অন্তর্ভুক্ত) সকল সরকারী মহল ও জাইগীরসমূহের শতকরা ২৫ ভাগ ও ১০ ভাগ রাজস্ব আদায় করার অধিকার সাহুকে দেয়া হলো।

(২) প্রত্যেক মহলে (পরগনায়) একজন গোমস্তা শতকরা ২৫ ভাগ রাজস্ব, একজন গোমস্তা শতকরা ১০ ভাগ রাজস্ব এবং একজন আদায়কারী মহলের খাজনা আদায়ের জন্য নিয়োগ করার ক্ষমতাও সাহুকে দেয়া হলো।

---

১. ঐতিহাসিক আযাদ বলগ্রামীর মতে হিজরী ১১২৯ সনে।

(৩) দাক্ষিণাত্যের সুবেদার অংগীকার করেন যে, কোন মহলে জমীদার অথবা সরকারী কর্মচারীদের অসহযোগিতার কারণে সাহুর গোমস্তারা উপরোক্ত রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম না হলে সুবেদারের পক্ষ থেকে তার আদায়ে সাহায্য করা হবে।

(৪) শিবাজির মৃত্যুর সময়ে যে সমস্ত ভূখণ্ডে তার কর্তৃত্ব ছিল, সেসব ভূখণ্ডে সাহুকে স্বায়ত্ব শাসন দেয়া হয়। খান্দেশের তৃম্বক দুর্গ ও তদসন্নিহিত এলাকা এবং বরদা ও তাংভাদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী এলাকা এই স্বায়ত্বশাসন থেকে বাদ পড়ে। তার পরিবর্তে টাটওয়ারা থেকে মহিন্দর গড় ও পান্দরপুর পর্যন্ত অঞ্চল এবং সাহুর বিয়ের সময় আলমগীর তাকে যে এলাকাটি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৫) মোগল কারাগারে বন্দী সাহুর মা ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

এসব সুবিধার বিনিময়ে সাহু নিম্নলিখিত অংগীকার প্রদান করে :

(৬) সে তার স্বায়ত্বশাসিত এলাকা বাবদ বাৎসরিক দশ লাখ রুপিয়া মোগল কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে।

(৭) শতকরা দশ ভাগ রাজস্ব আদায়ের বিনিময়ে সে দাক্ষিণাত্যের প্রদেশসমূহে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বহন করবে, লুটতরাজ বন্ধ করা, অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে গ্রেফতার করা এবং চুরি ডাকাতির ক্ষতিপূরণ দেয়া তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৮) এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব আদায়ের বিনিময়ে সে মোগলদের স্বার্থরক্ষার্থে ১৫ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী সবসময় প্রস্তুত রাখবে এবং এই বাহিনী সুবেদার, মোগল সেনাপতি অথবা অন্য কোন মোগল কর্মকর্তার নির্দেশে কাজ করতে বাধ্য থাকবে।

চুক্তির পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের রাজনৈতিক মর্যাদা ও অবস্থানের ওপর এই চুক্তির যে প্রভাব পড়ে, তা বিশ্লেষণের জন্য এর প্রধান প্রধান ধারার পর্যালোচনা আবশ্যক।

প্রথমত, বাহাদুর শাহের আমলে জুলফিকার খান যেসব ভুল করেছিলেন এবং দাউদ খান সহকারী সুবেদার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে অঘোষিতভাবে যে ভুলের পুনরাবৃত্তি করে চলেছিলেন, এই চুক্তি সেসব ভ্রান্ত পদক্ষেপকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। এ যাবত মারাঠারা এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ রাজস্ব আদায় করতে যেসব লুটতরাজ চালাতো, সেগুলো ছিল নিছক দস্যুবৃত্তি। কেননা তাদের এসব করার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু এবার মোগল সরকারের

পক্ষ থেকে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেল এবং তাদের লুটতরাজ আইনানুগ মর্যাদা পেল।

দ্বিতীয়ত, এর ফলে মারাঠাদের ধৃষ্ঠতা আরো বেড়ে গেল। তারা বুঝে নিল যে, আরো দস্যুবৃত্তি চালালে মালোহ, গুজরাট এবং অন্যান্য মোগল শাসিত প্রদেশেও এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করা যেতে পারে। যথার্থই এই পন্থায় কয়েক বছর পর তারা এ অধিকারাও লাভ করে।

তৃতীয়ত, এই চুক্তির বলে প্রতিটি পরগনায় মোগল কর্মচারীদের পাশাপাশি তিনজন করে মারাঠা গোমস্তা তাদের বাহন ও পাইক পেয়াদা সহ নিয়োজিত হলো। তাদের অনেক কাচারীও প্রতিষ্ঠিত হলো এবং জায়গায় জায়গায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে মোগল সরকারের প্রতিষ্ঠিত শুল্ক অফিসের পাশাপাশি মারাঠাদেরও শুল্ক অফিস স্থাপিত হলো। পণ্য তালিকায় মোগল সরকারের কর্মচারীদের সাথে সাথে তাদের কর্মচারীদেরও স্বাক্ষর দেয়া হতে লাগলো এবং প্রত্যেক প্রদেশে মোগল শাহীর সুবেদারের সমান্তরালে মারাঠা রাজার পক্ষ থেকেও একজন সুবেদার নিযুক্ত হলো। এই দ্বৈত শাসনের দরুন প্রজারা ভীষণ নিগ্রহ ও যাতনায় নিপতিত হলো। সরকারী প্রশাসন কাঠামোতে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠলো। সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি সাধিত হলো তা এই যে, দেশ শাসনে মারাঠা রাজা মোগল সম্রাটের সাথে সমান অংশীদার হয়ে দাঁড়ালো।

চতুর্থত, এই চুক্তির ফলে মারাঠাদের আর্থিক অবস্থা সুসংহত হলো। দাক্ষিণাত্যের বিশাল ৬টি প্রদেশ থেকে তারা শতকরা ৩৫ ভাগ রাজস্ব পেতে লাগলো। অথচ শাসনকার্যের ব্যয়ভারের কোন অংশই তাদের বহন করতে হলো না। এতে তারা কি পরিমাণ লাভবান হয়েছিল, নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক গ্রান্ট ডোভ[১] মারাঠাদের সরকারী রেজিষ্টারের উদ্ধৃতি দিয়ে দাক্ষিণাত্যের ৬টি প্রদেশের তৎকালীন আয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

আওরংগাবাদ প্রদেশ—১ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪২ রুপিয়া
বেরার প্রদেশ—১ কোটি ১৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৫ শত ৮ রুপিয়া
বেদার প্রদেশ—৪৭ লক্ষ ৯০ হাজার ৮ শত ৭৯ রুপিয়া
বিজাপুর প্রদেশ—৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮ শত ৫৬ রুপিয়া
হায়দারাবাদ—৬ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪ শত ৮৩ রুপিয়া
খান্দেশ—৫৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯ শত ১৮ রুপিয়া
সর্বমোট—১৮ কোটি ৫০ লক্ষ ১৭ হাজার ২ শত ৯১ রুপিয়া

১. এখানে গ্রান্ট ডোভের বর্ণনাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ এই যে, এ হিসেব মারাঠাদের নিজস্ব উৎস থেকে গৃহীত। এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ রাজস্ব যে এই আয়ের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উপরোক্ত আয় থেকে যাবতীয় আনুসংগিক ব্যয় ইত্যাদি বাদ দেয়ার পর নির্ভেজাল ৬ কোটি রুপিয়া মারাঠাদের ভাগে পড়েছে। অথচ কোন নতুন ব্যয়ভার তাদের বহন করতে হয়নি, যা আগে বহন করতে হতো না। বরঞ্চ তাদের পূর্বতন ব্যয় আরো সংকুচিত হয়েছে। এক-চতুর্থাংশ আদায়কারী কর্মচারীরা আগেও ছিল, এখনও তারা রয়ে গেল। এসব কর্মচারীকে সাহায্য করার জন্য যে লুটেরা দল মোতায়েন করা হতো, এখন আর তার প্রয়োজন থাকলো না। কেননা আদায়ের কাজে সহযোগিতা করার দায়িত্ব মোগল সুবেদার নিজেই গ্রহণ করেছেন। দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলোতে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব মারাঠারা নিয়েছিল, তা পালন করতে নতুন কোন বাহিনী মোতায়েনের দরকার ছিল না। কেবল তাদের নিয়োজিত লুটেরাদের সরিয়ে নিলেই হয় এবং তা তারা নিয়েছিল। শাহী আমলাদের সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুত ১৫ হাজার মারাঠা বাহিনীও তাদের নতুন করে মোতায়েন করতে হয়নি, বরং তাদের কাছে বিদ্যমান সৈন্যদেরকে তারা প্রয়োজনের সময় পাঠিয়ে দিত। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে তো মনে হয় যে, চুক্তিতে হয়তো একথাও লিপিবদ্ধ হয়েছিল যে, যখন মারাঠা বাহিনীকে কাজে লাগানো হবে তখন তার ব্যয়ভার মোগল সরকারের কাঁধে ন্যস্ত হবে। এভাবে কোন খরচ ছাড়াই অথবা (কিছু খরচ যদি থেকেও থাকে তবে) অতি সামান্য খরচেই মারাঠা রাজার আয় ৬ কোটি টাকারও বেশী বৃদ্ধি পেল। যে জাতি জীবিকা নির্বাহের জন্য লুটতরাজ চালাতে বাধ্য ছিল, সে জাতি রাতারাতি এত ধনী হয়ে গেল যে, তাদের বাড়ীঘর মোগল আমীরদের প্রাসাদসমূহের সমকক্ষ হয়ে উঠলো। এমনকি তারা অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্র সংগ্রহ করে মোগল সাম্রাজ্যকে সমূলে উৎখাত করার শক্তি অর্জন করে ফেললো।

পঞ্চমত, দাক্ষিণাত্যের প্রদেশসমূহের আয়ে খোদ মোগল সম্রাটের অংশ মারাঠা রাজার তুলনায় কম হয়ে গেল। কেননা বাদবাকী ৬৫ শতাংশ রাজস্বের মধ্য থেকে ২৫ শতাংশ প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রাদেশিক সরকারকে দিতে হতো। অবশিষ্ট ৪০ শতাংশেরও একটা বিরাট অংশ সেসব জমীদারকে দিতে হতো, যারা সম্রাটের স্বার্থ রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী লালন করতো।[১]

---

১. "হাকিকত হায়ে হিন্দুস্তান" (ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত) নামক গ্রন্থে ঐতিহাসিক লক্ষ্মী নারায়ণ মুহাম্মদ শাহের আমলের যে আয় ব্যয়ের হিসেবে সংকলিত করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের আয় থেকে ব্যয়ের অনুপাত নিম্নরূপ ছিল :

মোট আয় : ১৭ কোটি ৯৮ লক্ষ ১ হাজার ২ শত ৯৩ রুপিয়া

ব্যয় :

ইসলাম পত্ত (মেওপত্ত) বাবদ কর্তন—১১ লক্ষ ৩৩ হাজার ২ শত ৮৩ রুপিয়া

মারাঠাদের পেছনে ব্যয় বাবদ কর্তন—১ কোটি ৭৫ লক্ষ রুপিয়া

জমীদারদের জাইগীর বাবদ কর্তন—১ কোটি ১০ লক্ষ ২৫ হাজার ৬ শত ৫৮ রুপিয়া

অনাদায়ী অর্থ—২ কোটি ৫২ লক্ষ ৭২ হাজার ৪ শত ৬০

অন্যান্য—৯ কোটি ৯৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫ শত ২ রুপিয়া

মোট—১৫ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯ শত রুপিয়া

অবশিষ্ট—২ কোটি ৫০ লক্ষ ৩ শত ৬০ রুপিয়া

অবশিষ্ট ঐই আড়াই কোটি রুপিয়ার মধ্য থেকে এক কোটি রুপিয়া শাহী কোষাগারে জমা হতো আর দেড় কোটি রুপিয়া পেত মারাঠারা।

ষষ্ঠত, একটি বিশাল এলাকায় মারাঠারা স্বায়ত্বশাসন লাভ করলো। এই এলাকা মহারাষ্ট্রের ১৬টি জেলা নিয়ে বিস্তৃত ছিল। জেলাগুলো হলো, পুনা, সুপ্পা, ইন্দোরপুর, দাঁই, মাওল, সেতারা, কুরার, কাঠোয়ার, মান, ফুলতন, মালকাপুর, তারলা, পানহাল্লা, জেরা, জুন্নের ও কুলহাপুর। এ ছাড়া তাংভাদ্রার উত্তরে কুপ্পাল, গদক, হালীল প্রভৃতি এবং কোকেনের উপকূলবর্তী এলাকায় জিয়ল, দেবল, রাজপুরী প্রভৃতি জেলাও মারাঠা শাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে মোগল শাহী প্রথমবারের মত দাক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিম ভূখণ্ডে মারাঠা আধিপত্য স্বীকার করে নেয় এবং বিজাপুর ও আওরংগাবাদ প্রদেশদ্বয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চিরদিনের জন্য মোগল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। লক্ষ্মী নারায়ণ শফিকের মতে তৎকালে মারাঠাদের এই স্বশাসিত রাজ্যের আয় পৌনে দুই কোটি রুপিয়া ছিল।

এতো গেল এই চুক্তির ফলে মারাঠা জাতির লাভবান হওয়ার দিক। এবার দৃশ্যত মোগল সাম্রাজ্য যেটুকু লাভবান হয়, তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক।

প্রথমত, অংগীকার আদায় করা হয় যে, স্বাধিকার প্রাপ্ত এলাকার বাবদ বার্ষিক দশ লক্ষ রুপিয়া কর দেয়া হবে। তবে যতদূর জানা যায়, এটা কখনো আদায় করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও লুটতরাজ বন্ধ করার ব্যাপারে যে ধারাটি সংযোজিত হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য শুধু ততটুকুই ছিল যে, মারাঠারা ভবিষ্যতে আর লুটতরাজ চালাবে না। কেননা এক্ষণে যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েছে, মূলত তারাই ছিল অরাজকতা সৃষ্টিকারী। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, এখন আমরা অরাজকতা ঠেকাবো। অন্য কথায়, এখন আমরা অরাজকতা সৃষ্টি করবো না। এ ধারার মোদ্দাকথা দাঁড়ায় এই যে, মোগল সরকার মেনে নিল যে, দাক্ষিণাত্যে তার অধিকৃত এলাকার মানুষের জানমালের নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে মারাঠাদের কৃপার ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত, ১৫ হাজার মারাঠা সৈন্য মোগল শাহীর স্বার্থ রক্ষার্থে প্রস্তুত রাখা সংক্রান্ত ধারা আসলে সাম্রাজ্যের উপকারার্থে রাখা হয়নি বরং শুধুমাত্র হোসেন আলী খানের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ হয়েছিল। কখনো সম্রাটের প্রতিরোধের জন্য তাকে দিল্লী যেতে হলে মারাঠারা তাকে সামরিক সাহায্য দেবে—এটাই ছিল এর মূলকথা। কার্যত হোসেন আলী খান চলে যাওয়ার পর দাক্ষিণাত্যের সুবেদার কিংবা কোন এলাকার শাসক মারাঠাদের কাছ থেকে তেমন কোন সামরিক সাহায্য পায়নি।

সম্রাটের অনুমতি ছাড়া চুক্তি সম্পাদন

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই চুক্তি আগাগোড়া মারাঠা স্বার্থের অনুকূল ছিল এবং এতে মোগল সরকারের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নিহিত

ছিল না। কিন্তু হোসেন আলী খান নিছক নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে—আর তাও অত্যন্ত তুচ্ছ স্বার্থে—তা মঞ্জুর করেন। তিনি সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই এই চুক্তি অনুমোদন করে সাহুর গোমস্তাদেরকে ৩৫ শতাংশ রাজস্ব ও শুল্ক আদায়ের জন্য সমস্ত মোগল শাসিত এলাকায় অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়ে দেন। পরে সম্রাট এই কার্যক্রমের কথা জানতে পেরে এরূপ ক্ষতিকর চুক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু সম্রাটের মানা না মানাকে হোসেন আলী খান তোয়াক্কাই করতেন না।

ইতিমধ্যে ঘটনাপ্রবাহ ভিন্ন খাতে মোড় নেয়। দিল্লী থেকে হোসেন আলী খানের কাছে ক্রমাগত খবর আসতে থাকে যে, সম্রাটের সাথে তার ভ্রাতা আবদুল্লাহ খানের কোন্দল চলছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আওরংগাবাদ ছেড়ে দিল্লী চলে যান। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এবার আমি হোসেন আলী খানের দিল্লী ত্যাগের পর থেকে রাজধানীতে সংঘটিত ঘটনাবলী বর্ণনা করবো।

মুরাদাবাদের শাসনকর্তা হিসেবে নিযামুল মুল্‌কের নিয়োগ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হোসেন আলী খান দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার আগে মীর জুমলাকে পাটনা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে শাহী মহলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র আঁটা হতো, তার একটা প্রধান স্তম্ভের পতন ঘটে। হোসেন আলী খানের রওনা হয়ে যাওয়ার তিন মাস পর ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মোতাবেক ১১২৭ হিজরী সনের জমাদিউস্‌ সানীতে নিযামুল মুল্‌ক দিল্লী পৌঁছেন। এ যাবত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে নিযামুল মুল্‌কের অত্যন্ত সুসম্পর্ক বিরাজ করছিল। এমনকি তারা দু' ভাই নিযামুল মুল্‌ককে নিজেদের বড় ভাই বলে আখ্যায়িত করতেন। কিন্তু দুই ভাই যখন সাম্রাজ্যের ভেতরে যা ইচ্ছে তাই করা শুরু করলেন এবং নিযামুল মুল্‌ককে দাক্ষিণাত্য থেকে অপসারিত করে তার গৃহীত মহৎ উদ্যোগ ও কার্যক্রমকে নিষ্ফল করে দেয়া হলো, তখন তিনি মনে মনে তাদের উভয়ের ওপর চটে গেলেন। সর্বপ্রথম তিনি তাঁর ক্ষোভের প্রকাশ ঘটালেন এভাবে যে, দাক্ষিণাত্য থেকে আসার সময় হোসেন আলী খানের মাত্র কয়েক মাইল দূর দিয়ে চলে গেলেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তার সাথে দেখা করে গেলেন না। হোসেন আলী খান এতে নিজেকে অপমাণিত বোধ করলেন। কেননা তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি এবং পদমর্যাদায় নিযামুল মুল্‌কের ঊর্ধে। তবে আবদুল্লাহ খান কেবল এতটুকু ব্যাপার নিয়ে তার ওপর রুষ্ট হতে চাইছিলেন না। তাই তিনি দিল্লী থেকে বেরিয়ে বারাপুলা পর্যন্ত যেয়ে তাঁকে স্বাগত জানান এবং অতিশয় অনুনয় বিনয় করে তাঁকে বলেন ঃ "সকল মন্ত্রীত্বের প্রেরণার উৎস আপনি। সুবেদারী থাকা না থাকায় আপনার মর্যাদার কিছু এসে যায় না। কেবলমাত্র

ভুল বুঝাবুঝি দূর করার জন্য প্রধান সেনাপতির দাক্ষিণাত্য গমন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এখন আপনি যে প্রদেশই চাইবেন, সেটা আপনার জন্য প্রস্তুত।" এসব মিষ্টি মিষ্টি তোষামোদী কথাবার্তার পেছনে কি মনোভাব সক্রিয় ছিল, সেটা নিযামুল মুল্‌কের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তিনি আবদুল্লাহ খানের প্রস্তাবিত কোন পদই গ্রহণ না করে পুনরায় সেই নির্জন প্রকোষ্ঠে আশ্রয় নিলেন। যেখানে তিনি বাহাদুর শাহ ও জাহাঁদার শাহের আমলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নিযামের মত তেজস্বী ও কুশলী আমীরকে উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করা এবং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্তৃত্ব অবসানের চেষ্টায় নিয়োজিত দলটির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার এক দুর্লভ সুযোগ ফররুখ শিয়ারের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছিল। দুই ভাই এর একজন হাজার মাইল দূরে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করছে, আর অপরজন সাম্রাজ্যের যাবতীয় কাজকর্ম রতন চাঁদের হাতে ন্যস্ত করে আমোদ-ফূর্তিতে ডুবে রয়েছে—এরূপ পরিস্থিতিতে সম্রাট যদি শাসনকার্যের ভার নিযামুল মুলকের হাতে সোপর্দ করতেন, তাহলে তিনি অতি সহজেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বেচ্ছাচারিতার মূলোচ্ছেদ করতে পারতেন। কেননা সামরিক দক্ষতায় তিনি এই দু'জনের চেয়ে কম ছিলেন না। আর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় তো তাঁর সাথে তাদের তুলনাই চলে না। পক্ষান্তরে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সমর্থনে যদি বারেহার সৈয়দ পরিবার থেকে থাকে, তবে নিযামের সমর্থনে গোটা মোগল শাহীর জনগোষ্ঠী ছিল। কিন্তু সম্রাটের নিজস্ব বিচার-বিবেচনা ও বোধশক্তি লোপ পেয়েছিল। তার চারপাশে অযোগ্য ও অসৎ লোকদের ভীড় জমে উঠেছিল। তারা সঙ্গত কারণেই আশংকা করতো যে, কোন সুযোগ্য লোক সম্রাটের ওপর প্রভাবশালী হয়ে গেলে প্রাসাদ রাজনীতিতে তাদের জারিজুরি আর খাটবে না। এরা সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর লোক ছিল। তাদের মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা, কথাবার্তা, চাল-চলন, সামাজিক আচরণ রীতি—সবকিছুতেই এত নীচতা ও হীনতা থাকতো যে, আলমগীরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিযামুল মুল্‌কের তাদের সাথে বনিবনা হওয়া অসম্ভব ছিল। এ জন্য দু' বছর পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকেন। অবশেষে হিঃ ১১২৯ সনের জমাদিউল আওয়াল মোতাবেক ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাট যখন তাঁকে মুরাদাবাদ এলাকার[১] শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে অন্য কাউকে প্রতিনিধি করে পাঠানোর পরিবর্তে নিজেই সেখানে চলে যান। কেননা এই ষড়যন্ত্রের উৎপত্তিস্থল থেকে দূরে থাকাকেই অধিকতর শ্রেয় মনে করেন।

ফররুখ শিয়ার ও আবদুল্লাহ খানের বিরোধ

দু' বছর যাবত ফররুখ শিয়ার তার এসব উপদেষ্টার পরামর্শ অনুসারে চলতে থাকেন। এই সময়ে তার সাথে সৈয়দ আবদুল্লাহ খানের দ্বন্দ্বও যথারীতি

১. মনবা রাম লিখেছেন যে, নিযামুল মুল্‌কের শাসনাধীন মুরাদাবাদের মধ্যে সাস্তা মুরাদাবাদ এবং আরো কয়েকটি এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা ইতিপূর্বে অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

অব্যাহত থাকে। এই দু' বছরে কোন কাজে তিনি যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকেন, তবে সেটি শুধু এই যে, তিনি এনায়াতুল্লাহ খান কাশ্মীরীকে[১] পুনরায় তলব করে এনে একান্ত সচিব নিয়োগ করেন। সম্রাট আওরংগজেবের আমলেও তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু রতন চাঁদ ও আবদুল্লাহ খান এই নিয়োগের প্রবল বিরোধিতা করেন। এ ঘটনা সম্রাট ও উজীরের মধ্যে মতবিরোধের আরো একটা উপাদান যোগ করে। আবদুল্লাহ খান একাধারে তিন মাস চার মাস যাবত মন্ত্রণালয়ের দফতরের মুখও দেখতেন না। এনায়াতুল্লাহ এ ব্যাপারে আপত্তি তুললেন। এনায়াতুল্লাহ অমুসলিমদের ওপর জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তন করলেন। এতে রতন চাঁদ আপত্তি তুললো। এনায়াতুল্লাহ জাইগীরসমূহের খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, বহু লোক ঘুষ ও জাল দলীলের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভূমি অন্যায়ভাবে জাইগীর হিসেবে লাভ করেছে। তিনি এ জাতীয় সকল জাইগীরের বরাদ্দ বাতিল ও ভবিষ্যতে যাতে আর এ ধরনের বরাদ্দ হতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। কিন্তু রতন চাঁদ এর বিরোধিতা করলো। কেননা এটাই ছিল তার আয়ের প্রধান উৎস। খাস জমী বন্দোবস্ত দেয়ার প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে এনায়াতুল্লাহ দেখলেন যে, রতন চাঁদ আমানী প্রথা[২] রহিত করে ইজারা প্রথা চালু করছে। ইজারা দেয়াতে তার সুবিধা ছিল এই যে, যে ব্যক্তি বেশী টাকা সেলামী দিতে পারতো তার নামে সে ইজারার বন্দোবস্ত দিত। কিন্তু সরকারের লোকসান ছিল এই যে, ইজারাদার নিজের সেলামী দেয়া অর্থের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী অর্থ প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতো। আর এতে করে প্রজারা এত গরীব হয়ে যেত যে, সরকারকে খাজনা দেয়ার যোগ্য থাকতো না। এভাবে সরকারের আয় দিন দিন হ্রাস পেয়ে চলছিল। এনায়াতুল্লাহ এই প্রথার সংস্কার সাধন করতে চাইলে রতন চাঁদ তাতেও বাদ সাধলো। এনায়াতুল্লাহ রতন চাঁদের চাঁইদের আয়ের হিসেব নিরীক্ষা করলেন। এতে দেখা গেল তাদের কাছে সরকারের অনেক টাকা পাওনা। এসব টাকা আদায় করার চেষ্টা করা হলে রতন তাদের পক্ষ সমর্থন করলো এবং রাজকীয় আদেশ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করলো। এসব ক্ষেত্রে বিরোধের প্রধান উৎস ছিল স্বয়ং রতন চাঁদ ও তার স্বার্থ। অথচ আবদুল্লাহ খান রতন চাঁদের পক্ষ নিতেন। এ কারণে তার সাথে সম্রাটের শত্রুতা ক্রমেই বাড়তে লাগলো।

মুহাম্মদ মুরাদ কাশ্মীরীর আবির্ভাব ও তার ষড়যন্ত্র

এই সময় সম্রাট এই ভেবে শংকিত হয়ে ওঠেন যে, কোন্দলের খবর শুনে পাছে হোসেন খান দাক্ষিণাত্য থেকে চলে না আসে। তাই তিনি মুহাম্মদ আমন

---

১. এই এনায়াতুল্লাহ খানেরই পুত্র হেদায়াতুল্লাহ খান বাহাদুর শাহের আমলে ওজারত খান খেতাব নিয়ে সহকারী মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

২. বেতনভুক কর্মচারীর মাধ্যমে সরাসরি ভূমির ব্যবহার।

খান চেন বাহাদুরকে মালোয়ের সুবেদার নিযুক্ত করে, হোসেন খানের আগমন রোধের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। কিন্তু মুহাম্মদ আমীন স্বীয় কর্মস্থলে যেতে গড়িমসি করতে থাকেন। তার গড়িমসি যতই বাড়তে লাগলো, সম্রাটও ততই অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন। তৃতীয় তোজেক নামক একটি বাহিনীর অধিনায়ক জনৈক কাশ্মীরী বংশোদ্ভূত মুহাম্মদ মুরাদ মুহাম্মদ আমীন খানকে রওনা হতে সম্মত করার দায়িত্ব নিল এবং সে একটা বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে এ কাজে সফল হলো। ফররুখ শিয়ারের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে এটা এত বড় কৃতিত্ব বিবেচিত হলো যে, তিনি সেই দিন থেকেই মুহাম্মদ মুরাদকে নিজের একান্ত উপদেষ্টা ও গোপনীয় দফতরের সচিব নিয়োগ করে ফেললেন। মীর জুমলা চলে যাওয়ায় যে পদটি শূন্য ছিল, তা এভাবে পূরণ করা হলো। ৬২ বছরের এই বৃদ্ধ স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য সর্বমহলে ধিকৃত ও কুখ্যাত ছিল।[১] তার একমাত্র যোগ্যতা ছিল চটকদার কথাবার্তা দ্বারা মানুষের মন ভুলানো। মিথ্যা প্রলোভন ও প্রবঞ্চনায় তার কোন জুড়ি ছিল না। এ ছাড়া তার আর কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। আওরংগজেবের আমলে সে পাঁচ শতকী পদবীর অধিকারী ছিল। বাহাদুর শাহের আমলে হয়ে গেল হাজারী এবং ওকালত খান খেতাব পেল। জাহাঁদার শাহের আমলে সে কোকিলতাশ খান (আলী মুরাদ) এর সাথে দহরম মহরম গড়ে তোলে এবং পাঁচ হাজারী পর্যন্ত পদোন্নতী পায়। ফররুখ শিয়ার যখন আগ্রা জয় করে দিল্লী পৌঁছলেন, তখন সে বধযোগ্য লোকদের তালিকাভুক্ত ছিল। কিন্তু সৈয়দ আবদুল্লাহ খান ও হোসেন আলী খানের সাথে তার আগে থেকেই গাটছড়া ছিল। তাই তাদের সুপারিশে সে ক্ষমা পেয়ে যায় এবং দোহাজারী পদবী লাভ করে। পরবর্তীকালে হোসেন আলী খানের কৃপায় সে মুহাম্মদ মুরাদ খান খেতাব, দু হাজার পাঁচ শতকী পদবী ও তৃতীয় তোজেক বাহিনীর সেনাপতির পদ লাভ করে। এদিক থেকে তার প্রাণরক্ষা ও পদোন্নতি—দুটোই ছিল সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মহানুভবতার ফল। কিন্তু সে যখন দেখলো যে, সম্রাটের নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম উপায় ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধিতা করা, তখন সে তাদের সমস্ত অনুগ্রহ ভুলে বসলো এবং তাদের কুৎসা রটনা, তাদের উচ্ছেদের জন্য নতুন নতুন ফন্দি উদ্ভাবন ও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আটায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। ক্রমে ক্রমে সে সম্রাটের মন থেকে সামসামুদ্দৌলা খানে দাওরান খাজা আসেমের প্রভাবও মুছে ফেললো এবং তার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করলো যে, খানে দাওরান গোপনে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা। তাই তাদের মোকাবিলায় কোন কৌশল সফল হওয়া সম্ভব নয়। এসব কলাকৌশল দ্বারা সে সম্রাটের ওপর এত প্রভাব বিস্তার করে বসলো যে, সম্রাট তাকে নিজের সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং সাম্রাজ্যের সবচেয়ে

১. আবুল ফয়েজ এই ব্যক্তির চরিত্র চিত্রন করতে যেয়ে বলেছেন ঃ "অজ্ঞাত কুলোদ্ভব, সর্বজন ধিকৃত মুহাম্মদ মুরাদ, নির্বোধ সম্রাটের পথনির্দেশক হয়ে বসলো। আর তারই কুপ্ররোচনার দরুন দেশ, অনাচার ও অরাজকতা দেখা দিল।---কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণকারী ছিল, যদিও জনগণকে তাদের প্রাপ্য দিত না।"

যোগ্য ব্যক্তি মনে করতে লাগলেন। তিনি তাকে রুকনদ্দৌলা ইতিকাদ খান বাহাদুর ফররুখ শাহী খেতাব, সাত হাজারী, দশ হাজার সওয়ার পদবী, হরকরার দারোগা,[১] বিশিষ্ট লোকদের দারোগা ও লাঠিয়ালদের দারোগা পদে নিয়োগ দান করলেন। গুজরাট, দিল্লী ও আগ্রার উৎকৃষ্টতম জমী তাকে জাইগীর হিসেবে বরাদ্দ করলেন। কিন্তু মুহাম্মদ মুরাদ চটকদার কথা বলা ছাড়া আর কিছুর সামর্থ রাখতো না। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে প্রকাশ্য মোকাবিলা করার সাহসও তার ছিল না, যোগ্যতাও ছিল না। তাই সে সম্র-টকে পরামর্শ দিল যে, বিহারের সুবেদার সারবলন্দ খানকে ডেকে এনে তার শক্তি দ্বারা সৈয়দ দ্বয়কে খতম করা হোক। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তলব মোতাবেক সারবলন্দ খান দিল্লী পৌঁছলো। মুহাম্মদ মুরাদ তাকে সাত হাজারী ও ছয় হাজারী সওয়ার পদবী এবং মুবারিজুল মুল্ক সারবলন্দ খান নাম্যোয়ার জং খেতাব আদায় করে দিল এবং আশ্বাস দিল যে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে উচ্ছেদ করে দিতে পারলে তাকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু সারবলন্দ খান অন্য সূত্রে জানতে পারলো যে, এ আশ্বাস প্রবঞ্চনা মাত্র। মন্ত্রীর পদ অন্য একজনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সে নিজেকে বিপদের ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করার আগে স্বয়ং সম্রাটের কাছ থেকে প্রকৃত সত্য জেনে নেয়া জরুরী মনে করলো। একদিন জিজ্ঞেস করলো যে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের উচ্ছেদের পর তিনি কাকে মন্ত্রী নিয়োগ করতে ইচ্ছুক ? সম্রাট নিঃসংকোচে জবাব দিলেন যে, "আমার দৃষ্টিতে এ পদের জন্য ইতিকাদ খানের চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কেউ নেই।" এ জবাব শুনে সারবলন্দ খানের আগ্রহ নিস্তেজ হয়ে পড়লো। সে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে আর কোন তৎপরতায় প্রবৃত্ত হলো না। সৈয়দ আবদুল্লাহ খান তাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে নিলেন। এরপর যোধপুরের রাজা অজিত সিংকে নির্বাচন করা হলো। অজিত সিং সম্রাটের শ্বশুরও বটে। তাকে আনার জন্য নাহির খান নামক এক ব্যক্তিকে পাঠানো হলো। এই ব্যক্তি সম্রাটের হীতাকাংখী বলে বিশ্বাস করা হতো। কিন্তু আসলে সে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মিত্র ছিল। সে অজিত সিংকে ডেকে আনলো বটে। তবে সম্রাটের নয় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বন্ধু বানিয়ে আনলো। এদিক থেকেও হতাশ হওয়ার পর এবার দৃষ্টি দেয়া হলো নিযামুল মুল্‌কের ওপর। ১৭১৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে তাকে মুরাদাবাদ থেকে তলব করা হলো। তিনি এসে সম্রাটকে বললেন ঃ "আপনি আমাকে উজীর নিয়োগ করুন এবং যুদ্ধ ব্যয় হিসেবে নগদ ৪০ লাখ রুপিয়া দিন। আবদুল্লাহ খানের সাথে বুঝাপড়া যা করতে হয় আমি নিজেই করবো।" কিন্তু সম্রাট তার এ আবেদন মঞ্জুর করলেন না। তিনি বরং

---

১. মোগল সাম্রাজ্যের হরকরার দারোগা আব্বাসী সাম্রাজ্য 'সাহেবুল বারীদ'-এর সমার্থক ছিল। এ পদটি সরাসরি সম্রাটের তত্ত্বাবধানে থাকতো। সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীরও এর ওপর কোন কর্তৃত্ব থাকতো না। এর দায়িত্ব ছিল সম্রাটকে দেশ, জনগণ ও ছোট বড় সকল সরকারী কর্মচারীর অবস্থা ও গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করা। একে আধুনিক যুগের গোয়েন্দা বিভাগের সমার্থক ধরে নেয়া যায়।

কোন কিছু প্রকাশ না করে নিজস্ব কোন অনুগত লোক দিয়ে গোপনে সৈয়দ আবদুল্লাহকে হত্যা করিয়ে দেয়ার আবদার করলেন নিযামুল মুল্‌কের কাছে। নিযামুল মুল্‌ক এ পদ্ধতিতে কাজ করা পছন্দ করলেন না। এর ফলে সম্রাট তাঁকে মুরাদাবাদের শাসক পদ থেকে অপসারণ করলেন। অতপর মুরাদাবাদকে রুকনাবাদ নাম দিয়ে একটা স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা দিয়ে মুহাম্মদ মুরাদ খানকে তার সুবেদার নিযুক্ত করলেন। এভাবে নিযামুল মুল্‌কও সম্রাটের বন্ধুর তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেলেন। এবার নির্বাচন করা হলো মীর জুমলাকে। তাকে লাহোর থেকে তলব করা হলো।[১] এতে সৈয়দ আবদুল্লাহ হুমকি দিলেন যে, মীর জুমলাকে ডেকে আনলে যে চুক্তির বলে হোসেন আলী খানকে দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়েছিল, তা ভেঙ্গে যাবে। ফররুখ শিয়ার একথা শুনে এত ভড়কে গেলেন যে, মীর জুমলার তলবী আদেশ তৎক্ষণাত বাতিল করলেন এবং তাকে পথিমধ্য থেকেই ফেরত পাঠানোর জন্য দূত প্রেরিত হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও মীর জুমলা ১৭১৮ খৃঃ সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে উপনীত হলেন। এখানে এসে যখন দেখলেন সম্রাটের চেয়ে মন্ত্রীর দাপট এখন বেশী, তখন সৈয়দ আবদুল্লাহ খানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং তার মিত্রদের দলভুক্ত হয়ে গেলেন। ফররুখ শিয়ার এই বিশ্বাসঘাতকতায় এত চটে গেলেন যে, তিনি মীর জুমলার সকল পদপদবী ও খেতাব কেড়ে নিলেন এবং তাকে আবদুল্লাহ খানের আবাসস্থল থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য লোক পাঠালেন। ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী এ পদক্ষেপকে তাঁর জন্য অবমাননাকর বিবেচনা করলেন এবং তার বিরুদ্ধে সম্রাটের যুদ্ধ ঘোষণা বলে গণ্য করলেন। তিনি সেই দিনই (২৯শে সেপ্টেম্বর, মোতাবেক ৫ই জিলকদ) হোসেন আলী খানের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠালেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে আসেন।

দাক্ষিণাত্য থেকে হোসেন আলী খানের প্রত্যাবর্তন

মারাঠাদের সাথে আপোষ-রফা করার পর হোসেন আলী দিল্লী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন। আবদুল্লাহ খানের বার্তা পৌঁছা মাত্রই তিনি ২৩ নভেম্বর ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে আওরংগাবাদ থেকে রওনা হয়ে গেলেন। স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও পালিত পুত্র ২০ বছরের তরুণ আলম আলী খানকে তিনি ভারপ্রাপ্ত সুবেদার হিসেবে রেখে এলেন। সাথে করে নিয়ে গেলেন ১৫ হাজার অশ্বারোহী ও ১০ হাজার পদাতিক সৈন্যের এক বাহিনী। এই বাহিনীতে বালাজি বিশ্বনাথ ও

---

১. মীর জুমলা পাটনার সুবেদারীতে অকৃতকার্য হয়ে দিল্লী পালিয়ে এসেছিলেন। পরে তাকে পাঞ্জাবের সুবেদার নিযুক্ত করে পাঠানো হয়।

খান্ডোরাও ভারের নেতৃত্বাধীন ১২ হাজার মারাঠা সৈন্যও ছিল।[১] ফররুখ শিয়ারকে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য সে সবচেয়ে মারাত্মক যে কৌশল অবলম্বন করলো সেটা এই যে, তৈমুর বংশোদ্ভূত জনৈক তথাকথিত যুবরাজকে সাথে করে আনলো, যাতে প্রয়োজনের সময় তাকে সিংহাসনের দাবীদার হিসেবে দাঁড় করিয়ে ফররুখ শিয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। এই তরুণ দাক্ষিণাত্যের জনৈক কাজীর পুত্র ছিল। বাহ্যিক চেহারা সুরতের দিক দিয়ে তাকে সত্যিই একজন রাজপুত্র মনে হতো। হোসেন আলী খান রটিয়ে দিল যে, এই তরুণ সম্রাট আওরংগজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরের পুত্র মঈনুদ্দীন। রাজা সাহু একে এই শর্তে আমার কাছে সোপর্দ করেছে যে, এর বিনিময়ে আমি যেন সম্রাটের কাছ থেকে সাহুর মা ও বোনকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করি। তার এই রটনার যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য হোসেন আলী পথিমধ্যস্থ যাত্রা বিরতি স্থলে তথাকথিত ঐ যুবরাজের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ শিবির, আস্তাবল এবং পতাকা ইত্যাদির ব্যবস্থা করলো, যা তৈমুর বংশোদ্ভূত যুবরাজদের জন্য তৎকালে প্রচলিত রীতি ছিল। তা ছাড়া নিজে প্রতিদিন তার সামনে উপস্থিত হয়ে রাজকীয় প্রথাসিদ্ধ কায়দায় অভিবাদন জানাতো।

সম্রাটের অসহায় অবস্থা ও কাকুতি মিনতি

এসব ভয়ংকর তথ্যাদি জানতে পেরে ফররুখ শিয়ার অজানা আশংকায় আতংকিত হয়ে উঠলেন। হোসেন আলী খানের জনৈক ঘনিষ্ট সহৃদ এখলাস খানকে তিনি হোসেন আলী খানের নিকট পাঠালেন যেন তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে দাক্ষিণাত্যে ফেরত পাঠায়। এই লোকটি মান্ডুর কাছে গিয়ে হোসেন আলীর সাথে সাক্ষাত করলো। কিন্তু সে সম্রাটের দূতিয়ালীর দায়িত্ব পালন করার পরিবর্তে উল্টো তাকে জানালো যে, দিল্লীতে তার ভাই-এর জীবন সত্যিই হুমকির সম্মুখীন এবং তার দিল্লী যাওয়া অত্যাবশ্যক। তাই হোসেন আলী খান তার দিল্লী যাত্রার গতি ক্ষিপ্রতর করলো। উজ্জয়িনীতে অবস্থানরত মালোহের সুবেদার মুহাম্মদ আমীন খানকে সম্রাট হোসেন আলী খানের গতিরোধ করার নির্দেশ পাঠালেন। কিন্তু মুহাম্মদ আমীন খান নির্দেশ পালনের পরিবর্তে সোজা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সম্রাট আমীন খানের খেতাব ও পদবী প্রত্যাহার করলেন। সৈয়দ আবদুল্লাহ খান এই সুযোগ গ্রহণ করে আমীন খানকেও মিত্র বানিয়ে ফেললেন। এই সাথে আবদুল্লাহ খান নিযামুল মুলকেও মিত্র বানাতে চেষ্টা করলেন। কেননা আগামীতে এই দুই ভাই যে কার্যক্রম গ্রহণ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, তাতে একমাত্র নিযামুল মুল্‌কের পক্ষ থেকেই তারা বিরোধিতার আশংকা করতেন। এ জন্য ১১৩১ হিজরীর ১৮ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী আবদুল্লাহ স্বয়ং নিযামুল মুল্‌কের সাথে সাক্ষাত করতে যান। এর তিন চার দিন পর তাকে

---

১. এই মারাঠা বাহিনীকে হোসেন আলী খান নর্বদা অতিক্রম করার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত মাথা প্রতি দৈনিক ৮ আনা হিসেবে মজুরী দিয়েছিলেন।

নিজের বাসভবনে দাওয়াত দিয়ে আনলেন এবং মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিলেন। এর পরের দিন সম্রাটের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য বিহারের সুবেদারীর নিয়োগপত্র আদায় করে দিলেন। এভাবে হোসেন আলী খানের পৌঁছার আগেই আবদুল্লাহ খান সারবলন্দ খান, অজিত সিং, নিযামুল মুল্‌ক, মুহাম্মদ আমীন খান এবং অন্য সকল প্রভাবশালী আমীরকে ফররুখ শিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্তত এতখানি স্বপক্ষে নিয়ে নিলেন যে, তাদের পক্ষ থেকে তাঁর কোন বিরোধিতার ঝুঁকি রইল না। অতপর জয়পুরের শাসনকর্তা রাজা জয় সিং ছাড়া আর কোন আমীর ফররুখ শিয়ারের সমর্থক ছিল না।

রবিউল আউয়ালের শেষের দিকে হোসেন আলী খান দিল্লীর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। সম্রাটের অবস্থা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তোষামোদের আতিশয্যে তাকে প্রত্যেক যাত্রা বিরতিস্থলে ফলমূল, পান, সুগন্ধি দ্রব্য ও স্বাগত সম্ভাষণ পাঠাতে লাগলেন। পক্ষান্তরে হোসেন আলী খান এমন দাপট দেখাতে লাগলেন যে, প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে লাগলেন "আমি এখন আর সম্রাটের অধিনস্থ কর্মচারী নই" এমনকি দিল্লীর উপকণ্ঠে ফিরোজ শাহের কুঠিরাড়ীতে তিনি যখন যাত্রা বিরতি করলেন, তখন রাজকীয় রীতিপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের সামনে নহবত বাজালেন। এটা তার পক্ষ থেকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভীতসন্ত্রস্ত সম্রাট এই ভেবে আশ্বস্ত রইলেন যে, তোষামোদ করে তাকে মানিয়ে নিতে পারবেন। তাই সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করে তাকে দুর্গে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। হোসেন আলী খান জবাব দিলেন যে, দুর্গের প্রহরা, কামানাগারের তত্ত্বাবধান ও সম্রাটের ব্যক্তিগত সেবা কার্যে যতক্ষণ আমার লোকদেরকে নিয়োগ করা না হবে, ততক্ষণ আমি আসতে পারি না। নির্বোধ সম্রাট এসব দাবীও মেনে নিলেন। দুর্গ থেকে পাঁচ ছয় হাজার রাজকীয় সৈন্য সমেত সামসামুদ্দৌলাকে বিদায় দেয়া হলো। দুর্গের ভেতরের যেসব পদে তখন সম্রাটের লোকেরা কার্যরত ছিল, তার সবকটি হোসেন আলী খানের মনোনীত লোকদেরকে দেয়া হলো। এভাবে সম্রাট আপনা আপনি নিজের শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে গেলেন। রাজা জয় সিং তখনো ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত ছিল। সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্রাটকে এসব দাবী মানতে নিষেধ করছিল। সে বললো যে, আপনি সাহস করে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিন। আমি যতক্ষণ জীবিত থাকবো আপনার কোন ক্ষতি হতে দেব না। আমার বিশ্বাস, আপনি একবার রুখে দাঁড়ালে যেসব আমীর ওমরা এখন নীরব দর্শক হয়ে তামাশা দেখছে, তারা সকলে আপনার পতাকার নীচে সমবেত হবে। কিন্তু ফররুখ শিয়ার তার কোন কথায় কর্ণপাত তো করলেনই না, অধিকন্তু তাকে দিল্লী থেকে তার আবাসভূমি আম্বেরে চলে যাওয়ার আদেশ দিলেন। যখন সম্রাটের কাছে তাঁর সমর্থকদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ মুরাদ খান, বিশেষ সচিবালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ইমতিয়াজ খান এবং জাফর খান (যিনি পরবর্তীকালে রওশনুদ্দৌলা ও মুহাম্মদ শাহের

ঘনিষ্ট বন্ধুতে পরিণত হন) ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। তখন হোসেন আলী খান ও আবদুল্লাহ খান তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। সে সময় দিল্লীর দরজা থেকে লালকেল্লার দরজা পর্যন্ত মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল।[১] ফররুখ শিয়ার হোসেন আলী খানের কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি রাখেন তা ছিল এই যে, "তোমাদের বন্দী যুবরাজ আকবরের পুত্র কোথায়?" হোসেন আলী খান জবাব দিলেন যে, সে আমার সাথেই আছে। তবে মারাঠারা এই অংগীকার নিয়ে তাকে আমার কাছে সমর্পণ করেছে যে, আমি তাকে আপনার হাতে সোপর্দ করার পূর্বে রাজা সাহুর মা ও বোনকে মুক্ত করিয়ে নেব। সম্রাট তৎক্ষণাত সাহুর বন্দীনী মা ও বোনকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হোসেন আলী খান এরপরও স্বকথিত যুবরাজকে সম্রাটের কাছে সমর্পণ করলেন না।

নগরীতে দাংগা ও মারাঠাদের পাইকারী হত্যা

অতপর ৮ই রবিউস সানী, মোতাবেক ২৭ ফেব্রুয়ারী আবদুল্লাহ খান ও অজিত সিং দুর্গে প্রবেশ করে নিজেদের নিরংকুশ সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন। সম্রাটের সকল পাত্রমিত্র বর্গকে এমনকি মুহাম্মদ মুরাদ খানকেও তাড়িয়ে বের করলেন। একই দিন হোসেন আলী খান তার সমগ্র বাহিনী সমেত দিল্লীতে প্রবেশ করলেন এবং শায়েস্তা খানের দুর্গে আশ্রয় নিলেন। আবদুল্লাহ খান দুর্গে রাত্র যাপন করলেন। পরদিন গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, আবদুল্লাহ খানকে দুর্গের মধ্যে হত্যা করা হয়েছে। আর যায় কোথায়! সম্রাটের সমর্থকরা মুহাম্মদ মুরাদ খান, সাদাত খান (সম্রাটের শ্বশুর) এবং আরো কয়েক ব্যক্তির নেতৃত্বে হোসেন আলী খানের লোকদের ওপর হামলা চালালো। এই হামলার সাথে সাথেই মোগল সৈন্যদের সাথে মারাঠা সৈন্যদের সংঘর্ষ বেধে গেল। কয়েক দফা সংঘর্ষের পর মারাঠা সৈন্যরা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাতে আরম্ভ করলো। ঐতিহাসিক খাফি খান এই সময় দিল্লীতেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি মারাঠাদের এই শোচনীয় দুর্দশার কথা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

"বাজারের বখাটে ছোকরারা, নীরব দর্শকরা ও কর্মচ্যুত মোগলরা সচেতন হয়ে গেল। চারিদিক থেকে কেউবা উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে কেউবা খালী হাত বাগিয়ে ঐ হতভাগা বাহিনীর ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। তাদের কারো মাথা থেকে পাগড়ী, কারো দেহ থেকে মাথা, কারো হাত ও কোমর থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিতে লাগলো। এমনকি কসাইরা, দোকানীরা, ঝাড়ুদাররা ও বাজারের অন্যান্য কেনাকাটায় লিপ্ত লোকেরা পর্যন্ত তরবারী মেরে, কটুবাক্য ছুড়ে, রক্তচক্ষুর বিষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে—এক কথায়, যে যেভাবে পারে সেইভাবেই হানাদার, অত্যাচারী, হিংস্র সৈন্যদেরকে পাকড়াও করতে লাগলো।----------

---

১. ইতিহাসে এটাই ছিল মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে মারাঠা সৈন্যদের প্রবেশের প্রথম ঘটনা।

পলায়নপর সেই সব নির্লজ্জ সৈন্যদের অনেকেই আপাদমস্তক উলংগ হয়ে সারা গায়ে নোংরা ময়লা ও আবর্জনা জড়িয়ে মুখে মাটি কাঁদা মেখে লোকজনের কাছে কাকুতি মিনতি সহকারে প্রাণের নিরাপত্তা চাইতে চাইতে পাল্লাহ দিয়ে পালাতে লাগলো। ইজক দুর্গের নিকটবর্তী চক সাদুল্লা খানের মোড় থেকে শুরু করে তিন চার ক্রোশ অবধি সর্বত্র সেই বিধর্মী গোষ্ঠীর লোকেরা নিহত বা আহত হয়ে সড়কে ও বাজারে কাতারে কাতারে পড়েছিল।"

অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনাও অনেকটা এ রকমই। তারা লিখেছেন যে, শত শত হাজার হাজার মারাঠা "ওরে বাপরে ! ওরে বাপরে !" বলতে বলতে পালিয়ে যাচ্ছিল। পথে কোথাও কোন দোকানদার তাদের দেখে একটু নড়াচড়া করলেই তারা নিজ নিজ তলোয়ার ও ঢাল ছুড়ে ফেলে দিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে "নাকো" "নাকো" (মারাঠা ভাষায় এর অর্থ "না") বলতে বলতে কৃপা ভিক্ষা করতে করতে পালাতে থাকে। এই দাংগা হাঙ্গামায় প্রায় দেড় হাজার থেকে দু' হাজার মারাঠা নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে সম্ভাজি ভোসলে ও আরো কয়েকজন নামকরা মারাঠা সরদারও ছিল। আর মারাঠাদের অপরিমেয় অর্থ সম্পদও লুণ্ঠিত হয়।[১]

ফররুখ শিয়ারের পতন

মারাঠাদের এই পরাজয়ে সম্রাটের সমর্থকদের সাহস আরো বেড়ে গেল এবং তারা হোসেন আলী খানের অবস্থান স্থলে হামলা চালালো। হোসেন আলী খান এ অবস্থা দেখে আবদুল্লাহ খানকে বার্তা পাঠালেন যে, এখন আর বসে থাকা চলে না। তাই আবদুল্লাহ খানের আদেশে আফগান সৈন্য ও চেলা চামুণ্ডারা ফররুখ শিয়ারকে গ্রেফতার করতে প্রাসাদে ঢুকে পড়লো। মহিলাদেরকে মারধোর করে সম্রাট যে স্থানে আত্মগোপন করেছেন, তার সন্ধান জেনে নিল। সেখান থেকে তাকে টেনে হিচড়ে বের করে নিয়ে এল। সম্রাটের মা, স্ত্রী, কন্যা ও মহলের অন্যান্য বেগমরা বাধা দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু নিষ্ঠুর সৈন্যরা তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে হটিয়ে দিল এবং সম্রাটকে ভীষণ অপমানজনকভাবে টেনে আবদুল্লাহ খানের কাছে নিয়ে গেল। আবদুল্লাহ খান তার চোখে তেলের শলাকা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধ করে দিলেন। অতপর তারপুলিয়ার কাছে এক অন্ধকার কোঠায় আটক করলেন। এই হাঙ্গামার সময় শাহজাহান ও আরংগজেব অধ্যুষিত রাজপ্রাসাদে হেরেমের মহিলাদের ওপর কিরূপ অত্যাচার চলেছে, কিভাবে তাদের সম্ভ্রমহানি করা হয়েছে, কি পরিমাণ

---

১. দিল্লীতে মারাঠাদের এহেন শোচনীয় বিপর্যয় ঘটায় খাফী খান এই বলে আনন্দ প্রকাশ করেন যে, "এই ঘটনা নিছক আল্লাহর অনুগ্রহ। নচেত মারাঠারা শত শত বছর ধরে উল্লাস করতো যে, আমরা রাজধানী দিল্লীতে গিয়েছিলাম, মারাঠা বাহু বলে ভারত সম্রাটকে বন্দী করেছিলাম এবং অন্যদেরকে অনায়াসে দিল্লীতে আটক করেছিলাম।"

গহনাপত্র লুণ্ঠন করা হয়েছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কেবল এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এসব লোক যে রাজপ্রাসাদ কখনো কল্পনার চোখেও দেখতে পায়নি এবং যার রূপ জৌলুসের কাহিনী তাদের শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণরা পর্যন্ত মায়ের কোলে বসে রূপকথার মতই শুনেছিল, সেই রাজপ্রাসাদে প্রথমবারের মত সশরীরে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়ে তারা কি না করতে পারে ? অনেকের মতে, স্বয়ং সৈয়দ আবদুল্লাহ খানও এই দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যহার করতে ছাড়েননি এবং শাহী হেরেমের দু' তিনজন সুন্দরী রমনীকে হস্তগত করেন।

৬—রফিউদ্দারাজাত ও রফিউদ্দৌলা

ক্ষমতাসীন সম্রাটকে এভাবে সিংহাসনচ্যুত করার পর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে গেলেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে কেউ কেউ প্রস্তাব দেয় যে, তৈমুর বংশীয় রাজত্বের আনুষ্ঠানিকভাবে অবসান ঘটিয়ে সৈয়দ বংশীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা হোক। তখনকার পরিস্থিতি অনুসারে কারো মাথায় এ ধরনের ধ্যানধারণা উদ্ভব ঘটা যে অস্বাভাবিক ছিল না, তা নিসন্দেহে সত্য। তবে খুব সম্ভবত দু'টো কারণে এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে হয়েছিল। প্রথমতঃ দেশের সবক'টি শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠী যথা তুরানী, ইরানী, আফগানী ও রাজপুত গোষ্ঠীগুলো তৈমুর বংশধরের আনুগত্যে অবিচল ও একমত ছিল। তারা কোন অবস্থাতেই সৈয়দদের রাজত্ব মেনে নিতে রাজী হতো না। অপর দিকে এই গোষ্ঠীগুলোকে বলপূর্বক নিজেদের আনুগত্যে বাধ্য করা কিংবা তরবারীর জোরে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায় এত শক্তি সৈয়দদের কোনক্রমেই ছিল না। দ্বিতীয়ত, স্বয়ং এই দুই ভাই এর মধ্যেও স্বার্থপরতা এত বেশী ছিল যে, এক ভাই অপর ভাই এর আনুগত্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। আব্বাসীদের মধ্যে মানসুর ও সাফফাহের মধ্যে যে ঐক্য ছিল, তা এই দুই ভাই-এর মধ্যে ছিল না। এখানে বরঞ্চ পরিস্থিতি ছিল এ রকম যে, এক ভাই নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলে অপর ভাই সবার আগে তরবারী হাতে নিয়ে তাকে রুখে দাঁড়াতো। এ দুইটি কারণে ভারত সাম্রাজ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হয়েও সংঘটিত হলো না। সুতরাং খোদ তৈমুর বংশধরের মধ্য হতে একজনকে সম্রাট বানানো অপরিহার্য হয়ে উঠলো। তবে তিনি এমন ব্যক্তি হওয়া চাই যিনি কেবল সিংহাসনেই বসে থাকবেন আর দেশ শাসন করবেন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়। তাই এ ধরনের একজন মূর্খ অপদার্থ যুবরাজকে খুঁজে আনার জন্য একটি দল প্রাসাদে ঢুকলো এবং বাহাদুর শাহের পুত্র রফিউশ শানের ২০ বছর বয়স্ক যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত কনিষ্ঠ পুত্র রফিউদ দারাজাতকে ধরে আনলো। আবদুল্লাহ খান ও অজিত সিং তার হাত ধরে যে পোশাক তার পরিধানে ছিল সেই পোশাকেই ময়ুর সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। ১১৩১ হিজরীর ৯ই রবিউস সানী তারিখে শাহী বাদকদল নাকাড়া বাজিয়ে

নতুন সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণের কথা ঘোষণা করে দিল। এই ঘোষণা ফররুখ শিয়রের সমর্থকদেরকে হতোদ্যম করে দিল। হোসেন আলী খানের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছিল, মুহূর্তের মধ্যেই তা স্তিমিত হয়ে গেল এবং বিরোধী পক্ষের নেতা মুহাম্মদ মুরাদ খান, সাদাত খান ও অন্যান্যদেরকে গ্রেফতার করা হলো।

আবুল বরকত সুলতান শামছুদ্দীন নাম ধারণ করে রফিউদ দারাজাতের সিংহাসনে আরোহণের পর সর্বপ্রথম যে প্রশাসনিক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয় তা ছিল এই যে, যোধপুরের শাসক রাজা অজিত সিং এবং রাজা রতন চাঁদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চিরতরে জিজিয়া রহিত করা হলো এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা চালানো হলো। এই পর্যায়ে মুহাম্মদ আমীন খানকে দ্বিতীয় সেনাপতি এবং জাফর খানকে তৃতীয় সেনাপতি করা হয়।

মালোহের সুবেদার পদে নিযামুল মুল্ক

ফররুখ শিয়ারের শাসনামলের শেষের দিকে নিযামুল মুলককে বিহারের সুবেদার নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি স্বীয় কর্মস্থলে না গিয়ে দিল্লীতে বসেছিলেন। এই সময়ে সংঘটিত সকল ঘটনা তিনি নীরবে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। তাঁর এই নীরবতায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ভীষণ বিব্রতবোধ করেন। তারা ভালোভাবেই বুঝতেন যে, তাদের জন্য কোন দিক থেকে যদি বিপদাশংকা থেকে থাকে, তবে সেটা নিযামুল মুলকের দিক থেকেই। হোসেন আলী খানের চূড়ান্ত অভিমত ছিল যে, নিযামুল মুল্‌ককে হত্যা করা উচিত। কিন্তু সৈয়দ আবদুল্লাহ খান এর বিরোধী ছিলেন। কেননা নিযামুল মুলকের ওপর আঘাত হানা মাত্রই তুরানী গোষ্ঠীর সকল নেতা পাল্টা আঘাত হানতে সচেষ্ট হতো এবং একটা ভয়ংকর বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতো। অবশেষে স্থির হয় যে, তাঁকে রাজধানীর বাইরে কোন দূরবর্তী জায়গায় পাঠানো হবে। অতপর নিজের সমর্থকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন দুর্বল হয়ে যাবেন তখন তাকে হত্যা করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নিযামুল মুলককে মালোহের সুবেদার নিযুক্ত করা হলে তিনি প্রবল অনিহা ও ইতস্তত সহকারে তা গ্রহণ করেন। অতপর ১১৩১ হিজরীর ২৪শে রবিউস সানী মোতাবেক ১৭১৯ খৃস্টাব্দের ১৫ই মার্চ দিল্লী থেকে রওনা হয়ে যান। তবে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঘটনাবলীর একটা চিত্র তার মনে তখনই বদ্ধমূল হয়ে যায়। তাই তিনি নিজের গোটা পরিবার-পরিজন, সকল সহায়সম্পদ ও তার পরিবারের সাথে নানাভাবে সম্পর্কবন্ধনযুক্ত মোগল নেতৃবৃন্দকে নিজের সাথে নিয়ে যান। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনেক পিড়াপিড়ী সত্ত্বেও তিনি দরবারে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কোন পুত্রকে রেখে যাননি।

মারাঠাদেরকে এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ রাজস্ব আদায়ের আনুষ্ঠানিক অনুমতি

রাজা সাহুর প্রধান সহযোগী বালাজী বিশ্বনাথকে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ রাজস্ব আদায়ের রাজকীয় ছাড়পত্র দেয়া হলো। এভাবে হোসেন আলী খান ও সাহুর মধ্যে সম্পাদিত যে চুক্তি ফররুক শিয়ার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, নয়া সম্রাটের পক্ষ থেকে তাও অনুমোদিত হয়ে গেল। এ সংক্রান্ত দু'টি ছাড়পত্রের প্রথমটি ১১৩১ হিজরীর ২রা রবিউস সানী এবং দ্বিতীয়টি ১১৩১ হিজরীর ৪ঠা জমাদিউল আউয়ালে স্বাক্ষরিত হয়।

ফররুখ শিয়ারের হত্যাকাণ্ড

তখনো ফররুখ শিয়ার জীবিত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে তার বহু সমর্থক বিদ্যমান ছিল। এদের মধ্যে রাজা জয় সিং সবচেয়ে শক্তিধর ছিলেন। এসব দেখে শুনে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের আশংকা হলো যে, ফররুখ শিয়ার আবার সিংহাসন দখল করে বসতে পারেন। তাই তারা ৮ ও ৯ই জমাদিউল আউয়ালের মধ্যবর্তী রাতে ফররুখ শিয়ারকে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করলেন।[১] এই ঘটনায় সমগ্র নগরী প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অপসারিত ও নিহিত সম্রাটের মরদেহকে যখন হুমায়ুনের সমাধিস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন পনের বিশ হাজার লোকের এক রোরুদ্দমান শোক মিছিল তার সাথে যায়। দিল্লীর দুয়ার পর্যন্ত সকল সড়ক ও অলিগলিতে এবং রাস্তার দু' পাশের ভবন-সমূহের ছাদে শোকাতুর মানুষের ভীড়ে তিল ধারনের ঠাঁই ছিল না। মানুষের স্বতস্ফূর্ত কান্না ও চিৎকারের ধ্বনিতে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মরদেহের সাথে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় একদল প্রহরারত সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। এই সেনাদলের অধিনায়কত্বে ছিলেন দেলাওয়ার আলী খান ও সৈয়দ আলী খান। এরা ছিলেন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের দেহরক্ষী বাহিনীদ্বয়ের অধিনায়ক। ক্রুদ্ধ জনতা এই সেনাদলের ওপর ইট পাথর নিক্ষেপ ও অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে। ভিক্ষুকদেরকে দানদক্ষিণা হিসেবে টাকা ও রুটী দেয়া হলে তারা ঘৃণাভরে তা ছুড়ে ফেলে দেয়। ভিক্ষুকরা বহুদিন পর্যন্ত ফররুখ শিয়ারের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত রাজ কর্মচারীদের ভিক্ষা নিত না। শুধু তাই নয়, তারা যখনই শহরের সড়ক দিয়ে চলতো, জনতা তাদেরকে প্রকাশ্যে গালাগালি করতো এবং কর্কশ বাক্যবান ছুড়তে ছুড়তে পিছু ধাওয়া করতো। বিশেষত ফররুখ শিয়ারের শ্বশুর মহারাজা অজিত সিং এর প্রতি এই ঘৃণা ও ধিক্কার আরো প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ পেত। ফলে সে লজ্জায় প্রধান সড়ক দিয়ে চলাচল করাই বন্ধ করে দিয়েছিল। কিছুকাল পরে যখন সে গুজরাটের সুবেদারীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নগরীর পথ অতিক্রম করে, তখন জনতা তার ওপর এত গালাগাল বর্ষণ করে যে, সে ক্ষিপ্ত

১. নিহত হওয়ার সময় ফররুখ শিয়ারের বয়স ৩৫ কি ৩৬ বছর ছিল। কথিত আছে যে, তিনি মোগল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন ও সুঠাম দেহী ছিলেন।

হয়ে দু' তিনজনকে ধরে খুন করে দেয়। এটাতো ছিল সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া। বিশিষ্ট লোকদের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। শীয়াদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছাড়া বেশীর ভাগ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ এই কাজটিকে খুবই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। খুনীদেরকে তারা ভর্ৎসনা করেন ও ধিক্কার দেন। বেদেল নামক একজন সংসার ত্যাগী ও সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এ ব্যাপারে যে অভিমত পোষণ করেন তা তিনি স্বীয় কবিতার দু'টি ছত্রে নিম্নরূপ ব্যক্ত করেন ঃ

"দেখেছ ওরা সম্মানিত বাদশাহর সাথে কী আচরণ করলো !
কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে কী সাংঘাতিক জুলুম ও অত্যাচার চালালো ?
বিবেকের কাছ থেকে যখন এ ঘটনার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করলাম,
সে জানালো যে, সৈয়দরা বাদশাহর সাথে করেছে নেমকহারাম।"

সম্রাট ও সম্রাটের পরিবারের এমন শোচনীয় লাঞ্ছনা ও অবমাননা হতে দেখে যে স্বতস্ফূর্ত গণরোষের বিস্ফোরণ ঘটে, ফররুখ শিয়ারের অপসারণের পরবর্তী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে তা আরো প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। কারণ তারা যে অপদার্থ ব্যক্তিটিকে সিংহাসনে বসান সে নামমাত্র সম্রাট ছিল এবং স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছিল যে, ওঁরা দুই ভাই ক্রমান্বয়ে তৈমুর বংশের রাজত্বের বিলোপ সাধন করে নিজেরাই সাম্রাজ্যের অধিপতি হতে চাইছেন। নয়া সম্রাটকে তারা পুরোপুরিভাবে নিজেদের হাতে বন্দী করে রেখেছিলেন। দুর্গের দরজা থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের লোকজন নিয়োজিত ছিল। হিম্মত খান নামক এক ব্যক্তিকে সম্রাটের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়েছিল। তার অনুমতি ছাড়া সম্রাট পানাহার পর্যন্ত করতে পারতো না। প্রাসাদের বাইরে তো তাকে বেরুবারই সুযোগ দেয়া হতো না। এই বন্দীদশার চেয়েও অবমাননাকর একটি আচরণ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাটের সাথে করতেন। বড় ভাই এর ছিল নিত্য নতুন নারীর সখ। তিনি সরাসরি সম্রাটের বেগম এনায়েত বানুকে প্রেম নিবেদন করে বসলেন। ছোট ভাই এর ছিল আধিপত্যের লালসা। তিনি মাঝে মাঝে সম্রাটের পাশাপাশি গিয়ে বসতেন এবং দম্ভের বশে বলতেন যে, যে ব্যক্তির মাথার ওপর আমরা জুতো রেখে দেবো, সে সম্রাট আলমগীরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। জনতা এসব ঘটনার বিবরণ শুনে ক্ষোভে ও ক্রোধে অধীর হয়ে যেত। ১২ বছর আগে যারা আলমগীরের আমলে শাহী দরবারের জৌলুস ও মর্যাদা দেখেছে, তাদের চোখে এসব দৃশ্য কাঁটার মত ফুটবে—এটা নিতান্তই স্বাভাবিক ও অনিবার্য ছিল।

আগ্রায় যুবরাজ নেকু শিয়ারের উত্থান

এহেন পরিস্থিতিতে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। এসব ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্বনাশ ঘটায়। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম যে ষড়যন্ত্র সংঘটিত হয় তা ছিল আগ্রায়। আগ্রার দুর্গে বেশ কয়েকজন মোগল যুবরাজ বন্দী ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আলমগীরের বিদ্রোহী পুত্র

আকবরের জৈষ্ঠ্য পুত্র নেকু শিয়ার। এ সময়ে তাঁর বয়স ৪২ বছর হলেও মাত্র তিন বছর বয়স থেকেই তিনি দুর্গে বন্দী ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তার কখনো বাইরের জগত দেখবার সুযোগ হয়নি। এ ব্যাপারে তার অজ্ঞতা এতদূর গড়িয়েছিল যে, একবার একটা গরু দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেন যে, এটা কোন্ প্রাণী এবং এর নাম কি ? এই পৌঢ় শিশুর সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল মিত্র সেন নামক এক ধূর্ত ব্রাহ্মণ। সুদী কারবার ও হাতুড়ে কবিরাজীর কল্যাণে সে আগ্রা দুর্গের সামরিক জওয়ান ও কর্মকর্তাদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে বসেছিল। ফররুখ শিয়ারের অপসারণ ও হত্যাকাণ্ডে যখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণবিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠলো তখন সে ভাবলো যে, আমি যদি এই সুযোগে নেকু শিয়ারকে সম্রাট ঘোষণা করে দেই, তাহলে জনতা ও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধী আমীরদের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী আমাকে সমর্থন দেবে। সম্রাট আমার মুঠোর মধ্যে থাকবে এবং আমি সভাচাঁদ ও রতন চাঁদের চেয়েও প্রতাপশালী হয়ে যাবো। দুর্গের সেনানায়কদেরকে স্বমতে দীক্ষিত করে ৮ই মে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১ই জমাদিউস সানী, ১১৩১ হিঃ তারিখে সে নেকু শিয়ারকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে দিল। নিজে সাত হাজারী পদবী ও রাজা বীরবল খেতাব অর্জন করে তার উজীর হলো। প্রাচীন শাহী কোষাগার থেকে এক কোটি ৮০ লাখ রুপিয়া বের করে সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করলো। অতপর মালোহের সুবেদার নিযামুল মুল্ক, আম্বেরের শাসক রাজা জয় সিং এবং এলাহাবাদের সুবেদার রাজা ছেলারাম নাগর প্রমুখ ফররুখ শিয়ার সমর্থক আমীরদেরকে নয়া সম্রাটের সমর্থনে এগিয়ে আসার আহবান জানালো এবং সৈয়দ দ্বয়ের পাঠানো নয়া সুবেদার ইজ্জত খানকে দুর্গের দখল দিতে অস্বীকার করলো।

নেকু শিয়ারের আহবান প্রত্যাখ্যাত

কিন্তু মিত্র সেন যা ভেবেছিল, তাতে সে সফল হলো না। এই বিদ্রোহ আগ্রার দুর্গের চতুঃসীমা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। রাজা জয় সিং অবশ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু সে একা সৈয়দদ্বয়ের শক্তির মোকাবিলা করতে নিজেকে সক্ষম মনে করলো না। সে নিযামুল মুল্ক ও ছেলারামের মনোভাব জানতে চাইল। ছেলারামের এ বিদ্রোহে যোগদান নিশ্চিত ছিল। কেননা সে ছিল ফররুখ শিয়ার ও তার পিতার উগ্র সমর্থক। কিন্তু সৈয়দ আবদুল্লাহ খান কালপীর জমীদার জয় সিং-এর সাথে তার বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে জয় সিং-এর সাথে মিলিত হতে সে অপারগ হলো। ছেলারামের পর প্রশ্ন থেকে যায় নিযামুল মুল্কের। কিন্তু তাঁর মত একজন অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ প্রশাসকের পক্ষে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল যে, এ ধরনের একটা ভিত্তিহীন ও নিস্তেজ আন্দোলনে যোগদান করবেন। কেননা একে তো এ আন্দোলন কোন পূর্বপ্রস্তুতি এবং কোন পরিপক্ক ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ছাড়াই

যথাযথভাবে চিন্তা-ভাবনা না করে ও না বুঝে শুনেই শুরু করা হয়েছিল, তদুপরি নেকু শিয়ারের মত একজন নির্বোধ ও অজ্ঞ যুবরাজকে হাতিয়ার বানিয়ে এমন এক ব্যক্তির উদ্যোগে এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটানো হয়েছিল, যে ব্যক্তি যথেষ্ট ধড়িবাজ ও কুচক্রী হলেও না ছিল জনসাধারণ কিংবা আমীর ওমরাদের ওপর তার কোন প্রভাব প্রতিপত্তি, না তার হাতে ছিল আগ্রার দুর্গের সৈন্য ছাড়া আর কোন সামরিক শক্তি। রাজনৈতিক ব্যাপারে যেমন সে কোন প্রজ্ঞা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিল না, তেমনি তার মধ্যে ছিল না সেনাপতিসুলভ কোন যোগ্যতা ও দক্ষতা। নিযামুল মুলক এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা ও সমর্থকদেরকে কোন সুস্পষ্ট জবাবও দিলেন না, তাদের উৎসাহও বৃদ্ধি করলেন না, তাদের সমর্থনে কোন বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করলেন না। এ অবস্থা দেখে জয় সিং-এর উৎসাহ উদ্দীপনায়ও ভাটা পড়লো। নয়া সম্রাট ও তার মন্ত্রীর ব্যাপারে সেও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। এবার মিত্র সেন এক নতুন ফন্দি উদ্ভাবন করলো। সে নেকু শিয়ারের পক্ষ থেকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে লিখলো যে, "তোমরা এমন একটা অবোধ কিশোরকে ভারতের সিংহাসনে কিভাবে বসালে ? আমি বয়োজ্যেষ্ঠ যুবরাজ থাকতে ঐ বয়োকনিষ্ঠ যুবরাজকে সিংহাসনে বসানো কিভাবে সংগত হতে পারে ? তোমরা যদি আমার আনুগত্য কর, তাহলে এ যাবত যে পদমর্যাদা ভোগ করে আসছো তা আমি বহাল রাখবো। সৈয়দ আবদুল্লাহ খান স্বভাবগতভাবে সহজ পথ অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর কেবল একটা পুতুলের প্রয়োজন ছিল। সেই পুতুলকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেই দেশ শাসন করে যাবেন—এই ছিল তার মতলব। সেই পুতুল রফিউদ্ দারাজাতই হোক কিংবা নেকু শিয়ারই হোক—তাতে তার কিছু এসে যায় না। তাই তিনি নেকু শিয়ারের সাথে একটা নিষ্পত্তি করার জন্য ও তাঁকে দিল্লী নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু হোসেন আলী খান একজন হটকারী ও উগ্র স্বভাবের সৈনিক ছিলেন। তিনি গোঁ ধরলেন যে, আগ্রার ঐ ক'টা মুষ্টিমেয় লোক আমাদের ইচ্ছায় বাধা দেয়ার যে ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে, তজ্জন্য তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ আমাদের বিরুদ্ধে মাথা তোলার দুঃসাহস না করতে পারে। এ নিয়ে দুই ভাই-এর মধ্যে কয়েকদিন যাবত বিতর্ক চলতে থাকলো। এ কারণে হোসেন আলী খান সৈন্য সামন্ত নিয়ে দিল্লীর উপকণ্ঠে বেরিয়ে আসা সত্ত্বেও তার আগ্রা যাত্রা বিলম্বিত হয়। তবে শেষ পর্যন্ত হোসেন আলী খানের গোয়ার্তুমী আবদুল্লাহ খানের নমনীয়তার ওপর বিজয়ী হয়।

রফিউদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহণ

ইতিমধ্যে রফিউদ্ দারাজাতের যক্ষারোগ মারাত্মক অবনতির দিকে মোড় নেয় এবং সে আব্দার জানায় যে, তার জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রফিউদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসানো হোক। তদনুসারে ১৭ই রজব, ১১৩১ হিজরী মোতাবেক

৪ঠা জুন, ১৭১৯ খৃঃ তিন মাস রাজত্ব করার পর রফিউদ্ দারাজাতকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়া হয়।[১] এর দু' তিন দিন পর রফিউদ্দৌলা দ্বিতীয় শাহজাহান উপাধি ধারণ করে[২] সিংহাসনে আরোহণ করে। অতপর নেকু শিয়ারের সাথে কোন আপোষ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকলো না।

আগ্রার দুর্গ অধিকার

১৭১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস মোতাবেক ১১৩১ হিজরীর শাবান মাসে হোসেন আলী খান মুহাম্মদ আমীন খান সামসামুদ্দৌলা ও জাফর খানকে সাথে নিয়ে আগ্রা পৌছলেন ও দুর্গ অবরোধ করলেন। নেকু শিয়ারের সমর্থকরা জয় সিং, ছেলারাম কিংবা নিযামুল মুল্‌ক তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এই আশায় এক মাস পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে গেল। কিন্তু সকল আশা নিষ্ফল দেখে অবশেষে তারা ২৭শে রমজান, মোতাবেক ১২ই আগষ্ট ১৭১৯ খৃঃ আত্মসমর্পন করলো। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় দুর্গ অধিকার করলেন। নেকু শিয়ার গ্রেফতার হয়ে এলে হোসেন আলী খান তার সামনে সসম্ভ্রমে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকে মসনদে বসতে দিলেন। কিন্তু আলমগীরের আজীবন প্রাসাদ বন্দী থাকা এই পৌত্রটি সবিনয়ে প্রধান সেনাপতির সামনে মাথা নুইয়ে অবিকল নারীসুলভ কণ্ঠে ও ভংগীতে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগলো। বাবর ও তৈমুরের সন্তানের এহেন দীনতা ও হীনতা দেখে হোসেন আলী খানেরও মনে করুণার সঞ্চার হলো। তাকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়ে বাকী জীবন কাটানোর জন্য দিল্লীস্থ সেলিম গড়ের রাজকীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হলো। অতপর আগ্রার দুর্গের সঞ্চিত প্রাচীন ধনরত্নের অন্বেষণ শুরু হলো। সেকান্দর লোদী ও বাবরের আমল থেকে সংরক্ষিত এবং রূপকথার মত দেশময় খ্যাত। সেই মহামূল্যবান রত্নরাজির সন্ধানে পুরোনো কোষাগার রক্ষকদেরকে তন্নতন্ন করে খুঁজে এনে সব রকমের ভীতি প্রদর্শন ও প্রলোভনের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে সকল গুপ্ত ধনরত্নের হদিস নেয়া হয়। এভাবে যে পরিমাণ নগদ অর্থ ও মূল্যবান জিনিসপত্র সংগৃহীত হয় তার সামগ্রিক মূল্য এক কোটি আশী লাখ রূপিয়া অথবা মতান্তরে দুই থেকে তিন কোটি রুপিয়া ছিল। এ সবের মধ্যে নূরজাহানের মনিমুক্তা খচিত চাঁদর, জাহাংগীরের স্বর্ণখচিত তরবারী এবং মমতাজ মহলের কবর আচ্ছাদনের জন্য শাহজাহানের উদ্যোগে প্রস্তুত মতির চাঁদরও ছিল। এই সমস্ত ধনরত্ন এককভাবে হোসেন আলী খানের কুক্ষীগত হলো। আবদুল্লাহ খান

---

১. এর মাত্র কয়েকদিন পর ২৪শে রজব রফিউদ দারাজাত মারা যায়।

২. রফিউদ্দৌলা রফিউদ দারাজাতের চেয়ে মাত্র ১৮ মাসের বড় ছিল। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাকেও যথারীতি রফিউদ দারাজাতের মতই বন্দীর ন্যায় রেখেছিলেন। তার অভিভাবক হিম্মত খান যমজ ভাই-এর মত তার সাথে লেগেই থাকতো। জুমআর নামাযই হোক, শিকার করাই হোক, কিংবা কোন কর্মকর্তার সাথে আলাপ আলোচনাই হোক, সে নিজে অথবা তার কোন প্রতিনিধি সর্বদাই সম্রাটের কাছে থাকতো।

তখনো সম্রাটকে সাথে নিয়ে দিল্লী থেকে আগ্রার পথে ছিলেন। পথিমধ্যে এ খবর পেয়ে তিনি অধিকতর ক্ষীপ্র গতিতে আগ্রা পৌছলেন। অতপর ছোট ভাই এর কাছে তীব্র ভাষায় নিজের প্রাপ্য অংশ দাবী করলেন। এ বিষয়ে দুই ভাই এর ভেতরে ভয়ংকর তিক্ততার সৃষ্টি হলো। এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত দু'জনেরই ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ভেবে রতন চাঁদ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো। সে মধ্যস্থতা করে উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করে দিল। মীমাংসা অনুসারে সম্রাট শুধু জাহাংগীরের তলোয়ার ও নূরজাহানের শাল পেলেন। আবদুল্লাহ খান পেলেন নগদ ২১ লাখ রুপিয়া। বাদবাকী সমুদয় ধনরত্ন হোসেন আলী খানের অধিকারে এল। ঐতিহাসিকদের মতে মীমাংসা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এ ঘটনার পর দু' ভাই এর মধ্যে আগের মত ঐক্য বজায় থাকেনি।

৭—মুহাম্মদ শাহের শাসনকাল

এই ঘটনার পর রফিউদ্দৌলার স্বাস্থ্যেরও মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর সে মারা যায়। তার রুগ্নাবস্থাতেই শাহ আলম বাহাদুর শাহের পুত্র জাহাঁশাহের পুত্র রওশন আখতারকে আনার জন্য দিল্লী থেকে দূত পাঠানো হয়। রওশন আখতার রফিউদ্দৌলার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর আগ্রায় পৌছেন। ১৭১৯ খৃঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর আবুল ফাতাহ নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ উপাধি সহকারে তাকে সিংহাসনে আরোহন করানো হয়।

জয় সিং এর সাথে আপোষ

আগ্রা অভিযান ও নয়া সম্রাটের সিংহাসনে অধিষ্ঠানের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাদের বিরোধী আমীরগণের দিকে মনোনিবেশ করলেন যাদের দিক থেকে তাদের কর্তৃত্ব হুমকির সম্মুখীন ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল জয় সিং। সে রাজপুত সম্প্রদায়ের প্রথা অনুসারে রাজধানী আম্বেরের ব্রাহ্মণদেরকে দান-দক্ষিণা দিয়ে গেরুয়া পোশাক পরিধান করে ফররুখ শিয়ারের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মরণপণ করে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। হোসেন আলী খান তার প্রতিরোধে সৈন্য প্রেরণ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু যোধপুরের শাসনকর্তা অজিত সিং মধ্যস্থতা করে সন্ধি করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জয় সিং এর সাথে দেখা করে সে এভাবে আপোষ রফা করে যে, নিজের কন্যা তার সাথে বিয়ে দেয়। কন্যার যৌতুক হিসেবে রাজকোষ থেকে ২০ লাখ রুপিয়া দেয়া হয় এবং জয় সিংকে সুরাটের শাসন ক্ষমতা দেয়া হয়। ইতিপূর্বে অজিত সিংকে আজমীর ও গুজরাটের সুবেদার নিযুক্ত করা হয়েছিল। এবার তার জামাতা জয় সিংকে সুরাটের শাসন ক্ষমতা দিয়ে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় দেশের একটি বিরাট অংশ এই দুই রাজপুত নেতার হাতে অর্পণ করেন। রাজধানীর দক্ষিণে ৬০ মাইল দূর থেকে শুরু করে সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত ছিল। এই ছিল দিল্লীর সিংহাসনের নেপথ্য ভাগ্যবিধাতা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার স্বরূপ।

গিরীধর বাহাদুরের সাথে সন্ধি

জয় সিং এর পর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বিতীয় প্রবলতম শত্রু ছিল ছেলারাম নাগর। সে ছিল ফররুখ শিয়ারের পিতা আজীমুশ শানের হাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। ফররুখ শিয়ার সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পর তাকে সচিব পদে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ খানের প্রবল বিরোধিতার মুখে বাধ্য হয়ে আকবারাবাদের সুবেদার নিযুক্ত করা হয়। সেই সময় থেকে ছেলারাম আবদুল্লাহর প্রতি রুষ্ট ছিল। পরে তাকে এলাহাবাদ প্রদেশে বদলি করা হয়। সেখানে কর্মরত থাকাকালে ফররুখ শিয়ারের সিংহাসনচ্যুতি ও হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে সে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার বিদ্রোহের সবচেয়ে ক্ষতিকর ফলশ্রুতি ছিল এই যে, বাংলা ও বিহার প্রদেশদ্বয়ের সাথে রাজধানীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এখান থেকে কোন রাজস্ব দিল্লীতে পৌছতে পারতো না। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ছেলারামকে বাগে আনার জন্য তার ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিধর বাহাদুরকে গ্রেফতার করেন এবং কালপীর জমীদার জন সিংকে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন। কিন্তু তাঁদের এ কৌশল সফল হয়নি। গিরিধর বাহাদুর কারাগার থেকে পালিয়ে স্বীয় চাচার কাছে চলে যায় এবং উভয়ে মিলে জন সিংকে পরাস্ত করে। এর কিছুদিন পর ছেলারাম নাগর মারা যায়। গিরিধর বাহাদুর তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিদ্রোহকে আরো জোরদার করে। অবশেষে নভেম্বর ১৭১৯ খৃঃ হায়দার কুলী খান ইসফরাইনীকে এলাহাবাদ দখল করতে পাঠানো হয়। এই সেনাপতি গিরিধর বাহাদুরকে অবরুদ্ধ করে রেখে যথেষ্ট নিগৃহিত করেন। কিন্তু গিরিধরের কাছে সৈন্য ও রসদের কমতি ছিল না। এলাহাবাদের সুরক্ষিত দুর্গও তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। এ জন্য হায়দার কুলী খান তাকে বশীভূত করতে সক্ষম হলেন না। অতপর হোসেন আলী খান স্বয়ং এই অভিযানে যাওয়ার মনস্থ করলো। কিন্তু আবদুল্লাহ খান এর কঠোর বিরোধিতা করেন। আগ্রার ধনরত্নাগার লুণ্ঠনের স্মৃতি তিনি তখনো ভোলেননি। তিনি মনে মনে সংকল্প আঁটলেন যে, হোসেন আলী যখন আগ্রার সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, তখন এলাহাবাদের ধন-সম্পদ আমার করায়ত্ব করা চাই। দুই ভাই এর মধ্যে এ নিয়ে আবার লড়াই বাধার উপক্রম হলো। কিন্তু রতন চাঁদ পুনরায় মধ্যস্থতা করে এই মর্মে আপোষ রফা করে দিল যে, এলাহাবাদে রতন চাঁদ যাবে এবং গিরিধর বাহাদুরের সাথে আপোষ রফা করবে। জমাদিউল আউয়াল মাসে সে এলাহাবাদ গেল এবং জমাদিউস সানীতে (১১৩১ হিঃ) গিরিধর বাহাদুরের সাথে সন্ধি স্থাপন করলো। সন্ধি অনুসারে গিরিধরকে অযোধ্যার সুবেদার নিযুক্ত করা হলো। তাকে সকল অধিনস্থ জেলার শাসক ও সচিব নিয়োগের এখতিয়ার দেয়া হলো এবং তিন লাখ রুপিয়া উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হলো।

নিযামুল মুল্‌কের সাথে বিরোধের সূত্রপাত

এই দুই শক্রর সাথে নতজানু হয়ে আপোষ করার কারণ এই যে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট তাদের প্রবলতম শক্র নিযামুল মুলকের পেছনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা অপরিহার্য বিবেচিত হচ্ছিল। তারা নিযামুল মুল্‌ককে মালোহের সুবেদার নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন শুধু এ জন্য যে, একদিকে দাক্ষিণাত্যে তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র আলম আলী খান ভারপ্রাপ্ত সুবেদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অপর দিকে তাদের অনুগ্রহভাজন মারাঠারা ছিল। আবার আগ্রাতে তাদের ভাই গয়রত খান সুবেদার হিসেবে বর্তমান ছিলেন। তাছাড়া গুজরাটের সুবেদার তাদের প্রবল সমর্থক অজিত সিং ছিল। তাদের আশা ছিল যে, এই চতুঃশক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় নিযামুল মুলক মাথা তোলারই সাহস পাবেন না। জয় সিং ছেলারাম ও গিরিধর বাহাদুরকে বাগে আনার পর তাকে সহজেই খতম করে দেয়া যাবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাদের অন্যান্য শক্রকে আপোষের মাধ্যমে বশীভূত করার পর নিযামুল মুল্‌ককে উত্যক্ত করা শুরু করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের একটা তালিকা তৈরী করা হলো। এসব অভিযোগের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

১–মাণ্ডোর শাসনকর্তা মারহামাত খানকে হোসেন আলী খান এই অপরাধে পদচ্যুত করেছিলেন যে, হোসেন আলী খান দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মাণ্ডোর কাছ দিয়ে যান, তখন সে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসেনি। কিন্তু নিযামুল মুল্‌ক তাকে অপসারণ না করে তাকে চাকুরীতে বহাল রাখেন এবং রামগড়ের জমীদার জয় বন্দিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠান।

২–নিযামুল মুল্‌ক স্বীয় প্রদেশের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশী যুদ্ধসরঞ্জাম ও সৈন্য সমাবেশ করেন।

৩–তিনি তালিম পরগনার জনৈক জমীদারকে বিনা অনুমতিতে অপসারণ করেন।

৪–এ ছাড়া আরো কতিপয় ভূসম্পত্তির ব্যাপারে নিযামুল মুল্‌কের গৃহীত ব্যবস্থায় আপত্তি তোলা হয়।

হোসেন আলী খান নিযামুল মুলকের উকিলকে[১] অত্যন্ত কর্কশ ও কঠোর ভাষায় স্বীয় অভিযোগগুলো জানিয়ে দিলেন। জবাবে নিযামুল মুল্‌ক নিজেই হোসেন আলী খানকে একটি চিঠি লিখে সকল অভিযোগের সাফাই দিলেন। তন্মধ্যে সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের কারণ এভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে, মালোহ অঞ্চলে মারাঠাদের লুটতরাজ শুরু হয়ে গেছে এবং তা প্রতিহত করার জন্য মালোহের প্রশাসনের জন্য স্বাভাবিকভাবে যা দরকার তার চেয়ে বেশী

১. তৎকালে যেসব আমীর-ওমরা রাজধানীর বাইরে সুবেদারী কিংবা অন্য কোন দায়িত্বে নিযুক্ত হতেন, তাদের পক্ষ থেকে দরবারে তাদের উকিল বা প্রতিনিধি থাকতো। এই উকিলদের মাধ্যমেই চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হতো।

সৈন্যের দরকার। উপসংহারে তিনি লিখলেন যে, "আমার যদি বিরোধিতার ইচ্ছা থাকতো, তাহলে নেকু শিয়ার যখন আমাকে আগ্রা আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তখনই ছিল বিরোধিতার সর্বোত্তম সুযোগ। তোমাদের শত্রুরা তো কেবল আমার অংশ গ্রহণেরই অপেক্ষায় ছিল।" কিন্তু এ জবাবে হোসেন আলী খান শান্ত হলেন না। তিনি মালোহ থেকে নিযামুল মুল্কের অপসারণের ফরমান জারী করে দিলেন। সেই সাথে আধা সরকারীভাবে নিযামুল মুল্ককে লেখা হলো যে, দাক্ষিণাত্যের প্রশাসনিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মালোহকে আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সমিচীন মনে করছি। আপনি আকবরাবাদ, মুলতান, এলাহাবাদ অথবা বুরহানপুরের মধ্য থেকে যে প্রদেশ চান বেছে নিতে পারেন। নিযামুল মুল্ক দু'টি কারণে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রথমত, মালোহের সুবেদার পদে নিয়োগ করার সময় তাঁকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, তাঁকে ইতিপূর্বে দাক্ষিণাত্য ও মুরাদাবাদ থেকে যেভাবে অপসারণ করা হয়েছিল সেভাবে আর অপসারণ করা হবে না। দ্বিতীয়ত, তখনো রবি শস্যের রাজস্ব আদায় হয়ে পারেনি। সেনাবাহিনীর জন্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে এ যাবত যা কিছু ব্যয় করা হয়েছে, এই রাজস্ব আদায় না হলে তা মেটানো সম্ভব হবে না। কিন্তু সৈয় দ্বয় এই যুক্তিসঙ্গত ওজর মানলেন না। তারা হোসেন আলী খানের সেনা অধ্যক্ষ দেলাওয়ার আলী খানকে বোন্দী অধিকারের ওজুহাতে দু'জন সেনাপতি সাহচর্যে মালোহের পশ্চিম সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে প্রয়োজনের সময় তারা তাৎক্ষণিকভাবে নিযামুল মুল্কের মোকাবিলায় যেতে পারে।

সৈয়দদ্বয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণঅসন্তোষ

একদিকে নিযামুল মুল্কের উচ্ছেদের জন্য ষড়যন্ত্র চলছিল। অপর দিকে খোদ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। সৈয়দদ্বয়ের কার্যকলাপে জনসাধারণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিগর্ব, আমীরগণ ও সম্রাট সকলেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সৈয়দদ্বয় এবং তাদের প্রধান অনুচর রতন চাঁদ যাবতীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক পদগুলো এবং সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা শুধুমাত্র বারেহার সৈয়দ পরিবার, তাদের আত্মীয়স্বজন ও রতন চাঁদের সতীর্থদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিল এবং অন্য সকলের জন্য সকল সুযোগ সুবিধার দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছিল। এতে দেশের বুদ্ধিজীবী ও সমরজীবী অভিজাত মহলে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, রতন চাঁদ ও অজিত সিং-এর প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে সৈয়দদ্বয় মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানতে শুরু করেন। ফররুখ শিয়ারের হত্যার পর তার বিধবা মহিষী অজিত সিং-এর কন্যাকে অজিতের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হলো।[১] সে যোধপুর

১. যদিও ফররুখ শিয়ারের অন্যান্য স্ত্রীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ খান অজিত সিং-এর কন্যার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন না, যা সে ফররুখ শিয়ারের কাছ থেকে পেয়েছিল। এই সম্পত্তির মূল্য সর্বসাকুল্যে এক কোটি টাকা ছিল। ধর্মীয় দিক থেকে হোসেন আলীর চাইতে আবদুল্লাহ খানের কার্যকলাপ মুসলিম জনগণের দৃষ্টিতে অধিক আপত্তিকর ছিল। তিনি হিন্দুদের দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত ছিলেন যে, হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবাদিও উদযাপন করতেন। অবিকল হিন্দুদের মত তিনি বাসন্তী উৎসব পালন করতেন ও হোলিতে রং নিয়ে খেলতেন।

নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে পুনরায় হিন্দু বানিয়ে ফেললো। মোগল বংশের রীতি ছিল এই যে, যে মহিলা একবার তাদের হেরেমে ঢুকতো তাকে আর ফেরানো হতো না। ইতিপূর্বে রাজপুত সরদারদের বহু মেয়ে ওখানে এসেছে এবং তাদেরকে আর কখনো ফেরত দেয়া হয়নি। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় এই প্রথা ভংগ করেই ক্ষ্যান্ত হলেন না, বরং ইসলামী আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে অজিত সিংকে তার মুসলমান হয়ে যাওয়া মেয়েকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার অনুমতিও দিয়ে দিলেন। এ ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হলো, ইসলামী কাজী ফতোয়া দিলেন যে, এ কাজ ইসলামী বিধানের বরখেলাপ এবং শরীয়তের অবমাননার শামিল। এর অল্প কিছুদিন পর আরো একটি ঘটনা ঘটে। একদিন আগ্রার মসজিদে জুময়ার সময় জনৈক হিন্দু মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে। তার আত্মীয় স্বজন রতন চাঁদের কাছে নালিশ করে। রতন চাঁদ ব্যাপারটাকে আবদুল্লাহ খানের নিকট বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। অতপর আবদুল্লাহ খানের অনুমতিক্রমেই হোক, কিংবা বিনা অনুমতিতেই হোক, নগরীর নিরাপত্তা প্রধানকে নির্দেশ দিল যে, এই নওমুসলিম মহিলাকে অপমানের সাথে নগরীতে ঘোরানো হোক এবং যে মুসলমান এই মহিলাকে বিয়ে করবে তাকেও অপদস্থ করে চাকুরীচ্যুত করা হোক। এ ধরনের আরো বহু ঘটনা মুসলিম জনমনে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্চার করে।

প্রজাদের ন্যায় সম্রাট এবং তাঁর পরিবারও ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বেচ্ছাচারমূলক কর্মকলাপে অতিষ্ট ছিলেন। উভয় ভ্রাতা রফিউদ্দৌলা ও রফিউদ্ দারাজাতের মত সম্রাট মুহাম্মদ শাহকেও বন্দীর মত বানিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর চার পাশে প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাদের মনোনীত লোকজন নিয়োজিত ছিল। এমনকি বিশিষ্ট মেহমানদের আপ্যায়ন হাতীশালার রক্ষণাবেক্ষণ ও রান্নাবান্নার কাজে নিয়োজিত লোকজন, ঝাড়ূদার ও অন্যান্য ভৃত্য—সবই ছিল তাদের আত্মীয় স্বজন। বারেহার হিম্মত খান সম্রাটের অভিভাবক ও উপদেষ্টা হিসেবে ছায়ার মত তাঁর সাথে লেগে থাকতো। তার অনুমতি ছাড়া সম্রাট কোথাও যেতেও পারতেন না। কারো সাথে কথাও বলতে পারতেন না। তিনি যখন জুময়ার নামায অথবা শিকারের জন্য বাইরে যেতেন, তখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিয়োজিত লোকজন এমনভাবে তাকে ঘিরে রাখতো যেন তিনি কোন বিপজ্জনক বন্দী। যে কোন সময় পালিয়ে যেতে পারেন। আমীরদের মধ্যে তুরানী আমীরগণ সৈয়দদের সবচেয়ে কট্টর বিরোধী ছিলেন। কেননা তাঁরা বুঝতেন যে, নিযামুল মুল্‌কে উৎখাত করতে পারলে এই দুই ভাই তুরানী গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তিকে কোন সম্মানজনক পদে থাকতে দেবেন না। দরবারে মুহাম্মদ আমীন খান ইতিমাদুদ্দৌলা তুরানী গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। প্রকাশ্যে তিনি সৈয়দদের সাথে মিলেমিশে থাকলেও ভেতরে ভেতরে তাদের কট্টর বিরোধী ছিলেন। তিনি মুহাম্মদ শাহের সাথে তুর্কী ভাষায় আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এই ভাষা সৈয়দদের চাকর নফররা বুঝতো না। ক্রমে উভয়ের মধ্যে সৈয়দদের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে উঠলো। মুহাম্মদ আমীন খান নিজে এবং তাঁর মাধ্যমে মুহাম্মদ শাহ ও তাঁর মাতা নিযামুল মুল্‌ককে ক্রমাগত চিঠি লিখতে লাগলেন এবং তাঁর কাছে অনুরোধ জানালেন যে, যেভাবে হোক তিনি যেন স্বীয় ক্ষমতা ও যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে সৈয়দদের একনায়কত্বের অবসান ঘটান। সম্রাট তাকে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁর সুনিপুণ কৌশল দ্বারা যদি এ কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে তাকেই উজীর নিযুক্ত করা হবে। এই চিঠি লেখার পালা যখন চলে, তখনো আগ্রায় নেকু শিয়ারের বিদ্রোহের মীমাংসা হয়নি। তথাপি নিযামুল মুল্‌ক নিজের দিক থেকে প্রথমে কিছু করতে চাননি। সৈয়দদ্বয় স্বয়ং তাকে উত্যক্ত করে কিনা, তিনি তার অপেক্ষায় ছিলেন। যখন তাদের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্র শুরু হলো, তখন তিনি তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

নিযামুল মুল্‌ক দাক্ষিণাত্যে

যখন দেলোয়ার আলী খান একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে মালোহের পশ্চিম সীমান্তে উপনীত হলো, তখন নিযামুল মুল্‌কের পক্ষে মালোহে বসে তার প্রতিরোধ করা অথবা অন্য কোন অঞ্চলে চলে যাওয়া ছাড়া গত্যান্তর থাকলো না। মালোহে বসে থাকলে আশংকা ছিল যে, আগ্রার দিক থেকে হোসেন আলী খান, দাক্ষিণাত্যের দিক থেকে আলম আলী খান এবং বোন্দীর দিক থেকে দেলোয়ার আলী খান তাঁর ওপর আকস্মিকভাবে হামলা চালিয়ে বসতে পারে। তারা এভাবে তিন দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে খতম করে দিতে পারে। তাই তিনি মালোহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথমে তিনি আম্বেরের রাজা জয় সিংকে বার্তা পাঠালেন যে, তিনি তার সাথে মিলিত হতে চান এবং তার সাহায্য নিয়ে আগ্রা কিংবা দিল্লীর দিক থেকে আক্রমণ চালাতে চান। কিন্তু জয় সিং ইতিমধ্যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে আপোষ করে নিয়েছিল। তাই তার পক্ষ থেকে নিযামুল মুল্‌ক তেমন কোন উৎসাহব্যঞ্জক জবাব পেলেন না। ইতিমধ্যে হায়দারাবাদের সুবেদার মোবারেজ খান, সেন যদু (যিনি হোসেন আলী ও রাজা সাহুর মধ্যে মিত্রতা গড়ে ওঠার পর সৈয়দদ্বয়ের বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন) আরাফাতের শাসনকর্তা সাদাতুল্লাহ খান এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে তিনি পত্র পেলেন। এসব পত্রে তারা আশ্বাস দেন যে, তিনি ফররুখ শিয়ারের হত্যার প্রতিশোধ নিতে এবং সম্রাটকে সৈয়দদ্বয়ের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে অস্ত্র ধারণ করলে আমরা সকলে আপনাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছি। এ ছাড়া দাক্ষিণাত্যে নিযামুল মুল্‌কের ফুফা আজদুদ্দৌলা আওজ খান বেরার প্রদেশের সুবেদার ছিলেন। আর খান্দেশের সুবেদার আনোয়ার খান কুতবুদ্দৌলা এত দুর্বল ছিল যে, তার আদৌ কোন প্রতিরক্ষা ক্ষমতা ছিল না। তাই তিনি

দাক্ষিণাত্যে চলে যাওয়ার সংকল্প নিলেন। কিন্তু প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে সেখানে যাওয়া আত্মঘাতী হতো। তাই তিনি নিজের আসল অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখলেন। জমাদিউল আউয়াল মাসে তিনি উজ্জয়িনী থেকে দিল্লী অভিমুখে রওনা হলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় জানতে পেরে খুশী হলেন যে, তাদের শিকার নিজেই তাদের মুঠোর মধ্যে চলে আসছে। তারা সম্রাটের পক্ষ থেকে ফরমান পাঠালেন যে, তুমি একজন সৈয়দ। আগ্রা চলে এস। এখানে পৌঁছা মাত্রই তোমাকে এই প্রদেশের শাসনকর্তা বানানো হবে। কিন্তু নিযাম উজ্জয়িনী দিল্লী সড়ক থেকে সহসা নিজের গতিপথ পাল্টে ক্ষীপ্র গতিতে দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করলেন। দাক্ষিণাত্যের ভারপ্রাপ্ত সুবেদার আলম আলী খান নিযামের আগমনের কথা ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারার আগেই ১লা রজব, ১১৩২ হিজরী মোতাবেক ৮ই মে, ১৭২০ খৃঃ তারিখে তিনি নর্বদা নদীর তীরে উপনীত হলেন এবং ১৩ই রজব আসেরের প্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকার করলেন। এর তিন দিন পর ১৬ই রজব তিনি খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুরও দখল করলেন। সুবেদার আনোয়ার খান তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন। এভাবে বিরোধী পক্ষের অজান্তেই তিনি একে একে দাক্ষিণাত্যের দু'টো প্রদেশ বেরার ও খান্দেশের ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। এবার তিনি প্রথমবারের মত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধিতার প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেন। তাঁর এ ঘোষণা অন্য কথায় সম্রাটের সকল অনুগত আমীরগণের প্রতি আমন্ত্রণের সমার্থক ছিল। তাঁর ঘোষণার ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ

শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের অধিপতিকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই আমার এ চেষ্টা তৎপরতা নিবেদিত। কেননা তিনি ঐ দুই ব্যক্তির হাতে এমনভাবে বন্দী যে, তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে জুময়ার নামায পর্যন্ত পড়তে যেতে পারেন না। অন্যান্য কাজের তো প্রশ্নই ওঠে না।" এই সাথে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, জুময়ার দিন সকল মসজিদে সম্রাট মুহাম্মদ শাহের মুক্তির জন্য দোয়া করতে হবে। দোয়ার সময় একথাও বলার নির্দেশ দেন যে, "ইসলামের রক্ষক মুহাম্মদ শাহ শত্রুদের হাতে বন্দী। তাঁকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।" সর্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে সৈয়দদ্বয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করাই ছিল এ নির্দেশের উদ্দেশ্য।

দেলোয়ার আলী খানের পরাজয়

নর্বদা নদীর অপর তীরে নিযামুল মুলকের অবতরণ এবং আসের ও বুরহানপুর দখলের খবর একে একে আগ্রায় পৌছুলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় দিশাহারা হয়ে পড়লেন। হোসেন আলী খান তৎক্ষণাত দাক্ষিণাত্য যাওয়ার জন্য মন স্থির করলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ খান এবং সামসামুদ্দৌলা খানে দাওরান পরামর্শ দিলেন যে, উত্তর দিক থেকে দেলোয়ার খানকে এবং আওরংগাবাদ থেকে আলম আলী খানকে অগ্রসর হবার আদেশ দেয়া হোক। ওরা দু'জনে সম্মিলিতভাবে

বিদ্রোহী নবাব নিযামুল মুল্‌ককে সহজেই খতম করে দেবে। এই প্রস্তাব অনুসারে দেলোয়ার আলী খানকে সাংঘরের রাজা গণ্ড সিং ও ভুপালের শাসক দোস্ত মুহাম্মদ খানকে সাথে নিয়ে অবিলম্বে নিযামুল মুল্‌কের মোকাবিলা করতে চলে যাওয়ার আদেশ দেয়া হলো। অপর দিকে আওরংগাবাদ থেকে নিযামুল মুল্‌কের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আলম আলী খানকেও নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু আলম আলীর কাছে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ছিল না। এ জন্য সে আওরংগাবাদ থেকে তৎক্ষণাত রওনা হতে পারলো না। পার্শবর্তী এলাকা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে ও মারাঠাদের কাছ থেকে সহায়ক সৈন্য আমদানী করতে তার বিলম্ব হয়ে গেল। পক্ষান্তরে দেলোয়ার আলী খানের কাছে বাহিনী প্রস্তুত ছিল। সে নির্দেশ পাওয়া মাত্র বুরহানপুর অভিমুখে যাত্রা করলো। রজব মাসের শেষের দিকে সে নর্বদা পার হয়ে নদীর দক্ষিণ তীরে বুরহানপুর থেকে ৯২ মাইল উত্তরে অবস্থিত হান্ডিয়া নামক স্থানে পৌঁছে গেল। নিযামের ন্যায় বিচক্ষণ সেনাপতি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন না—তা কি করে সম্ভব? সৈয়দদ্বয়ের যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল এরূপ যে, দেলোয়ার আলী ও আলম আলী এক সাথে দু'দিক থেকে তার ওপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু এখন দুই সমরনায়কের একজন এসে গেছে, অপরজনের আসা এখনো বাকী। এতে নিযাম উভয়ের একত্রিত হওয়ার আগে আলাদাভাবে একজনের সমস্যা মিটিয়ে ফেলার সুযোগ পেয়ে গেলেন। এ সুযোগকে তিনি কাজে লাগালেন। 'এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে তিনি বুরহানপুর থেকে সসৈন্যে রওনা হলেন। ১৩ই শাবান, ১১৩২ মোতাবেক ১৯শে জুন, ১৭২০ খৃঃ নর্বদা ও বুরহানপুরের মধ্যস্থলে পাঞ্জার নামক পার্বত্য এলাকায় উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলো।[১] দেলোয়ার আলী খানের সাথে বারেহার সৈয়দগণ, আফগান ও রাজপুতদের সমন্বয়ে গঠিত দুর্ধর্ষ যোদ্ধাবাহিনী ছিল। কিন্তু সমরনায়কোচিত যোগ্যতার দিক দিয়ে সে নিযামুল মুল্‌কের ধারেকাছেও ছিল না। সে সরলমতি সৈনিকের মত তরবারী দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু চরম নৈপুণ্যের সাথে নিযামুল মুল্‌ক এমন লড়াই পরিচালনা করেন যে, সে তরবারী চালানোর সুযোগই পায়নি। নিযামুল মুল্‌ক এরূপ দক্ষতার সাথে কামান ব্যবহার করেন যে, দেলোয়ার আলী খান তার চার পাঁচ হাজার সৈন্য এবং অধিকাংশ খ্যাতিমান সেনাপতিসহ নিহত হয়। অপর দিকে নিযামুল মুল্‌কের পক্ষে সর্বসাকুল্যে ৩০ জন সৈন্য নিহত ও ১০০ জন আহত হয়।

নিযামুল মুল্‌কের নামে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারীর ফরমান

দেলোয়ার আলী খানের পরাজিত ও নিহত হওয়ার সংবাদ শাবান মাসের নাগাদ আগ্রায় পৌঁছে। এতে উভয় সৈয়দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। এ

১. কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই স্থানের নাম হাসানপুর, আবার কারো কারো মতে রতনপুর মোনেম খান লিখেছেন যে, নর্বদা থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ঘটনার পর ২০/২১ বছর বয়সের তরুণ আলম আলী খান বহুদর্শী সেনাপতি নিযামুল মুল্‌কের মোকাবিলায় একাকী রয়ে গেল। এ সময় হোসেন আলী খানের স্ত্রী ও সন্তানেরা দৌলতাবাদের দুর্গে রক্ষিত ছিল। অপর দিকে আগ্রা থেকে দাক্ষিণাত্যের দূরত্ব এত বেশী ছিল যে, চূড়ান্ত যুদ্ধ বেধে গেলে সময়মত আগ্রা থেকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নিযামুল মুলকের ঘাড়ে চড়াও হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় দু' ভাই কি করবেন স্থির করতে পারছিলেন না। কখনো ভাবেন, দু' ভাই সম্রাটকে সাথে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে যাবেন। কখনো সিদ্ধান্ত হয় যে, সম্রাটকে সাথে নিয়ে হোসেন আলী খান দাক্ষিণাত্যে এবং আবদুল্লাহ খান দিল্লী চলে যাবেন। কখনো মনস্থ করা হয় যে, আবদুল্লাহ খান মুহাম্মদ শাহকে নিয়ে দিল্লী যাক এবং হোসেন আলী খান একা চলে যাক নিযামুল মুল্‌কের সাথে লড়তে। এই অস্থিরতার মধ্যে প্রতিদিন শাহী সফর সরঞ্জাম ও সওয়ারী জন্তুর পাল আগ্রার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, আবার ফিরিয়ে আনা হয়। দুশ্চিন্তার আরো একটা কারণ ছিল স্বয়ং মুহাম্মদ আমীন খান। এই ব্যক্তি বাহ্যত সৈয়দদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল এবং নিযামুল মুল্‌কের বিরুদ্ধে তাদেরকে পরামর্শ দিত। কিন্তু উভয় ভ্রাতা জানতেন যে, মনে মনে সে তাদের কট্টর দুশমন। নিযামুল মুল্‌কের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে সে কখনো চাইবে না যে, নিযামের মোকাবিলায় আমরা জয়ী হই। আমীনের সামরিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক দক্ষতা এবং সম্রাটের ওপর তার প্রভাব সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ ছিলেন না। তাই তারা বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে, এই প্রকাশ্য বন্ধুও প্রচ্ছন্ন শত্রুকে কি করা যায়। তাকে দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যাওয়াও সমিচীন মনে হয় না। সম্রাটের কাছে একাকী রেখে যাওয়াও কল্যাণকর নয়। অবশেষে স্থির হলো যে, তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু বুদ্ধিমান উপদেষ্টারা এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেন। তাঁরা বললেন যে, মুহাম্মদ আমীন খান প্রতাপশালী মোগল গোষ্ঠীর নেতা। তাঁর গায়ে হাত দেয়া ভিমরুলের চাকে ঢিল ছোড়ার মত বোকামীর কাজ হবে। এসব সমস্যার যখন কোন কূলকিনারা খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন তারা বাধ্য হয়ে নিযামুল মুলককে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে বাগে আনার উদ্যোগ নিলেন। সম্রাটের পক্ষ থেকে নিযামুল মুল্‌ককে একটা ফরমান লিখে পাঠানো হলো। তাতে বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হলো যে, "নবাব সাহেব বিনা অনুমতিতে মালোহ ত্যাগ করলেন কিভাবে? আপনার কোন্ ইচ্ছাটি এ যাবত অগ্রাহ্য করা হয়েছে? আপনি যদি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ ও শিকারের উদ্দেশ্যে যেতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাহলে সে জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে তা নামঞ্জুর করা তো অকল্পনীয়। এমনকি আপনি দাক্ষিণাত্যের শাসন ক্ষমতা চাইলে তাও দেয়া হতো।" এ ধরনের কিছু কথাবার্তার পর শেষে লেখা হয়েছিল যে, "দাক্ষিণাত্য থেকে অব্যাহত গোলযোগ ও অরাজকতার খবর শুনে আমরা আগেই মনস্থ করেছি যে, আপনাকে ঐ অঞ্চলের সুবেদারীতে নিয়োগ করা হবে। আল্লাহর শোকর যে, এ লক্ষ্য আপনা আপনি অর্জিত হলো। এখন

আপনার নামে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারীর আনুষ্ঠানিক ফরমান জারী করা হচ্ছে। এ ফরমান অনুসারে যথাবিহিত বিচার বিবেচনার পর আপনি আলম আলী খানকে প্রধান সেনাপতি হোসেন আলী খানের পরিবার সমেত ফেরত পাঠিয়ে দেবেন।" এই শাহী ফরমানের সাথে হোসেন আলী খান অত্যন্ত বন্ধুসুলভ ভাষায় একখানা চিঠিও নিযামুল মুলকের কাছে লিখলেন। ঐ চিঠির বক্তব্য ছিল এই যে, "দেলোয়ার আলী খানকে আমি আমার পরিবার পরিজন আনতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে, সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহর শোকর যে, সে সমুচিত শাস্তি পেয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে এ কথাও শুনেছি যে, কিছু সংখ্যক গোলযোগ প্রিয় লোক নানা বিষয়ে আপনার কাছে এমন সব কথা লিখেছে, যাতে করে আমাদের সাথে আপনার বিরোধ সৃষ্টি হয়। আমরা যারা প্রাচীন বন্ধু আছি, তাদের ভেতরে আল্লাহ্ যেন কখনো এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না করেন। কোন কোন লোক সম্রাটের কাছে আপনার সম্পর্কে এমন কথা বলেছিল, যার দ্বারা আপনার ওপর সম্রাটের রুষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আমি আপনার আনুগত্যের নিশ্চয়তা দিয়ে তাঁর মনকে সংশয়মুক্ত করে দিয়েছি। এখন জাহাঁপনা আপনাকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিয়োগ করেছেন। আমার পক্ষ থেকে মুবারকবাদ গ্রহণ করুন এবং আমার পুত্র আলম আলী খান ও পরিবার পরিজনকে নিরাপদে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।"

আলম আলী খানের পরাজয়

কিন্তু উপরোক্ত চিঠি ও ফরমান পৌঁছার আগেই নিযামুল মুল্‌ক ও আলম আলী খান নিজ নিজ জায়গা ত্যাগ করে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করেছিলেন। রমযানের শুরুতে আলম আলী ফয়দাপুরে পৌঁছে জানতে পারলো যে,[১] দেলোয়ার আলী খান পরাজিত ও নিহত হয়েছে। সহযাত্রীদের কেউ কেউ আলম আলীকে পরামর্শ দিল যে, এখন সামনে অগ্রসর হওয়া সমিচীন হবে না। আওরংগাবাদ অথবা আহমদ নগরে গিয়ে বরং হোসেন আলী খানের অপেক্ষায় থাকা হোক এবং লুটতরাজ ও চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে নিযামুল মুল্‌ককে বিব্রত করতে মারাঠা সৈন্যদেরকে লেলিয়ে দেয়া হোক। কিন্তু অতি উৎসাহী তরুণরা এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করলো এবং এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখলো। শেষ পর্যন্ত তারা বালাপুর[২] গিয়ে নিযামুল মুলকের মুখোমুখী অবস্থান নিল। এখানে হোসেন আলী খানের চিঠি ও শাহী ফরমান নিযামুল মুল্‌কের

---

১. অজন্তা ঘাটের উত্তর প্রান্তে পাতুয়া ষ্টেশনের ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই পথ দিয়েই আওরংগাবাদ প্রদেশ থেকে খান্দেশ প্রদেশে যাতায়াত করা হতো। এ জায়গাটা উভয় প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত ছিল।

২. এ স্থানটি আওরংগাবাদ ও বুরহানপুর থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত।

হস্তগত হয়। তিনি খুবই ধুমধামের সাথে এই চিঠি ও ফরমানকে স্বাগত জানান। সকলের সামনে তিনি তা পড়ে শোনান। অতপর আলম আলী খানের নিকট তার একটি কপি পাঠান এবং তাকে লেখেন ঃ "এখন আমি দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিযুক্ত হয়েছি। কাজেই আমার সাথে লড়াই করে তোমাদের কোন লাভ হবে না। তোমাদের সৈন্য ফেরত পাঠাও। আমি তোমাকে ও প্রধান সেনাপতির পরিবার পরিজনকে নিরাপদে আগ্রায় পৌঁছানোর দায়িত্ব নিচ্ছি।" আলম আলী খান এতে শান্ত হলো না। কিন্তু এই রাজনৈতিক কৌশল দ্বারা নিযামুল মুল্‌কের যে ভিন্নতর অভিপ্রায় ছিল, তা সফল হলো। আলম আলী খানের সেনাবাহিনীতে বেশীর ভাগ সেনাপতি ও জওয়ান ছিল দাক্ষিণাত্যের। তারা যখন জেনে ফেললো যে, নিযামুল মুলক তাদের সুবেদার হয়ে এসেছেন, তখন তারা নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে নিজেরাই ভাবতে শুরু করলো। পদচ্যুত ভারপ্রাপ্ত সুবেদারের সাথে মিলিত হয়ে সদ্য নিযুক্ত সুবেদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা তাদের জন্য ক্ষতিকর ছিল। তাই তারা আলম আলী খানের কাছ থেকে একে একে কেটে পড়তে লাগলো। এভাবে হোসেন আলী খানের চিঠি ও শাহী ফরমান দুই প্রতিপক্ষের মর্যাদা ও অবস্থানকে একেবারেই ওলটপালট করে দিল। পূর্বে নিযামুল মুল্‌ককে একজন বিদ্রোহী আমীর মনে করা হতো এবং আলম আলী খান মোগল সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এখন আলম আলী খান বিদ্রোহীর অবস্থানে এসে দাঁড়লো এবং নিযামুল মুল্‌ক লাভ করলেন মোগল সরকারের প্রতিনিধির মর্যাদা। আলম আলী খান এ অবস্থা দেখে যুদ্ধের ব্যাপারে তাড়াহুড়া শুরু করলো এবং ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট দু' পক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হলো। নিযামুল মুল্‌ক অত্যন্ত নগণ্য ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে আলম আলী খানকে পরাজিত করলেন এবং সে রণাঙ্গনে নিহত হলো।

রণাঙ্গনে হোসেন আলী খান

শওয়াল মাসের শেষ ভাগে এ খবর আগ্রায় পৌঁছলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ক্রোধে অধীর হয়ে গেলেন। উভয় ভ্রাতা প্রচন্ড আক্রোশে তৎক্ষণাত মুহাম্মদ আমীন খানকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলেন। হোসেন আলী খান তার ওপর আঘাত হানার জন্য সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিলেন। আর মুহাম্মদ আমীন খান নিজের বাসভবনের চারপাশে পরিখা খনন করে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু জ্ঞানীগুণীজনেরা উভয় ভ্রাতাকে এই কাজের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে তাদেরকে শান্ত করলেন এবং আবদুল্লাহ খান স্বীয় ভাইকে বুঝিয়ে সুজিয়ে মুহাম্মদ আমীন খানের সাথে আপোষ রফা করলেন। অতপর দুই ভাই পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, হোসেন আলী খান সম্রাটকে সাথে নিয়ে আজমীর হয়ে অজিত সিংকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে যাবেন। আর আবদুল্লাহ খান দিল্লী যেয়ে অবস্থান করবেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর

৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে তারা আগ্রা থেকে আজমীর অভিমুখে রওনা হলেন। ক্রোশ খানেক যাওয়ার পর আবদুল্লাহ্ খান রতন চাঁদকে সম্রাটের কাছে রেখে দিল্লীর দিকে চলে গেলেন। মুহাম্মদ আমীন খান এ যুদ্ধ ঠেকানোর অনেক চেষ্টা করলেন। তিনি হোসেন আলী খানকে বললেন যে, আমি আমার পুত্র কামরুদ্দীন খানকে দাক্ষিণাত্য পাঠাচ্ছি। সে আপনার পরিবার পরিজনকে পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে নিয়ে আসবে। কিন্তু হোসেন আলী খান এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। অতপর মুহাম্মদ আমীন খান বললেন যে, সেনাবাহিনীতে বিশেষত আমার বাহিনীতে বহু মোগল সৈন্য রয়েছে, যারা নিযামুল মুলকের সাথে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। কাজেই আমাকে ও এই মোগল সৈন্যদেরকে রেখে যান। কিন্তু হোসেন আলী খান ভাবলেন যে, মুহাম্মদ আমীন খানকে রেখে যাওয়া সাথে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক। তাই তিনি তাকে রেখে যেতে সম্মত হলেন না। অধিকন্তু চাচাজান চাচাজান বলে সম্বোধন করে ও টাকা পয়সা দিয়ে তাকে খুশী করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হোসেন আলী খানের প্রাণনাশ

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ আমীন খান সম্পর্কে হোসেন আলী খানের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো। একথা সত্য যে, তিনি যদি তাকে রেখে যেতেন, তবে এই ধুরন্ধর ব্যক্তি এমন কৌশল করতেন যে, দুই ভাই আর একত্রিত হবার সুযোগ পেতেন না। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হলো যে, তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আরো বেশী বিপজ্জনক ছিল। তিনি পথিমধ্যেই হোসেন আলী খানকে গোপনে হত্যা করার এক অব্যর্থ ষড়যন্ত্র পাকালেন। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত কতিপয় ব্যক্তিকে দিয়ে এত সন্তর্পনে এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করলেন যে, অন্য কেউ ঘুর্ণাক্ষরেও তা জানতে পারলো না। মুহাম্মদ আমীন খান বাদে এই ঘাতক দলে ৫জন লোক ছিল। তাঁরা হচ্ছে ঃ (১) সৈয়দ মুহাম্মদ আমীন সাদাত খান (অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) (২) হায়দার কুলি খান সাফরাইনী, (৩) মীর হায়দার কাশগড়ী, (৪) শাহ আবদুল গফুর ও (৫) মীর জুমলা। এদের মধ্যে মীর জুমলার তো কোন পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে অন্যান্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা প্রয়োজন।

(১) সাদাত খান মীর মুহাম্মদ আমীন—ইনি নিশাপুরের সৈয়দ বংশোদ্ভূত। ফররুখ শিয়ার যখন যুবরাজ, তখন তার ব্যক্তিগত কর্মচারী দলের অন্তর্ভুক্ত হন এবং হাজারী পদবী লাভ করেন। ফররুখ শিয়ারের সিংহাসনে আরোহণের পর তাকাররুখ খান মুহাম্মদ জাফরের অধীনে কারধারগিরীর সহকারী শাসক নিযুক্ত হন। অতপর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাকে হান্ডন ও বিয়ানার শাসনকর্তা হিসেবে পদোন্নতি এবং দেড় হাজারী পদবী দেন। গিরিধর বাহাদুরের বিরুদ্ধে এলাহাবাদে যে অভিযান পরিচালিত হয়, তার নেতৃত্বের জন্য প্রথমে তাকেই মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু একই সময় এই ব্যক্তি মীর জুমলাকে

প্রধান সচিব পদে নিযুক্ত করার জন্য হোসেন আলী খানের নিকট সুপারিশ করেন। রতন চাঁদ এই সুপারিশের বিরোধিতা করে তা নাকচ করিয়ে ছাড়ে। এমনকি সে এলাহাবাদ অভিযানের প্রস্তাবিত অধিনায়কত্বও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হায়দার কুলি খানকে দেয়ার ব্যবস্থা করে। সম্ভবত তখন থেকেই ইনি রতন চাঁদ ও উভয় সৈয়দের শত্রু হয়ে যান এবং এই শত্রুতাই আলোচ্য ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণে তাকে প্ররোচিত করে।

(২) হায়দার কুলি খান মুহাম্মদ রেজা—ফররুখ শিয়ারের পিতা আজীমুশ শানের সরকারে চাকুরী করতো। ফররুখ শিয়ারের সিংহাসনে আরোহনের পর সে মীর জুমলার মধ্যস্থতায় হায়দর কুলি খান খেতাবে ভূষিত হয় এবং নিযামুল মুল্কের দাক্ষিণাত্যের সুবেদারীর আমলে দাক্ষিণাত্যের সচিব নিযুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যে নিযামের সাথে তার বনিবনা না হওয়ায় সেখান থেকে গুজরাটের সচিব ও রাজস্ব আদায়কারী পদে বদলী হয়। এখানে তার কড়াকড়িতে অতিষ্ট হয়ে প্রজারা নালিশ দেয়ায় সৈয়দ আবদুল্লাহ খান তাকে অপসারিত করেন। দিল্লীতে ফিরে গিয়ে সে রতন চাঁদের মধ্যস্থতায় আবদুল্লাহ খানের সাথে সম্পর্ক পুনর্বহাল করে এবং অল্পকালের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। নেকু শিয়ারের বিরুদ্ধে আগ্রার দুর্গ অবরোধের সময় তিনি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এ জন্য হোসেন আলী খান তার প্রতি সহানুভূতিশীল হন। পরে তাকে গিরিধর বাহাদুরের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ দখলের অভিযানে পাঠান। এলাহাবাদ থেকে ফিরে আসার পর হোসেন আলী খান তাকে ৫০ হাজার রুপিয়া পুরষ্কার দেন, তার প্রতি আরো বেশী সহানুভূতিশীল হন এবং আগ্রা থেকে যাওয়ার সময় তাকে কামান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাকে বাহ্যত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরম শুভাকাংখী মনে হতো এবং হোসেন আলী খানও তার যোগ্যতা ও বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি স্বভাবগতভাবে অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর ছিল। সে একই সময় মুহাম্মদ আমীন খান ও হোসেন আলী খান উভয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতো। মুহাম্মদ আমীন খানের হত্যার ষড়যন্ত্রে সে হোসেন আলী খানের এবং হোসেন আলী খানের হত্যার ষড়যন্ত্রে মুহাম্মদ আমীন খানের সহযোগী ছিল। দু'জনের কাউকেই সে অপরজনের গোপন তথ্য জানায়নি। কেননা সে মনে করতো, যে পক্ষই জয়যুক্ত হবে, তার বন্ধুত্ব দ্বারা সে লাভবান হতে পারবে।

(৩) মীর হায়দার কাশগড়ী—মোগল সৈন্যের একজন সেনাপতি। মুহাম্মদ আমীন খান কেবল তার বীরত্বে অভীভূত হয়ে গোপন ষড়যন্ত্রের অংশীদার করেন এবং তাকে দিয়েই হোসেন আলী খানকে খুন করাতে চেয়েছিলেন।

(৪) শাহ আবদুল গফুর—এই ব্যক্তি সিন্ধুর জনৈক ফকীর ছিল। তার সম্পর্কে খ্যাতি ছিল যে, বহু জিন তার বশীভূত ছিল এবং তারা তাকে অদৃশ্য খবর জানাতো। এই সুবাদে সে মোগল প্রাসাদের কর্মকর্তা, ভৃত্য ও বেগমদের

ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্রমান্বয়ে স্বয়ং সম্রাট মুহাম্মদ শাহের মাতা নবাব কুদসিয়া ও সদরুন্নেসাকেও সে নিজের ষড়যন্ত্রের অংশীদার করে নেয়, যাতে তাদের প্রভাবে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ওপর মুহাম্মদ শাহের বিরাগ অব্যাহত থাকে।

মীর জুমলা সহ এই পাঁচজন পারস্পরিক সলাপরামর্শের মাধ্যমে হোসেন আলীকে যত শীঘ্র সম্ভব হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হয় এবং মীর হায়দারকে ঘাতক নিযুক্ত করা হয়। হিঃ ১১৩২ সনের ৬ই জিলহজ্জ মোতাবেক ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর যখন রাজকীয় অভিযাত্রী দল ফতেহপুর সিক্রি থেকে ২৫ ক্রোশ দূরে অবস্থান করছিল, তখন হোসেন আলী খান সম্রাটের কাছ থেকে বেরিয়ে নিজের তাঁবুর দিকে যাচ্ছিলেন। ঠিক এই সময় মীর হায়দর কাশগড়ী তাকে থামিয়ে তার কাছে একটি দরখাস্ত পেশ করে। হোসেন আলী খান দরখাস্তটি পড়তে লাগলেন। সহসা মীর হায়দার ছোরা বের করে তার পেটে ঢুকিয়ে দিল। মোগল সৈন্যরা আশেপাশেই ছিল। তারা অত্যন্ত ক্ষীপ্র গতিতে এসে হোসেন আলী খানের দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে হায়দার কুলি খানের তাঁবুতে পৌছালো। সেখান থেকে মুহাম্মদ আমীন খান ও হায়দার কুলি খান মস্তকটি নিয়ে সম্রাটের কাছে গেল। সম্রাট ভয়ে হেরেমে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু সাদাত খান মুখোশ পরে ভেতরে ঢুকলো এবং সম্রাটকে পাজা কোলে করে বাইরে নিয়ে এল। এখানে কামরুদ্দীন খানের হাতী প্রস্তুত ছিল। মুহাম্মদ আমীন খান সম্রাটকে নিয়ে হাতীর পিঠে সওয়ার হলেন। একটি লম্বা বাঁশে হোসেন আলী খানের মাথা ঝুলানো হলো এবং মানুষের মনোযোগ অন্য দিকে ফেরানোর জন্য সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা করে দেয়া হলো যে, হোসেন আলী খানের যাবতীয় সম্পত্তি ও কোষাগার লুণ্ঠন করা হোক। অর্থ পিশাচ সৈন্যরা এ ঘোষণা শোনা মাত্রই প্রধান সেনাপতির নিহত হওয়ার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তার সম্পদ লুটপাট শুরু করে দিল। অপর দিকে হায়দার কুলি খান লুটপাটরত সৈন্যদের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে দিল। বারেহার সৈয়দদের মধ্যে এ খবর সর্বপ্রথম হোসেন আলী খানের ভ্রাতুস্পুত্র গায়রত খানের গোচরে আসে। সে এ খবর শোনা মাত্রই অস্ত্রশস্ত্র ও হাতের কাছে পাওয়া ৪০/৫০ জন্য সৈন্য নিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশের সাথে মুহাম্মদ আমীন খান ও সম্রাট যেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেদিকে ছুটলেন। কিন্তু কাছে আসতেই তাকে বন্দুক দিয়ে স্বাগত জানানো হলো এবং সে নিহত হলো। এভাবে সৈয়দদ্বয়ের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মধ্য থেকে যার যার কানে খবর পৌছতে লাগলো, সে কোন প্রস্তুতি ছাড়া বেসামাল হয়ে ছুটে আসতে লাগলো এবং সহজেই প্রত্যেককে খতম করা হলো। তারা পরস্পরে মিলিত হয়ে সৈন্য সমাবেশ করে সুশৃংখলভাবে আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করলো না। বিন্দুমাত্র বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ না করে নিছক বীরত্বের তেজ দেখিয়ে তারা সবাই মারা পড়লো। হোসেন আলী খানের বিশাল বাহিনীতে আগেও অন্য কোন নেতা অবশিষ্ট ছিল না। এবার এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বিশৃংখল কার্যকলাপের কারণে তা মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে

গেল। আর বিপুল ধনসম্ভার যা স্বয়ং সম্রাটের সাথে টেক্কা দিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। এমনভাবে লুটপাট হয়ে গেল যে, তার আর কোন নামনিশানা রইল না। সাধারণ প্রজারা হোসেন আলী খানের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল। তারা তার এই আকস্মিক পতনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার লাশের পর্যন্ত চরম অবমাননা করলো। তার জানাজা করার জন্যও মানুষ পাওয়া গেল না। মুহাম্মদ আমীন খান কয়েকজন লোক যোগাড় করে লাশকে আজমীরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা তা রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে গেল। কয়েকদিন পরে স্থানীয় প্রশাসক লাশটি উঠিয়ে আজমীর পাঠালো। রতন চাঁদ জনসাধারণের চোখে আরো বেশী ঘৃণিত ও ধিকৃত ছিল। তাকে যখন পাকড়াও করে মুহাম্মদ আমীন খানের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন লোকেরা তাকে টেনে পথে বের করে আনে এবং পিটাতে পিটাতে উলংগ করে ফেলে।

আবদুল্লাহ খানের প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যর্থ চেষ্টা

আবদুল্লাহ খান পথিমধ্যেই রতন চাঁদের সংক্ষিপ্ত চিঠি মারফত হোসেন আলী খানের নিহত হওয়ার খবর জানতে পারলেন। কতিপয় উত্তেজিত সৈয়দ তাকে তৎক্ষণাত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে যাওয়ার পরামর্শ দিল। কিন্তু তিনি বিনা প্রস্তুতিতে লড়াই করতে যাওয়া সমিচীন মনে করলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে, অবিলম্বে দিল্লীতে গিয়ে তৈমুর বংশীয় আর একজন যুবরাজকে সিংহাসনে বসিয়ে দেবেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করে মুহাম্মদ শাহের সাথে যুদ্ধ করবেন। তিনি তৎক্ষণাত স্বীয় ভাই দিল্লীর সুবেদার নাজমুদ্দীন আলী খানকে নির্দেশ দিলেন যে, কোন এক যুবরাজকে বাছাই করে সিংহাসনে বসিয়ে দাও। এই নির্দেশ মোতাবেক ১৫ই জিলহজ্জ তারিখে দিল্লীতে বাহাদুর শাহের পুত্র রফিউশ শানের জৈষ্ঠ পুত্রকে আবুল ফাতাহ জহীরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবরাহীম উপাধি দিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করানো হলো। এর দু'দিন পর আবদুল্লাহ দিল্লী পৌঁছলেন। তিনি সেনা সমাবেশের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে শুরু করলেন। কয়েকদিনের মধ্যে এক কোটি রুপিয়া ব্যয়ে ৯০ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হলো। এদের মধ্যে কেবল টাকার লোভে ভর্তি হওয়া লোকের সংখ্যাই ছিল বেশী। আবদুল্লাহ খান তাদেরকে তিন মাস করে অগ্রিম বেতন দিয়ে দেন। অনেকেই এই টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। পুরনো অভিজ্ঞ সৈনিকরা নতুন ভর্তি হওয়া সৈনিকদের সমান বেতন পাওয়ায় অতৃপ্ত ও মনোক্ষুন্ন হয়। আবদুল্লাহ খান এর চেয়েও মারাত্মক যে ভুল করেন তা ছিল এই যে, কোন কামান সংগ্রহের ব্যবস্থা করেননি। অথচ ছোট বড় প্রায় ১৬০০ কামানের অধিকারী দুর্ধর্ষ ও সুদক্ষ গোলন্দাজ সেনানায়ক হায়দার কুলি খানের সাথে তার লড়াই আসন্ন। এরূপ নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আবদুল্লাহ খান ১১৩৩ হিঃ মুহাররম মোতাবেক ১৭২০ খৃঃ ১লা নভেম্বর ইবরাহীম শাহকে সাথে নিয়ে মুহাম্মদ শাহের সাথে লড়াই করার জন্য দিল্লী থেকে রওনা হলেন।

কিন্তু একদিকে ভাইএর মৃত্যু শোক, অপর দিকে নিজের পদচ্যুতির দরুন তার মানসিক অবস্থা এতটা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, কথা বলতে চাইতেন একটা, আর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতো অন্যটা। বারেহার সৈয়দ পরিবারের অধিকাংশ সেনাপতির অবস্থাও অনেকটা তদ্রূপ। এরূপ অবস্থায় মুহাম্মদ আমীন খান ও হায়দার কুলি খানের মত সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ সেনাপতিদ্বয়ের সাথে যুদ্ধ করার কি পরিণতি হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ওদিকে মুহাম্মদ শাহ হোসেন আলী খানের ছিন্ন মাথা ও মুবারকবাদ সম্বলিত চিঠি নিযামুল মুল্‌কের নিকট পাঠিয়ে ৯ই জিলহজ্জ তারিখে দিল্লী অভিমুখে রওনা হলেন। ১২ই মুহাররম ১১৩৩ হিঃ হাসানপুরের নিকট দিল্লী থেকে ২০ ক্রোশ দূরে আবদুল্লাহ খানের সামনে গিয়ে অবস্থান নিলেন। মুহাম্মদ শাহের সেনাবাহিনী আবদুল্লাহ খানের তুলনায় প্রায় অর্ধেক ছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ খানের বাহিনীতে বীরত্বের পাশাপাশি উত্তেজনা ছিল উন্মত্ততার পর্যায়ে। কিন্তু মুহাম্মদ শাহের বাহিনীতে বীরত্বের পাশাপাশি শান্ত মনমস্তিষ্ক ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত কার্যকর ছিল। ১৩ ও ১৪ই মুহাররম উভয় বাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হলে হায়দার কুলি খানের কামানগুলো আবদুল্লাহ খানের বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। তার সৈন্যদের অধিকাংশ ঐদিনই প্রথম রণাঙ্গনের চেহারা দেখেছিল। তারা তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। মুষ্টিমেয় কিছু সৈন্য নিয়ে তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন। অবশেষে আহত হয়ে গ্রেফতার হলেন।[১] এভাবে বারেহার সৈয়দদের যে চক্রটি দীর্ঘ আট বছর যাবত ভারত সাম্রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় লিপ্ত ছিল, তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যতদিন তারা ক্ষমতায় ছিলেন, হাজার হাজার মানুষ তাদের সামনে মাথা নোয়াতো। আর যেই তাদের পতন ঘটলো, অমনি তাদের একান্ত অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরাও তাদেরকে "অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক" বলে গাল দিতে লাগলো। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন নিযামুল মুল্‌ক, যাকে খতম করার চেষ্টায় তারা নিজেরাই বেঘোরে প্রাণ দিলেন। এই ব্যক্তি মুহাম্মদ শাহের নির্দেশেও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে "অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক" বলতে ও তাদের ওপর অভিসম্পাত দিতে রাজী হননি।

মুহাম্মদ শাহের নয়া প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ

মুহাম্মদ শাহ সৈয়দদের নিগড় থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই যারা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাদের প্রত্যেককে বড় বড় পদ, পদবী ও খেতাব দিলেন। মুহাম্মদ আমীন খানকে আট হাজারী পদবী এবং উজিরে আজম পদে

১. আবদুল্লাহ খান জীবনের অবশিষ্টাংশ কারাগারেই কাটিয়ে দেন। অবশেষে ১১৩৫ হিজরীর মুহাররম মোতাবেক ১৭২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নিযামুল মুল্‌ক। তিনি তার প্রাণ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু মোগলদের অধিকাংশের ধারণা ছিল যে, আবদুল্লাহ খান বেঁচে থাকলে আবার কোন না কোন উপদ্রব দেখা দেবে।

অভিষিক্ত করলেন। খানে দাওরান খাজা আসেমকে হোসেন আলী খানের স্থলে প্রধান সেনাপতি পদ ও আমীরুল উমারা খেতাব, জাফর খানকে রওশনুদ্দৌলা খেতাব ও তৃতীয় প্রধান সেনাপতি পদ, হায়দার কুলি খানকে মুইজ্জুদ্দৌলা নাসের জং খেতাব, সাত হাজারী পদবী গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি ও সেই সাথে গুজরাটের সুবেদারী পদ এবং সাদাত খানকে সাত হাজারী পদবী, বুরহানুল মুলক বাহাদুর জং খেতাব ও আগ্রা প্রদেশের সুবেদারী পদ প্রদান করলেন। এভাবে মুহাম্মদ শাহের আমলে যারা ভারতীয় রাজনীতির প্রকৃত স্তম্ভ ছিলেন, তারা দৃশ্যপটে এসে গেলেন।

দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সাথে নিযামের আচরণ

হোসেন আলী খানের নিহত হওয়ার পর সংগে সংগেই দাক্ষিণাত্য থেকে নিযামুল মুল্‌ককে ডেকে পাঠানো হলো। কিন্তু তিনি একাধিক কারণ দর্শিয়ে অপারগতা প্রকাশ করলেন। প্রথম কারণ ছিল এই যে, সম্রাট মুহাম্মদ আমীন খানকে উজীর নিযুক্ত করে ফেলেছেন। অথচ সৈয়দদ্বয়ের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আগে নিযামুল মুল্‌ককে এই পদ প্রদানের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এই প্রতিশ্রুতি ভংগের কারণে নিযামুল মুল্‌ক অতিশয় মনোক্ষুণ্ন হন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মুহাম্মদ আমীন খানের উপস্থিতিতে তিনি দিল্লী যাওয়া পছন্দ করছিলেন না। কেননা এখন উভয় ব্যক্তিত্ব সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়ায় ব্যক্তিত্ব সংঘাতের আশংকা দেখা দিয়েছিল। নিযামুল মুলকের ভাবনা ছিল এই যে, পারিবারিক সম্পর্ক ও পুরনো সম্প্রীতির বন্ধন থাকা সত্ত্বেও সমমর্যাদা ও সমান ক্ষমতার অধিকারী দুই ব্যক্তিত্বের এক জায়গায় সমবেত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য হয়ে উঠবে। তৃতীয় কারণ ছিল এই যে, তখন খোদ্ দাক্ষিণাত্যের পরিস্থিতি এত দূর খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, তা শুধরানোর জন্য নিযামুল মুলকের সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। হোসেন আলীর চুক্তি দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তিকে নবতর সাহস ও উদ্যমে বলিয়ান করে তুলেছিল এবং তাদের মধ্যে নতুন জীবনের সঞ্চার করেছিল। তারা রাজকীয় ফরমানের বলে প্রত্যেক এলাকা থেকে এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ কর আদায় করা তাদের বৈধ অধিকার মনে করতো। যে এলাকায় একবার তারা হাত ঢুকাতে সক্ষম হতো, সেখানে তাদের স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। বিভিন্ন মারাঠা গোত্রপতি বিভিন্ন মোগল শাসিত প্রদেশে উক্ত কর আদায়ের জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে শিবির গেড়ে বসে। বালাজী বিশ্বনাথ খান্দেশ ও বেরার বালাঘাটে, কান্নোজী ভোসলে বেরার পাইন ঘাট, গুন্ডুয়ানা ও সমগ্র পূর্বাঞ্চলে এবং ফতেহ্ সিং ভোসলে কর্ণাটকে কর খাজনা আদায়ে নিয়োজিত ছিল। হায়দারাবাদ ও বেরার প্রদেশে বিভিন্ন প্রতিনিধি নিয়োগ করে সেনাপতিদেরকে বেগলানা ও গুজরাটে পাঠিয়ে স্বয়ং মারাঠা সর্বাধিনায়ককে আওরংগাবাদে মোতায়েন করা হয়। হোসেন আলী খান

দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর পুত্র মাত্র ২০/২২ বছরের যুবক আলম আলী খান ভারপ্রাপ্ত সুবেদার নিযুক্ত হয়। এসব কাক শকুনের আগ্রাসী থাবা প্রতিহত করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই দাক্ষিণাত্যের প্রতিটি প্রদেশে মারাঠা রাজার প্রতিনিধি স্বয়ং মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিত্বকারী সুবেদারের সমপর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। এমনকি মোগল সুবেদারও তার সামনে কার্যত ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক আযাদ বলগ্রামীর ভাষায় মোগল সুবেদারের শাসন নামমাত্র টিকে ছিল। স্বয়ং নওয়াব নিযামুল মুল্‌ক একটি চিঠি মারফত সামসামুদ্দৌলা খানে দাওরানের কাছে এ পরিস্থিতির যে বিবরণ দেন তা নিম্নরূপ ঃ

"যে সন্ধি চুক্তি দাক্ষিণাত্যের অমুসলিম শক্তির স্পর্ধা বৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল, বৃহত্তর সামরিক স্বার্থের তাগিদে এবং দুর্গসমূহের সংরক্ষণ, সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান ও খোদাদ্রোহী শক্তির উচ্ছেদ সাধনের সুনিশ্চিত উপায় খুঁজে না পাওয়ার কারণে আপাতত সে চুক্তি বহাল রাখতে হয়েছে। জাহাপনার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত আর্থিক অনুদান প্রাপ্তি প্রচুর অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন সময়ে বারংবার যেসব বিষয়ের দাবী জানানো হয়েছে তা মঞ্জুর হওয়ার আগে এই সন্ধি বাতিল করা সমিচীন ও কল্যাণকর মনে হয়নি। উল্লিখিত আর্থিক ও সামরিক সাহায্য এবং দাবীদাওয়া পূরণের কোন লক্ষণ এখনো দৃশ্যমান হচ্ছে না। তাই সাময়িকভাবে উক্ত চুক্তি বহাল রাখা হয়েছে। তবে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এই বিভ্রান্ত সম্প্রদায়টির নেতাদের তাদের অনুসারীদের ওপর যতটা নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব থাকা উচিত, তা নেই। এই জনগোষ্ঠী তাদের নেতাদের নির্দেশ অমান্য করে চরম উচ্ছৃংখল ভংগীতে ছুটে চলে যায় এলাকা থেকে এলাকান্তরে এবং যথারীতি নৈরাজ্য চালিয়ে যায়। এ সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে একাধিকবার সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে তারা তাদের লোকজনকে শামাল দিতে অক্ষম। যা হোক, জাহাপনার পক্ষ থেকে নগদ আর্থিক সাহায্য ও পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত দাবীসমূহ পূরণ এ উপদ্রব থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক। প্রদেশগুলোর শীরায় শীরায় দুষিত রক্তের মত সঞ্চালিত এই অপশক্তির প্রতিকার ও সুচিকিৎসা এখন আর কোন ঔষুধ দিয়ে নয় বরং অস্ত্রোপচার দ্বারাই সম্ভব।"(রক্কয়াতে নুসাজী খান)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় কিরূপ পরিস্থিতিতে নিযামুল মুল্‌ক বালাপুরের যুদ্ধের পর আওরংগাবাদ পৌছেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তিনি সেখানে পৌছেই উপলব্ধি করেন যে, মারাঠাদের ক্রমবর্ধমান উৎপাত ও ঔদ্ধত্য যদি অবিলম্বে প্রতিহত করা না হয়, তাহলে গোটা দাক্ষিণাত্য অঞ্চল হাত ছাড়া হয়ে যাবে। ঘটনাক্রমে এর অল্প ক'দিন পরেই অর্থাৎ অক্টোবর, ১৭২০ খৃষ্টাব্দে এবং ১১৩৩ হিজরীর প্রথম দিকে বালাজী বিশ্বনাথ মারা যায়। তার পুত্র বাজিরাও

এর ক্ষমতায় এসে মারাঠা রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণে কিছুটা সময় লেগে যায়। এই বিলম্বের সুযোগ নিয়ে নিযামুল মুল্ক পুনরায় কুলহাপুরের রাজা শম্ভুজীর সাথে তার পুরনো সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। অপর দিকে হোসেন আলী খান যে চন্দ্র সেন যদুকে দমিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি নতুন করে তাকে শক্তি যোগান। ইতিমধ্যে রাজা সাহুর প্রতিনিধি নয়া সুবেদারের কাছ থেকে সাবেক সুবেদারের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার স্বীকৃতি আদায় করতে এলে নিযাম নানা তালবাহানা করে তা বিলম্বিত করেন। তার নীতি ছিল এই যে, সাহুর সাথে সরাসরি বিবাদ না করে মারাঠাদের মধ্য থেকেই দু'জন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেবেন। অতপর তৃতীয় শক্তি হিসেবে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। তাঁর এ পরিকল্পনা যখন পূর্ণ হলো, তখন তিনি চন্দ্র সেন ও শম্ভুজীর দাবীর ভিত্তিতে মোগল শাসিত এলাকায় আদায়কারী নিয়োগ করে একচেটিয়াভাবে সাহু কর্তৃক এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রমে কঠোর আপত্তি তুললেন। বাজী রাও এর জবাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল এবং আওরংগাবাদ প্রদেশের সীমান্তে মারাঠা সৈন্যের সমাবেশ হতে লাগলো। ব্যাপারটা সবে এ পর্যন্তই গড়িয়েছে এবং নিযামুল মুল্ক এক দুরন্ত পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা আঁটছেন—এমতাবস্থায় দিল্লী থেকে তাঁর নেমে আসা এক শাহী ফরমানে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ডেকে পাঠানো হলো। তাঁর চলে যাওয়ার পর তাঁর আরব্ধ নীতি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করতে পারে এমন কেউ তাঁর চোখে পড়লো না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি বাজী রাওয়ের দাবী দাওয়া মেনে নিলেন।

নিযামুল মুল্‌কের মন্ত্রীত্ব

সাবেক প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ খানের পরাজয়ের পর মুহাম্মদ আমীন খান প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেও দু' তিন মাসের বেশী তা স্থায়ী হয়নি। ১১৩৩ হিজরীর রবিউস সানী মোতাবেক ১৭২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। মন্ত্রীত্বের জন্য তার পুত্র কামরুদ্দীন খান ও খানে দাওরান খাজা আসেমের মধ্যে কিছুদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। অবশেষে এই মর্মে আপোষ রফা হয় যে, দু'জনের কাউকেই মন্ত্রীত্ব দেয়া হবে না। এ পদের জন্য নিযামুল মুল্‌ককে দাক্ষিণাত্য থেকে ডেকে আনা হবে। এদিকে স্বয়ং নিযামুল মুল্ক ও কেন্দ্রীয় কর্মসচিব মুহাম্মদ আমীন খানকে এক চিঠি মারফত সম্রাটের প্রতিশ্রুতি ভংগ ও নিজের সাবেক প্রাপ্য না দেয়ার অভিযোগ তুলে ওজারতীর দাবী জানালেন। এই চিঠির একটি অংশ নিম্নরূপ :

"মালোহে যখন আমি সুবেদারীতে কর্মরত ছিলাম, তখন সম্রাটের একাধিক লিখিত বার্তা পেয়েছিলাম। ঐ সব বার্তায় তিনি জানান যে, তিনি দুর্নীতিবাজ ও নৈরাজ্যবাদী বিদ্রোহীদের আশু উচ্ছেদ কামনা করেন। তিনি একাধিকবার বলেছেন যে, এই উচ্ছেদ অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মন্ত্রীত্ব

আমার কাছে সোপর্দ করাই সমিচীন মনে করেন। পরে এ ব্যাপারে জাহাপনার স্বহস্তে লিখিত ফরমানও প্রকাশিত হয়। আল্লাহর শোকর যে, জাহাপনার ইচ্ছা মোতাবেক আমি নিজের জান ও মালের পরোয়া না করে পরিবার পরিজনের সুখ শান্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এবং নিজের আরাম আয়েশ বিসর্জন দিয়ে সেই দুঃসময়েও অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, যখন এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কেউ আমাদের সহযোগী হতেও প্রস্তুত ছিল না। আল্লাহর ওপর নির্ভর করে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কামান সজ্জিত বিশাল শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছি। আল্লাহর মেহেরবানীতে ক্রমাগতভাবে বিজয় অর্জিত হয়েছে। এসব যুদ্ধে যে দুঃখ কষ্ট সইতে হয়েছে, তা সহ্য করা মানুষের সাধ্যের অতীত। এসব যুদ্ধ সংঘর্ষের পর শত্রুদের ভীতি সকলের মন থেকে দূরীভূত হয়েছে এবং শত্রুরা শতধা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এসব বিজয়ে অবদান রেখেছিল এমন কেউ কেউ পরবর্তীকালে প্রকৃতির দাসে পরিণত হয়। অবশেষে ইতিমাদুদ্দৌলা মরহুম মুহাম্মদ আমীন খানের চেষ্টায় হোসেন আলী খান নিহত হলে সম্রাট পক্ষপাল হারা পাখীর মত অসহায় হয়ে পড়েন। সাম্রাজ্যে এক সর্বাত্মক শূন্যতা দেখা দেয়। উপরোক্ত প্রাণপণ সংগ্রাম ও ত্যাগতিতিক্ষার সুফল ও প্রতিদান হিসেবে এবং প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষার্থে আমাকে মন্ত্রীত্ব দেয়া উচিত ছিল। বস্তুত জেষ্ঠতা ও প্রতিশ্রুতি উভয় বিচারেই মন্ত্রীত্ব আমার প্রাপ্য। মরহুম ইতিমাদুদ্দৌলার এ পদ গ্রহণ করাই উচিত ছিল না। যাই হোক, মানবীয় দুর্বলতা ও ওয়াদা খেলাপী বশত সেই অনুচিত কার্য সংঘটিত হয়ে থাকলেও আমি পুরনো সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তা মেনে নিয়েছিলাম। এক্ষণে তিনিও যখন অন্তর্হিত হয়েছেন, এরপর যদি মন্ত্রীত্ব অন্য কাউকে দেয়া হয়, তাহলে সেটা এত অসহনীয় হবে, যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শুধু এতটুকু জানিয়ে রাখছি যে, তেমনটি ঘটলে আমার পক্ষে আর কোন চাকুরীই গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এ মুহূর্তে দাক্ষিণাত্যের বিপর্যস্ত প্রশাসনকে শুধরানোর অনিবার্য তাগিদে এখানে সাময়িকভাবে অবস্থান করছি এবং বিজাপুর প্রদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে সেখানে সৈন্য পাঠানো হয়েছে, যা বাদোনীর কাছাকাছি পৌছে গেছে। ইনশাআল্লাহ, অতি শীঘ্র এ কাজ সম্পন্ন করে জাহাপনার দরবারে হাজির হব। ততক্ষণ এনায়াতুল্লাহ খান অথবা জাহাপনার মনোনীত অন্য কোন ব্যক্তি আমার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।"

(রক্কয়াতে মুসাভী খান)

বস্তুত উপরোক্ত চিঠি মন্ত্রীত্বের প্রশ্নের চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। নিযামুল মুল্‌ককে তৎক্ষণাত উজিরে আজম নিয়োগের সিদ্ধান্ত সম্বলিত ফরমান পাঠানো হয় এবং তাঁর প্রস্তাব অনুসারেই এনায়াতুল্লাহ খান কাশ্মীরীকে তার আগমন পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করা হয়। এনায়াতুল্লাহ

খান ফররুখ শিয়ারের আমলে গোয়েন্দা বিভাগ ও দেহরক্ষী বিভাগের সচিব ছিলেন এবং মুহাম্মদ শাহের আমলে খান সামান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

নিযামুল মুল্‌ক যখন কর্ণাটকের আফগান সরদারগণকে বশ্যতা স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আধুনীতে অবস্থান করছিলেন, ঠিক তখনই শাহী ফরমান লাভ করেন। তিনি তৎক্ষণাত আওরংগাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বীয় ফুফা আজদুদ্দৌলা কিসওয়ারায়ে জং[১] কে ভারপ্রাপ্ত সুবেদার নিযুক্ত করে ১১৩৩ হিজরীর জিলহজ্জ মোতাবেক ১৭২১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দিল্লী যাত্রা করেন এবং ১১৩৪ হিজরীর রবিউস সানী মোতাবেক ১৭২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে দিল্লী পৌছে ৫২ বছর বয়সে ভারত সম্রাট মুহাম্মদ শাহের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন।

প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযামুল মুল্‌কের মত ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠিত হওয়া মোগল সাম্রাজ্যের জন্য এমন এক দুর্লভ সুযোগ ছিল যে, এটিকে কাজে লাগালে নিসন্দেহে সাম্রাজ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হতে পারতো এবং এর বিচ্ছিন্নতা প্রবণ অংশগুলোর মধ্যে পুনরায় একটা মজবুত সংহতি গড়ে উঠতো। সাম্রাজ্যের উর্দ্ধতন ও প্রবীণতম কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা তখনো জীবিত ছিলেন, তাদের মধ্যে তাঁর মত উঁচু মানের সেনাপতি, দক্ষ ব্যবস্থাপক ও বিচক্ষণ প্রশাসক আর কেউ ছিল না। সে সময় দেশের বিপর্যস্ত অবকাঠামোকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাবনতিশীল কর্তৃত্বকে পুনর্বহাল করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর ব্যক্তিত্বেই নিহিত ছিল। দেশে তার প্রশাসনিক দক্ষতা ও প্রজ্ঞার কিরূপ সুনাম এবং তাঁর সামরিক তেজোবীর্যের কি দোর্দন্ড প্রতাপ বিরাজ করতো, তা একটি মাত্র ঘটনা থেকেই সম্যক উপলব্ধি করা যায়। মোগল সিংহাসনের তৎকালীন ভাগ্যবিধাতা ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পুরোধা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রবলতম সমর্থক যোধপুরের শাসক অজিত সিং রাটোর —যিনি সৈয়দদ্বয়ের পতনের পরও প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আজমীর ও গুজরাট রাজ্যে মোগল কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন—যখনই শুনলেন যে, নিযামুল মুল্‌ক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন, অমনি মুহাম্মদ শাহের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। অথচ ইতিপূর্বে খানে দাওরান, হায়দার কুলি খান,

---

১. তাঁর প্রকৃত নাম খাজা কামাল। নিযামুল মুল্‌কের আপন ফুফু তাঁর স্ত্রী ছিলেন। ইনি আলমগীরের আমলে তুরান থেকে ভারতে আসেন এবং গাজীউদ্দীন ফিরোজ জং-এর চেষ্টায় হায়দারাবাদ প্রদেশের সরকারী চাকুরী লাভ করেন। আলমগীর তাকে আওজ খান খেতাব দেন। ফররুখ শিয়ারের আমলে তাকে বেরারের সুবেদারীতে পদোন্নতি দেয়া হয়। এই পদে মুহাম্মদ শাহের আমল পর্যন্ত বহাল থাকেন। আলম খানকে পরাজিত করার পর যখন নিযামুল মুল্‌ক আওরংগাবাদ পৌছেন, তখন তাকে পাঁচ হাজারী পদবী ও আজদুদ্দৌলা কিসওয়ারায়ে জং খেতাব আনিয়ে দেন। আওরংগাবাদের শাহগঞ্জ মসজিদ তারই নির্মিত। এই মসজিদের সামনে যে বিশাল দিঘী রয়েছে, হোসেন আলী খান তার নির্মাণ কার্য শুরু করেন, তাতে আওজ খান তা আরো সম্প্রসারিত আকারে সম্পন্ন করেন। ভারত উপমহাদেশে সম্ভবতঃএতবড় দিঘী আর কোন মসজিদে নেই।

কামরুদ্দীন খান ও ইতিমাদুদ্দৌলার মত সামরিক ও বেসামরিক দিকপালরা তাকে বাগে আনতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন এবং তার লুটেরা সৈন্যরা দিল্লী থেকে ১৬ মাইল দূরবর্তী ইলাহাবর্দী খানের শাহী সরাইখানা পর্যন্ত গেরিলা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, নিযামুল মুল্কের প্রধানমন্ত্রীত্বে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণকে মজবুত করার দুর্বার ক্ষমতা নিহিত ছিল। কিন্তু শুধু ক্ষমতা থাকলেই তা ইপ্সিত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না যদি না তাকে কার্যকর করার সুযোগ দেয়া হয়। বস্তুত একথা অচিরেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, মুহাম্মদ শাহ ও তার সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা নয়া প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা উপলব্ধি করতে যেমন সক্ষম ছিলেন না, তেমনি তাকে কাজ করার সুযোগও দিতে চাইতেন না।

সম্রাট ও প্রধানমন্ত্রীর মতবিরোধ

মুহাম্মদ শাহের নয়া প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আলমগীরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে আলমগীরের ব্যক্তিত্বই ছিল রাজনীতি, রাষ্ট্রপরিচালনা, সাম্রাজ্য শাসন ও রাষ্ট্রনায়কোচিত দায়িত্ব পালনের আদর্শ পুরুষ। তিনি ভারতের সিংহাসনে এমন এক ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত দেখতে চাইতেন, যিনি রাজকীয় ভাবগাম্ভীর্যে ও সহিষ্ণুতায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের যথাবিহীত সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করনে দেশবাসীর নৈতিক মান উন্নয়নে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে, সময়ানুবর্তিতায় ও বিচার ফায়সালায় আলমগীরের যথার্থ উত্তরসুরী হবেন। তিনি মনে প্রাণে কামনা করতেন যে, সম্রাট যেন তার প্রাত্যহিক সময়ের অধিকাংশ সাম্রাজ্যের কাজে ব্যয় করেন, শাসনকার্যে ব্যক্তি বিশেষের সুবিধা অসুবিধার ও পছন্দ অপছন্দকে আমল না দেন, উপযুক্ত লোকদেরকে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করেন, খেতাব, পদ ও পদবী উপযুক্ত পাত্রকে দেন এবং নিজের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আচরণে সেই গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা অবলম্বন করেন, যার রাজকীয় সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত এ ধরনের মনোভাব পোষণকারী মন্ত্রী এমন এক তরুণ সম্রাটের পাল্লায় পড়েছিলেন যিনি রঙ্গলীলা প্রিয়[১] ভোগবিলাসী ও অতিমাত্রায় কৌতুক প্রিয় ছিলেন এবং সর্বদা খেলাধূলা ও আমোদফূর্তিতে মত্ত থাকতে ভালোবাসতেন। বল্গাহীন আনন্দ উল্লাস ও বিনোদনকে তিনি জীবনের প্রধানতম অবলম্বন ও লক্ষ্য বলে মনে করতেন। রাজনীতি ও দেশ শাসনের মত নিরস ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল না। যে ব্যক্তি তাকে যত বেশী হাসাতে, আনন্দে মাতোয়ারা করতে ও মনোরঞ্জনের খোরাক যোগাতে পারতো, সে তার দৃষ্টিতে ততবেশী আনুকূল্য, অনুগ্রহ, সম্মান ও মর্যাদা লাভের

১. এই শব্দটির সাথে মুহাম্মদ শাহের চরিত্রের এত গভীর সাদৃশ্য ছিল যে, দিল্লীর অধিবাসীদের কাছে আজও এই মোগল সম্রাট "রংগীলা (বখাটে) মুহাম্মদ শাহ" নামে খ্যাত।

যোগ্য বিবেচিত হতো। দেখে মুগ্ধ ও শুনে পুলকিত হওয়াই ছিল তার কাছে যোগ্যতা নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি। তাঁর কাছে আলমগীরের আমলের নিযামুল মুল্ক একেবারেই সেকেলে, রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কথাবার্তা তার কাছে হাস্যকর, পরামর্শ নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ও মতামত অগ্রহণযোগ্য মনে হতো। একে বয়সে তরুণ তদুপরি এরূপ বেলেল্লা স্বভাব দেখে তার চারপাশে ভিড় জমিয়েছিল অনুরূপ চরিত্রের লোকজন। তোষামোদ, প্রবঞ্চনা ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের মাধ্যমে তারা তাঁর স্বভাবচরিত্রে প্রধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সম্রাট যেসব ক্রিড়াকৌতুক ও সখ ভালো বাসতেন ও যাতে সবসময় মগ্ন থাকতেন, এসব লোক সেগুলোতে তার সহযোগী হতো, সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাঁকে খুশী রাখতো, তাঁর সাথে দহরম মহরম পাতানোর সুবাদে প্রজাদেরকে নানাভাবে শোষণ করতো এবং ঘুষ খেয়ে বড় বড় পদ ও পদবী বিক্রি করতো। স্বভাব চরিত্র, যোগ্যতা ও মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এদের কেউ শাহী দরবারে স্থান লাভের উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু সম্রাটের বখাটেপনা ও রঙ্গলীলা প্রবণতা, দুর্জন তোষণ, তোষামোদ প্রীতি এবং সর্বোপরি কে যোগ্য কে অযোগ্য তা বাছবিচারে অক্ষমতার দরুন এসব চরিত্রহীন লোক বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করে, সম্রাটের ঘনিষ্ঠ হয় এবং ভারত সাম্রাজ্যের ক্ষমতার চাবিকাঠি কুক্ষীগত করে। নিযামুল মুল্কের মত ব্যক্তিত্বের শাহী দরবারে থাকা এবং সম্রাটের ওপর প্রভাব বিস্তার করা এসব লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর ছিল। এ জন্য তারা নিযামুল মুল্কের বিরোধিতা ও সম্রাটকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য কোন চেষ্টা বাদ রাখেনি। এমনকি এ জন্য তারা এত হীন ও জঘন্য কারসাজির আশ্রয় নেয় যে, স্বয়ং নিযামুল মুল্ক পর্যন্ত মন্ত্রীত্বের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন।

মুহাম্মদ শাহের ঘনিষ্ঠ সহচরবৃন্দ

মুহাম্মদ শাহের এসব ঘনিষ্ঠ পাত্রমিত্র ও সহচরবৃন্দের সামান্য কিছু পরিচয় তুলে ধরা প্রয়োজন। এদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী ছিল সে হলো জনৈক জান মুহাম্মদ দরবেশের মেয়ে রহীমুন্নেসা। সে অত্যন্ত ধুরন্ধর, চতুর, শিক্ষিতা ও রাজপ্রাসাদের রীতিপ্রথা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিল। সম্রাটের পারিষদবর্গের কাছে সে প্রচার করে বেড়াতো যে, তার পিতা অদৃশ্যের খবর জানে। ক্রমান্বয়ে এ খবর প্রাসাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। মুহাম্মদ শাহ ও তার মা যখন সলিম গড়ের দুর্গে বন্দী ছিলেন, তখন মুহাম্মদ শাহের মায়ের সাথে তার পরিচয় ঘটে। জান মুহাম্মদের কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর সম্পর্কেও সঠিক প্রমাণিত হয় এবং তিনি তার ভক্ত হয়ে পড়েন। রহীমুন্নেসার মতিশয়োক্তি এই ভক্তিকে আরো গাঢ় করে তোলে। স্বয়ং মুহাম্মদ শাহ তার প্রেমে পড়ে যান। অতপর তাকে নিজেদের কাছে রাখার ফন্দি হিসেবে মাতাপুত্র রাষ্ট্র করে দেন যে, রহিমুন্নেসা মুহাম্মদ শাহের দুধ বোন। তখন থেকে রহিমুন্নোস 'কোকী

জিও' নামে খ্যাত হয়। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের পর মুহাম্মদ শাহ যখন নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হন, তখন এই মহিলা তার ওপর এত আধিপত্য বিস্তার করে যে, তিনি রাজকীয় সিলমোহর তার হাতে অর্পণ করেন। সরকারী দলীলপত্রে সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে সিলমোহর মারার ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়। বড় বড় আমীর ওমরা, শাসক, সচিব, সুবেদার প্রভৃতি তার কাছে হাজির হতো এবং উৎকোচ দিয়ে নিজের ইচ্ছামতো নিয়োগপত্র আদায় করতো। শুধু নিয়োগপত্র নয়, জাইগীর, পদবী পদোন্নতি সবকিছুর পক্ষেই সে শাহী ফরমান জারী করতো এবং সে প্রতিটি ফরমানের জন্য উচ্চ মূল্য আদায় করতো। মুহাম্মদ খান বংগেশ বলেন যে, মালোহের সুবেদারীর ফরমান লাভের জন্য তার কোকী জিও-কে এক লাখ রুপিয়া দিতে হয়েছিল। এ থেকেই বুঝা যায় যে, রহিমুন্নেসার এ ব্যবসায় কতখানি জমজমাট রূপ নিয়েছিল। অবশেষে সামসামুদ্দৌলা খানে দাওরান এক চক্রান্তের মাধ্যমে তাকে উৎখাত করেন।

অপর এক ব্যক্তি ছিল শাহ আবদুল গফুর। হোসেন আলী খানের হত্যার ষড়যন্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই ব্যক্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে। আবদুল গফুর ও কোকী একে অপরের সহযোগিতার অংগীকারে আবদ্ধ ছিল। কোকী রাজকীয় হেরেমের অভ্যন্তরে আবদুল গফুরকে একজন মস্ত বড় ওলী বলে প্রচার করতো আর আবদুল গফুর কোকীর পিতার অদৃশ্য ও ভবিষ্যত জান্তা হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দিত। এভাবে মুহাম্মদ শাহ ও তার মায়ের মনে আবদুল গফুরের প্রতিও প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে যায়। ১২ বছর পর্যন্ত সে সাম্রাজ্যের প্রশাসনের ওপর এতটা আধিপত্য ও দাপট চালিয়ে যায় যে, তার সামনে প্রধানমন্ত্রীরও কোন গুরুত্ব ছিল না। এমনকি সম্রাটের নির্দেশও তার সামনে অচল হয়ে যেত। কোকীর এসব কারবারে ও ঘুষের টাকায় আবদুল গফুর ভাগীদার হতো। অনুমান করা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়ায় সে দৈনিক পাঁচ হাজার রুপিয়া উপার্জন করতো। এ ছাড়া মুহাম্মদ শাহ তাকে টাকশালের দারোগাও বানিয়েছিলেন। কেউ তার কাছে টাকশালের হিসেব চাইবার সাহসই পেত না। আর সে সেখান থেকে যথেচ্ছা আত্মসাৎ করতো। অবশেষে যখন হিসেব নিকাশ নেয়া হলো তখন তার কাছে ৬০ লাখ রুপিয়া পাওনা ধরা পড়লো। এই তথাকথিত ওলিআল্লাহর 'খোদাভক্তির' অবস্থা ছিল এই যে, একবার সে নিজের এক ভৃত্যকে ডেকে পাঠালো। জানা গেল যে, ভৃত্য নামায পড়ছে। তথাপি আবদুল গফুর নির্দেশ দিল যে, যে অবস্থায়ই থাকুক ওকে ধরে আনো। এর ফলে তাকে নামায পড়া অবস্থায়ই টেনে হিচড়ে আনা হলো। অতপর ঐ পাষণ্ড তাকে বললো যে, "তোর জীবিকাদাতা তো আবদুল গফুর এবং সে এখানেই বসে আছে। তুই আবার কার নামায পড়ছিলি ?" আবদুর রহীম নামে তার এক ছেলে ছিল। মুহাম্মদ শাহ তাকে ছয় হাজারী পদবীতে ভূষিত করেছিলেন। সে এত দাম্ভিক ও দুশ্চরিত্র ছিল যে, কারো প্রাণ ও সম্ভ্রম তার হাতে নিরাপদ ছিল না। লম্পট

বদমায়েশদের একটা সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল সবসময় তার সাথে থাকতো। কখনো সে মেয়েলী পোশাক ও গহনা পরে রাস্তায় বেরুতো, কখনো সামরিক পোশক পরে পুরোদস্তর সৈনিক সেজে যুদ্ধের পাঁয়তারা করতো, আবার কখনো পায়ে ঘাঘর বেঁধে প্রকাশ্য বাজারে এসে নাঁচতো। এই সকল অবস্থায় তার বদমায়েশ সাথীরা পথিকদের গতিরোধ করে দাঁড়াতো। কেউ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলে তাকে তারা হত্যা করতো। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের তার মহল্লা দিয়ে চলাচল করা কঠিন ছিল। যে মেয়ে তার পছন্দ হয়ে যেত, সে তার হাত থেকে নিজের সতিত্ব বাঁচাতে পারতো না। এহেন ব্যক্তি ছিল মুহাম্মদ শাহের ছয় হাজারী পদবীতে ভূষিত। অথচ এক সময় মন্ত্রীরা, নামকরা সেনাপতিরা এবং বড় বড় রাজ্যের শাসকরা এই পদবীর জন্য লালায়িত থাকতো।

এরপর উল্লেখ করতে হয় জাফর রওশনোদ্দৌলার কথা। এ ব্যক্তি মুহাম্মদ শাহের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও মুখপাত্র ছিল। কোন ধরনের শিক্ষাগত, প্রশাসনিক কিংবা সামরিক যোগ্যতা তার ছিল না। কেবল মোসাহেবী, স্তবকতা ও বাগাড়ম্বর দিয়েই সে সম্রাটের মন জয় করে ফেলেছিল এবং কোকী জিওর সাথেও তার গভীর গাঁটছড়া ছিল। এই দহরমমহরম দ্বারা তার যথেষ্ট আয় রোজগার হতো এবং সে এই অর্থসম্পদ আলোক সজ্জা, দালান কোঠা ও মসজিদ নির্মাণ এবং দান খয়রাতে মুক্ত হস্তে ব্যয় করতো। এতে জনসাধারণের মধ্যেও তার বেশ সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

এসব লোক ছাড়াও বুরহানুল মুল্‌ক, সাদত খান, সামসামুদ্দৌলা খানে দাওরান এবং হায়দার কুলি খানও সম্রাটের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। পাঠক এদের স্বভাব চরিত্রের পরিচয় ইতিপূর্বেই পেয়েছেন।[১] এরা সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের জন্য নিযামুল মুল্‌কের অস্তিত্বকে ক্ষতিকর মনে করতো। এদের মধ্যে হায়দার কুলি খান সাম্রাজ্যের আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে সবচেয়ে বেশী নাক গলাতো এবং নিজেকে মন্ত্রীর চেয়ে কম ভাবতো না। নিযামুল মুল্‌ক অতি কষ্টে হায়দার কুলি খানকে গুজরাটে পাঠিয়ে দিতে সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে রাজী করান। কেননা ইতিপূর্বেই তাকে গুজরাটের সুবেদার নিযুক্ত করা হয়েছিল।

---

১. ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিযামুল মুলক যখন প্রথম দফা দাক্ষিণাত্যের সুবেদারীতে নিয়োজিত ছিলেন, তখন মীর জুমলার সুপারিশক্রমে হায়দার কুলি খান সেখানকার অর্থসচিব নিযুক্ত হয়। সেখানে সে লোকজনের ওপর নানারকম অত্যাচার চালায়। নিযামুল মুল্‌কের কাছে এ সম্পর্কে ক্রমাগত অভিযোগ আসতে থাকে। তিনি তাকে কঠোরভাবে ধমকে দেন এবং হুশিয়ার করে দেন যে, নিজের আচরণ সংশোধন না করে সে যেন তার সামনে আর সালাম দিতে না আসে। অবশেষে সে ভগ্নহৃদয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে চলে যায়। তখন থেকেই তার ও নিযামুল মুল্‌কের মধ্যে মন কষাকষি চলে আসছিল।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই অনুমান করা যায় যে, মুহাম্মদ শাহের চার পাশে কি ধরনের লোকেরা সমবেত হয়েছিল এবং কি কারণে তারা নিযামুল মুল্‌কের বিরোধিতা করতো। নিযামুল মুল্‌ক সম্রাটকে এসব লোকের খপ্পর থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেন। আর ঐ লোকগুলো নিযামুল মুল্‌ককে উৎখাত করার জন্য সম্রাটকে প্ররোচিত করে। শেষ পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের শুভাকাংখী নিযামুল মুল্‌কের অভিলাস ব্যর্থ হয় আর সাম্রাজ্যের দুশমনদের চেষ্টা সফল হয়।

নিযামুল মুল্‌কের সংস্কার প্রস্তাব

মোগল সাম্রাজ্যের অবনতিশীল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য নিযামুল মুল্‌ক সম্রাটের নিকট সর্বপ্রথম নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ পেশ করেন ঃ

(১) দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহের কেনাবেচা এবং কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নিয়োগের জন্য উপঢৌকন বা নজরানার আকারে যে ঘুষ নেয়া হয় তা বন্ধ করা হোক।

(২) খাস জমীর মধ্যে যেগুলো উর্বরা, তা রাজপুত্র, রাজ কন্যা কিংবা আমীরদের মধ্যে বিতরণের প্রথা রহিত করা হোক। কেননা এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যের আয়ের মূল উৎসগুলো ব্যক্তি মালিকানায় চলে যায় এবং সাম্রাজ্যের জরুরী ব্যয় নির্বাহ ও কর্মচারীদের বেতন প্রদানের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, তা সরকারী কোষাগারে সংগৃহীত হয় না। কর্মচারীদের বেতন মাসের পর মাস বাকী থাকে এবং তজ্জনিত অসুবিধা মোকাবিলার জন্য তারা ঘুষ নেয় ও প্রজাদের শোষণ করে।

(৩) অযোগ্য লোকদেরকে উচ্চতর পদ দান এবং যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকদেরকে তা থেকে বঞ্চিত রাখার ধারা রহিত করা হোক। এতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও কাজ জানা লোকেরা বেকার হয়ে গেছে এবং অকর্মন্য লোকদের হাতে পড়ে সাম্রাজ্যের অবনিত হচ্ছে।

(৪) আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনায় যে বিশৃংখলা চলছে তা দূর করা দরকার। এর দরুন পণ্য মূল্য বেড়ে গেছে এবং প্রজারা দুর্গতির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিদিন মন্ত্রণালয়ের সামনে "ফরিয়াদ ফরিয়াদ" আওয়াজ তুলে দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরা সমবেত হয়। এসব অভিযোগকারীদের মধ্যে পুরাতন খ্যাতনামা আমীরদের সন্তানরাও থাকে। তাদের কেউ হাক ছাড়ে যে, "আমি মাহাবাত খানের বংশধর" কেউ বলে "আমি আলী মারদান খানের পৌত্র।"

এই সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে মুহাম্মদ শাহের অনুচর ও পারিষদবর্গের স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকায় তারা এর ঘোরতর বিরোধিতা করলো এবং সম্রাটকে এর একটিতেও সম্মতি দিতে দিল না। রাজ দরবারে এগুলোর পক্ষে বিপক্ষে দ্বন্দ্ব কলহ ও বিতর্ক চলাকালেই গুজরাট থেকে হায়দার কুলি খানের বিদ্রোহের খবর আসে এবং নিযামুল মুল্‌ককে তা দমনের জন্য আহমদাবাদ যেতে হয়।

মালোহ ও গুজরাটের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিযামুল মুলক বহু কষ্টে হায়দার কুলি খানকে রাজধানী থেকে বের করিয়ে গুজরাটে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। গুজরাট গিয়েই এই স্বেচ্ছাচারী লোকটি জুলুম নিযার্তনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করতে শুরু করে দেয় এবং আমীর ওমরা ও মোগল কর্মকর্তাদের ভূসম্পত্তি দখল করে নেয়। সুরাটের সবচেয়ে ব্যবসায়ীদের ওপর সে নিপীড়ন চালায় ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। সেখানকার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত প্রখ্যাত বোহরা গোত্রীয় সওদাগর আবদুল গফুরের সম্পদ লুণ্ঠন করে। এসব অবৈধ পন্থায় বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে সে আরব, ফিরিংগী ও হাবসীদের এক বাহিনী গঠন করে প্রকাশ্যে এমন তৎপরতা চালাতে থাকে যা বিদ্রোহের পর্যায়ে পড়ে। নিযামুল মুল্‌ক সম্রাটকে অনেক বুঝানো সত্ত্বেও তিনি স্বীয় প্রিয় সুবেদারকে শাস্তি দিতে রাজী হননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জানা গেল যে, হায়দর কুলি খান স্বীয় প্রদেশে এমন ক্ষমতাও প্রয়োগ করা শুরু করেছে; যা সম্রাটের একচ্ছত্র ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত, তখন তিনি নিযামুল মুল্‌ককে গুজরাট গিয়ে তার ঔদ্ধত্য চূর্ণ করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হলেন। ১১৩৫ হিজরী সফর মাস মোতাবেক ১৭২২ খৃঃ নভেম্বর মাসে গুজরাট ও তদসংলগ্ন মালোহের সুবেদারী নিযামুল মুল্‌কের হাতে অর্পণ করা হলো এবং তাকে আহমদাবাদ অভিমুখে পাঠানো হলো। গুজরাটের সীমান্তবর্তী ঝাবোয়া নামক স্থানে পৌঁছতেই হায়দার কুলি খান তাকে প্রতিরোধের জন্য গুজরাটের আমীরদের সাহায্য চাইলো। কিন্তু তারা নয়া সুবেদার এবং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পদচ্যুত ও ধিকৃত সুবেদারের পক্ষ নিতে অস্বীকার করলো। হায়দার কুলির সহকর্মীদের অধিকাংশই তুরানী ছিল। তারা নিযামুল মুল্‌ককে নিজেদের নেতা হিসেবে মান্য করতো এবং তাঁর বিপক্ষে হায়দার কুলিকে সমর্থন করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। হায়দার কুলি খান নিযামুল মুলকের সামনে নিজেকে এতটা অসহায় দেখে উন্মাদ হয়ে গেল। তার সাথীরা তাকে নিয়ে উদয়পুরের ভেতর দিয়ে দিল্লী পালিয়ে গেল। নিযামুল মুল্‌ক নির্বিঘ্নে গুজরাটে প্রবেশ করলেন, সেখানকার বিশৃংখলা ও অরাজকতার অবসান ঘটালেন। ধুল্‌কা, ভাপবোর, জাম্বেসির, মকবুলাবাদ ও বুলসার পরগণাকে নিজের ব্যক্তিগত জাইগীরের অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং স্বীয় চাচা মুইজ্জুদ্দৌলা হামেদ খান বাহাদুর সালাবাত জংকে[১] নিজের স্থলাভিষিক্ত করে

---

১. ইনি গাজীউদ্দীন খান বাহাদুর ফিরোজ জং-এর ছোট ভাই। আলমগীরের আমলে খেতাব ও পদবী লাভ করেন। আলমগীরের পর যুবরাজ আযমের দলে যোগদান করে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অতপর আযমের পরাজয়ের পর বাহাদুর শাহের অধীন চাকুরী ও বিজাপুরের সুবেদারী গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তাকে আবার দিল্লীতে ডেকে নেয়া হয়। মুহাম্মদ আমীন খানের সাথে তার সম্পর্ক ভালো না থাকায় হাসানপুরের যুদ্ধে সৈয়দ আবদুল্লাহ খানের পক্ষ অবলম্বন করেন। তবে পরে নিযামুল মুল্‌কের খাতিরে তাকে ক্ষমা করা হয় এবং মুইজ্জুদ্দৌলা সালাবাত জং খেতাব সহকারে গুজরাটের অস্থায়ী সুবেদার নিযুক্ত হন। বিশিষ্ট স্বভাব প্রকৃতির কারণে তিনি "বুনো যুবরাজ" নামে খ্যাত ছিলেন।

মালোহে ফিরে গেলেন। মালোহতে তার পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বি ভূপালের শাসক দোস্ত মুহাম্মদ খানকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। অতপর স্বীয় ফুফাতো ভাই আজীমুল্লাহ খানকে ভারপ্রাপ্ত সুবেদার নিযুক্ত করে ১১৩৫ হিজরীর শাওয়াল মোতাবেক ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

নিযামুল মুল্কের বিরুদ্ধে চক্রান্ত

নিযামুল মুল্কের এই আট নয় মাসের অনুপস্থিতির সুযোগে শাহী দরবারের লোকেরা নিযামুল মুল্কের জন্য আগের চেয়েও বেশী সমস্যার সৃষ্টি করে রাখে। তিনি রাজধানীতে ফিরে এসে দেখতে পান যে, প্রত্যেকেই প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসে আছে। কিন্তু আসলে প্রধানমন্ত্রী কেউ নয়। তখন সম্রাটের পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এমনকি প্রাসাদ ভৃত্যদের পর্যন্ত পরামর্শ শোনা হতো এবং বড় বড় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও নাক গলানোর সুযোগ দেয়া হতো। অথচ সাম্রাজ্যের প্রশাসনের প্রকৃত দায়িত্বশীল যে প্রধানমন্ত্রী, তার পরামর্শ উপেক্ষা করা হতো। হেরেম থেকে নিয়ে দেওয়ানে আ'ম (দরবার হল) পর্যন্ত যত লোক সম্রাটের আশপাশে ছিল, সবাই মিলে ষড়যন্ত্র এঁটে রেখেছিল, যাতে নিযামুল মুল্কের কোন কর্তৃত্ব না খাটে। সামসামুদ্দৌলা খানে দাওরান ছিল এই ষড়যন্ত্রের হোতা। এই ব্যক্তি দরবারে মোগলদের বিরুদ্ধে একটা ভারতীয় দল গঠন করে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলমান এবং হিন্দু রাজাদের সাথে যোগসাজশ করে সে এই ধুয়া তোলে যে, মোগল (অর্থাৎ ইরান, তুর্কিস্তান কিংবা মধ্য এশিয়া থেকে আগত লোক) মাত্রেই বিদেশী, চাই সে শত শত বছর ধরে বংশানুক্রমে এখানে বসবাস করুক না কেন। তাই আমাদের দেশের শাসন কার্যে তাদের কোন ভূমিকা থাকা চলবে না। সবার শেষে তারা গোপন দুরভিসন্ধির মাধ্যমে সম্রাট ও নিযামুল মুল্কের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। নিযামুল মুল্কের কাছে এসে তারা বলতো যে, মুহাম্মদ শাহ একেবারেই অযোগ্য লোক। তাকে অপসারণ করে মুহাম্মদ ইবরাহীমকে সিংহাসনে বসানো উচিত। অপর দিকে মুহাম্মদ শাহকে গিয়ে ফুসলাতো যে, নিযামুল মুল্ক আপনাকে হটিয়ে মুহাম্মদ ইবরাহীমকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার ষড়যন্ত্র করছেন, যাতে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মত নেপথ্যে থেকে নিজেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন। তারা মুহাম্মদ শাহকে বলতো যে, এই ধুরন্ধর বৃদ্ধ ধীরে ধীরে সমগ্র দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। দাক্ষিণাত্যের সুবিশাল প্রদেশটি অতীতে একাধিক রাজবংশ কর্তৃক শাসিত হয়েছে। সেই গৌরবোজ্জল প্রদেশটিকে আপনার প্রদত্ত কর্তৃত্ব ছাড়াই সে গায়ের জোরে সৈয়দদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুক্ষিগত করেছে। গুজরাট ও মালোহের মত বড় বড় দু'টি প্রদেশও সে সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে হস্তগত করেছে। এরপর সাম্রাজ্যের বাদবাকী অংশেও সে মন্ত্রীত্বের সুবাদে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব কথাবার্তায় সম্রাটের মনে নিযামুল

মুল্‌কের প্রতি মারাত্মক খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে উভয়ের সম্পর্ক এতটা খারাপ হয়ে গেল যে, নিযামুল মুল্‌ক নিজের প্রাণের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি দরবারে আসা যাওয়াই বন্ধ করে দিলেন এবং পদত্যাগ করলেন। অতপর দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সম্রাটের সভাসদবর্গ তার ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল এবং প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করার সাহস করতো না, তারা সম্রাট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আপোষ রফা করে দিল এবং সম্রাটের অনুরোধে তিনি পুনরায় দরবারে যাতায়াত করা শুরু করলেন।

সাম্রাজ্যের হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি

যে সময়ের কথা আমি বলছি, এটি ছিল মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ সময়। প্রশাসনিক ব্যবস্থা চরম বিশৃংখলার শিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক—এক কথায় সরকারের প্রতিটি বিভাগ সর্বাত্মক অব্যবস্থা ও অরাজকতার মধ্যে নিপতিত ছিল। নিম্ন থেকে উচ্চস্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী দায়িত্বানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে প্রজাদের আলাদা আলাদা দল উপদল গড়ে উঠেছিল এবং প্রতিটি দল উপদলের সার্বক্ষণিক চিন্তা-ভাবনার একমাত্র বিষয় ছিল নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং অন্য উপদলের ক্ষতি সাধন। প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু চিন্তাভাবনা করতো, কেবল নির্দিষ্ট দলের সদস্য হিসেবেই করতো। সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতির সদস্য হিসেবে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতা কারোর ছিল না। এসব দল উপদলের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে যোগসাজশ, ষড়যন্ত্র ও একে অপরকে হেয়প্রতিপন্ন করার এক অফুরন্ত প্রতিযোগিতার ধারা চালু ছিল। দেশ ও সাম্রাজ্যের সামগ্রিক লাভ ক্ষতির কথা কারোর বিবেচনায়ই আসতো না। এসব দল উপদলের মধ্যে আমীর ওমরাহদের ব্যক্তিগত দল তো ছিলই। তদুপরি বংশীয়, ভৌগলিক ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতার ভিত্তিতেও বিভিন্ন দল উপদলের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের দলের অস্তিত্ব দেশে আগেও ছিল বটে। কিন্তু প্রচলিত রীতি এই যে, কোন জাতির যখন পতন ঘনিয়ে আসে, তখন এমন ধরনের সংকীর্ণতা ও কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যা জাতিকে ঐক্য ও সংহতির পরিবর্তে বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। ইরানী, তুরানী, তুর্কী, মোগল, আফগান ও ভারতীয় জাতিগোষ্ঠী আগেও ছিল। কিন্তু আগে এসব জাতিগোষ্ঠী একই জাতীয় স্রোতে প্রবাহিত হতো এবং একই সাম্রাজ্যের পতাকা তলে সমবেত হয়ে সমগ্র দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকতো। কিন্তু এখন সেই সব জাতিগোষ্ঠী একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে। সবচেয়ে মারাত্মক বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় দেশী বিদেশী বিভেদের কারণে। এর ফলে তাদের মধ্যে এমন শত্রুতা জন্মে যে, তাদের পক্ষে মিলে মিশে কাজ করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বেও এসব জাতিসত্তার মধ্যে এক ধরনের আভিজাত্যবোধ বিদ্যমান ছিল এবং তা

তাদেরকে দেশ ও জাতির সেবায় পাল্লা দিয়ে একে অপরের চেয়ে বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন ও অধিকতর উন্নত পদ ও মর্যাদা লাভে প্রেরণা যোগাতো। কিন্তু এখন এই আভিজাত্যবোধ পারস্পরিক বিদ্বেষের রূপ পরিগ্রহ করে এবং এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে হেয়প্রতিপন্ন করার কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। এ কাজ করতে যেয়ে প্রয়োজনে দেশ ও সাম্রাজ্যের স্বার্থ পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে নস্যাৎ করতে কেউ কুণ্ঠাবোধ করতো না। শাহী দরবার থেকে শুরু করে নগণ্য কেরানীর দফতরে পর্যন্ত এই কলহ কোন্দলের বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি মানুষ নিজের সরকারী দায়িত্ব পালনের চেয়ে এই দলাদলি ও কোন্দলের রাজনীতিতে অধিকতর উৎসাহী হয়ে ওঠে। নিযামুল মুল্‌ক একদিকে এই পরিস্থিতি অন্য দিকে সম্রাটের চালচলন ও হাবভাব দেখে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে গেলেন। তিনি খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করলেন যে, যে সাম্রাজ্য অবক্ষয়, অধোপতন, অরাজকতা ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের এত নিম্নস্তরে নেমে এসেছে, তাকে পৃথিবীর কোন শক্তি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। একে রক্ষা করার চেষ্টা করা শুধু পণ্ডশ্রমই নয়, বরং প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করার শামিল।

নিযামুল মুল্‌ক আবার দাক্ষিণাত্যে

উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর তার পক্ষে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাওয়া এবং মারাঠা আধিপত্যের করালগ্রাসে দ্রুত পতনোন্মুখ প্রদেশটিকে সামাল দেয়া ছাড়া গত্যান্তর রইল না। কিন্তু এই ইচ্ছা ব্যক্ত করে প্রকাশ্যে দাক্ষিণাত্যে যাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। তিনি রুগ্ন স্বাস্থ্য ও আবহাওয়ার অসংগতির বাহানা করে রবিউল আউয়াল, ১১৩৬ হিজরী মোতাবেক ডিসেম্বর ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে সম্ভল (মুরাদাবাদ) অভিমুখে স্বীয় জাইগীরে যাওয়ার অনুমতি সংগ্রহ করলেন। অতপর স্বীয় পুত্র গাজীউদ্দীনকে ভারপ্রাপ্ত উজীর হিসেবে রাজধানীতে রেখে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি সবে যমুনা পার হয়ে শাহদারায় পৌছেছেন, এমন সময় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান রাজা গজর মল্ল এবং অপর একজন প্রভাবশালী সভাসদ খাজা মোনেম সম্রাটকে সাবধান করে দিলেন যে, নিযামুল মুল্‌কের মত একজন বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অসন্তুষ্ট হয়ে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরিণাম শুভ হবে না। তারা সম্রাটের কাছে নিযামুল মুল্‌কের পক্ষ থেকে একটি দাবীনামা পেশ করলেন, যা মেনে নিলে তিনি পুনরায় ওজারতির দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হতে পারেন। এই দাবীসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান দাবী ছিল এই যে, ইজারার ভিত্তিতে রাজস্ব আদায়ের যে রীতি রতন চাঁদ বাক্কাল প্রবর্তন করেছিল, তা রহিত করতে হবে। কিন্তু গজর মল্ল এই দাবীনামা পড়ার সময় সহসা মাথা ঘুরে অচেতন হয়ে পড়ে গেল এবং তাকে তার বাসগৃহে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। নিযামুল মুল্‌ক শাহদারায় বসে এ খবর শুনে আপোষ মীমাংসার সব আশা পরিত্যাগ করলেন

এবং সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথিমধ্যে সামসামুদ্দৌলা খানে দাওরান, ইতিমাদুদ্দৌলা কামরুদ্দীন এবং রওশনোদ্দৌলা জাফর খানের লিখিত একাধিক পত্র পেলেন। এসব পত্রে লেখা হয়েছিল যে, আপনি যদি মনোক্ষুণ্ন হয়ে থাকেন তবে সম্রাট আপনার মনোকষ্ট নিরসনের জন্য স্বীয় মাতাকে আপনার নিকট পাঠাতে প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু নিযামুল মুল্‌ক এসব প্রবঞ্চনামূলক কথাবার্তার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে স্বীয় গন্তব্য অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। মুরাদাবাদ ঘুরে তিনি আগ্রায় গমন করলেন। সেখান থেকে তিনি সম্রাটকে চিঠি মারফত জানালেন যে, মালোহ্ ও গুজরাটে মারাঠা লুটেরাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই দু'টো এলাকা আমার শাসনাধীন। তাই আমি মালোহ্ যাচ্ছি। অতপর তিনি আগ্রা থেকে উজ্জয়িনী এবং সেখান থেকে সেহোর (ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত) গিয়ে সরাসরি দাক্ষিণাত্যের পথ ধরলেন, সেহোর গিয়েই সর্বপ্রথম তাঁর সফর সঙ্গীরা বুঝতে পারলো যে, তিনি মালোহ্ নয়—দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছেন।

নিযামের বিরুদ্ধে মুবারেজ খানকে প্ররোচনা

নিযামুল মুল্‌কের বর্ণচোরা শত্রুরা তাঁর দিল্লী ত্যাগের পূর্বেই পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। তারা তাঁর এই পরিকল্পনা নস্যাত করার সবচেয়ে উত্তম উপায় এই উদ্ভাবন করলো যে, তাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী থেকে অপসারিত করে অন্য কোন প্রতাপশালী ব্যক্তিকে গোপনে সুবেদার নিয়োগ করা হোক। তারা ভেবেছিল যে, এ কাজটি করা হলে নিযামুল মুলকের জন্য মাত্র দু'টো বিকল্প অবশিষ্ট থাকবে। হয় তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়ে নতুন সুবেদারের সাথে লড়াই করবেন আর সে ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়ই পরাজিত হবেন। কেননা দাক্ষিণাত্যের কোন সেনাপতি ক্ষমতাসীন সুবেদারের বিরুদ্ধে পদচ্যুত সুবেদারের পক্ষ নেবে না। নচেত তিনি পুনরায় রাজধানীতে ফিরে আসবেন। সে ক্ষেত্রে তাকে একজন ক্ষমতাহীন ও ঠাঁই ঠিকানাহীন ব্যক্তির মত গণবিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে হবে। এখন এই অব্যর্থ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যের নতুন সুবেদার নিয়োগ করা যায় এমন একজন উপযুক্ত লোকের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিল। দরবারে এনায়েতুল্লাহ্ খান কাশ্মীরী উপস্থিত ছিলেন। খান সামান (প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়ক) পদে কর্মরত এই ব্যক্তি নিযামুল মুল্‌কের আগমনের পূর্বে ভারপ্রাপ্ত উজীর হিসেবে বহাল ছিলেন। তিনি স্বীয় জামাতা ইমাদুল মুল্‌ক মুবারেজ খানের নাম প্রস্তাব করলেন, যিনি ১২ বছর ব্যাপী হায়দারাবাদের সুবেদার ছিলেন এবং মোগলদের কাছে একজন নামকরা সেনাপতি বলে বিবেচিত হতেন। সামসামুদ্দৌলার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল মুবারেজ খান সংক্রান্ত প্রস্তাব দু'টি কারণে মেনে নিল। প্রথমত, তার বীরত্ব ও সাহসিকতায় তারা আশান্বিত ছিল যে, নিযামুল মুল্‌ককে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, তিনিও একজন মোগল ছিলেন। তাই এক মোগলকে

আরেক মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করা এবং একজনের হাত দিয়ে আরেকজনকে খতম করানো ভারতীয় গোষ্ঠীর কাছে অত্যন্ত শুভ কাজ বিবেচিত হয়েছিল। এ জন্য সম্রাটের কাছ থেকে মুবারেজ খানের নামে সুবেদারীর ফরমান আদায় করে গোপনে তাকে হায়দারাবাদ পাঠানো হলো। এ ছাড়া কার্নোলের সেনাপতি বাহাদুর খান[১] কাড়াপ্পার সেনাপতি আবদুন্নবী খান, সাদানুরের সেনাপতি আবদুল গাফফার, কর্ণাটকের সেনাপতি সাদাত খান, রাজা চন্দ্র সেন, রাও রম্ভা, রাজা সাহু, আজদুদ্দৌলা আওজ খান এবং আমীন খান দাক্ষিণাকেও গোপনে নির্দেশ দেয়া হলো যে, তারা যেন নিযামুল মুল্‌কের মোকাবিলায় মুবারেজ খানের সহযোগিতা করে। এর কয়েকদিন পর নিযামুল মুল্‌কের পুত্র গাজীউদ্দীন খানকে ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, যাতে এসব গোপন কার্যকলাপ তিনি জানতে না পারেন।

মুবারেজ খান মূলত বলখের অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকালেই ভারতে আসেন এবং শুরুতে ছোটখাট চাকুরী করতেন। পরে এনায়াতুল্লাহ খান কাশ্মীরীর মেয়ের সাথে বিয়ে হওয়ার পর তার ভাগ্য পাল্টে যায় এবং শ্বশুরের মধ্যস্থতায় উচ্চতর পদে উন্নীত হন। আলমগীরের আমলে আমানত খান খেতাব ও সাংমীজের সেনাপতি পদে নিয়োগ লাভ করেন। পরে সেই সাথে বিজাপুরের সেনাপতিত্বও যুক্ত হয়। বাহাদুর শাহের প্রধানমন্ত্রী মোনেম খান তার যোগ্যতার উচ্ছসিত প্রশংসা করতেন। তিনি গাজীউদ্দীন খান ফিরোজ জং-এর ইন্তিকালের পর তাকে গুজরাটের সুবেদার নিযুক্ত করেন। জাহাদার শাহের আমলে তাকে মালোহের সুবেদার করে বদলী করা হয় এবং শাহামাত খান খেতাব দেয়া হয়। ফররুখ শিয়ারের শাসনামলের শুরুতে তাকে মুবারেজ খান খেতাব দিয়ে মালোহ থেকে গুজরাট অতপর গুজরাট থেকে হায়দারাবাদের সুবেদার করে পাঠানো হয়। ১২ বছর পর্যন্ত দোর্দন্ড প্রতাপেও কৃতিত্বের সাথে এ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তার সাহসিকতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, ন্যায়বিচার এবং শাসকসুলভ দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তারা জানিয়েছেন যে, তিনি হায়দারাবাদ প্রদেশের শাসনকার্য পূর্ণ দৃঢ়তা ও সাফল্যের সাথে চালিয়েছিলেন। সমগ্র প্রদেশে তার নির্দেশ মান্য করা হতো, দুষ্ট ও অপরাধী লোকেরা তার সামনে মাথা তুলতে সাহস পেত না। মারাঠারা তার শাসনাধীন এলাকা থেকে এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ রাজস্ব আদায় করতে পারতো না। তিনি দেখতে এমন সুদর্শন পুরুষ ছিলেন, এত রাশভারী ও ভীতিপ্রদ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং এত উচ্চাংগের যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন যে, তার দ্বারা সকলে অভিভূত ও প্রভাবিত হয়ে যেত। হোসেন আলী

---

১. এর আসল নাম ইবরাহীম খান পন্নী। ইনি জুলফিকার খানের অধীন দাক্ষিণাত্যের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সুবেদার দাউদ খান পন্নীর ভাই।

খান স্বীয় সুবেদারীর আমলে সকল পুরনো কর্মকর্তাদেরকে অপসারিত করে নিজস্ব লোকদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মুবারেজ খানকে স্বপদে বহাল রেখেছিলেন। অতপর যখন নিযামুল মুল্‌ক আলম আলী খানকে যুদ্ধে পরাজিত করে আওরংগাবাদ আসেন, তখন মুবারেজ খান তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এলে নিযামুল মুল্‌ক তাঁকে সাত হাজারী পদবী এবং ইমাদুল মুল্‌ক হাজবর জং খেতাব আনিয়ে দেন। কিন্তু এরপর যখন নিযামুল মুল্‌ক কর্ণাটকের আফগান শাসকদেরকে (অর্থাৎ কাড়াপ্পা, কার্নোল ও সাদানুরের শাসকদেরকে) বশ্যতা স্বীকার করাতে ও তাদের কাছ থেকে বশ্যতাসূচক কর আদায় করতে আদুনী গমন করেন, তখন মুবারেজ খান তাকে বশ্যতাসূচক কর আদায়ে কোন সহযোগিতা করেননি। জানা যায় যে, মুবারেজ খান ও আফগান শাসকরা পরস্পরে গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছে। তা ছাড়া এ তথ্যও উদঘাটিত হয় যে, মুবারেজ খান সিকাকোল অঞ্চলে কতিপয় সরকারী খাস মহলকে ব্যক্তিগত জাইগীরে পরিণত করে ভোগ দখল করছেন। নিযামুল মুল্‌ক দৃশ্যত এসব ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। কিন্তু মনে মনে উপলব্ধি করেন যে, যত যোগ্য সুবেদারই হোক, কাউকে একই প্রদেশে দীর্ঘদিন রাখা ঠিক নয়। এ জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে দিল্লী যাওয়ার পর মুবারেজ খানের প্রতিনিধির কাছ থেকে ব্যক্তিগত জাইগীর হিসেবে ব্যবহৃত ঐসব খাস মহলের আয়ের হিসেব চান। অতপর সম্রাটকে পরামর্শ দেন যে, মুবারেজ খানকে হায়দারাবাদ থেকে কাবুল প্রদেশে বদলী করা হোক। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ কাজটি যখন করা হয়, তখন এমন এক যুগ সমাগত, যে যুগে দেশের ও সাম্রাজ্যের স্বার্থ মানুষের চোখে কোন গুরুত্বই রাখতো না। প্রত্যেক ব্যাপারে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অভিলাস অগ্রগণ্য বিবেচিত হতো। মুবারেজ খানের শ্বশুর এনায়াতুল্লাহ খান কাশ্মীরী নিযামুল মুল্‌কের এই পরামর্শকে ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল বলে মনে করলেন এবং এই পরামর্শ বাতিল করিয়ে ভারতীয় গোষ্ঠীর যোগসাজশে মুবারেজ খানের জন্য সমগ্র দাক্ষিণাত্যের সুবেদারীর ফরমান আদায় করিয়ে ছাড়লেন।

কারো কারো মতে নিযামুল মুল্‌ক দিল্লীতে থাকতেই মুবারেজ খানের সুবেদার নিযুক্তির বিষয় জেনে ফেলেছিলেন এবং এ কারণেই তিনি দাক্ষিণাত্য গমনের সিদ্ধান্ত নেন। অন্যদের মতে তিনি এ তথ্য পথিমধ্যে জানতে পেরেছিলেন। বিষয়টা তিনি যেখানেই জানুন, একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, মুবারেজ খানের নিয়োগের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয় এবং নিযামুল মুল্‌ককে আনুষ্ঠানিকভাবে মোটেই জানানো হয়নি যে, তাকে দাক্ষিণাত্য থেকে পদচ্যুত করা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, এ সময় দাক্ষিণাত্যের দু'জন সুবেদার ছিলেন। একজন গোপনে এবং একজন প্রকাশ্যে। উভয়ে নিজেকে প্রদেশের বৈধ শাসক মনে করতেন। নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধের মাধ্যমে সুবেদারী থেকে উৎখাত করার আইনসঙ্গত অধিকার উভয়েরই ছিল এবং এ

জন্য দু'জনের কাউকেই সম্রাটের নির্দেশ অমান্য করার দায়ে অভিযুক্ত করা যায় না। সাম্রাজ্যের সীমানার অভ্যন্তরেই সাম্রাজ্যের দু'জন সুযোগ্য ও প্রখ্যাত কর্মকর্তা যে পরস্পরে এভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এটি ছিল সাম্রাজ্যের দু' মুখো নীতির ফল। প্রকৃতপক্ষে উভয়েই সাম্রাজ্যের অনুগত ছিলেন এবং সেই সাম্রাজ্য নিজেই এই দুই ব্যক্তিকে যুদ্ধে লিপ্ত করেছিল।

নিযামুল মুল্‌ক পুনরায় দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিযুক্ত

মুবারেজ খান যখন শাহী ফরমান লাভ করেন, তখন তিনি মৎস্য বন্দরের নিকটবর্তী ফুলছড়িতে আপা রাও নামক জনৈক জমীদারের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। বৃহত্তর যুদ্ধের খাতিরে এই যুদ্ধকে পরবর্তী কোন উপযুক্ত সময়ের জন্য মুলতবী রাখাই হতো মুবারেজ খানের পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কেননা তখন আওরংগাবাদ ছিল অরক্ষিত এবং নিযামুল মুল্‌কের স্থলাভিষিক্ত আওজ খানের কাছে বড় জোর দু' হাজার সৈন্য ছিল। কিন্তু মুবারেজ খান আপা রাও-এর সাথে যুদ্ধে কয়েক মাস নষ্ট করে দিলেন। বর্ষাকাল যখন শুরু হয়ে গেছে, তখন তিনি হায়দারাবাদ ফিরলেন। তখন বহু এলাকার সেনাধ্যক্ষ নিজ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে যথারীতি সেনানিবাসে ফিরে গেছে। এ পরিস্থিতিতে তাঁর উচিত ছিল যুদ্ধ মুলতবী রাখা। কিন্তু এবার তিনি তাড়াহুড়ো করে ভরা বর্ষার মওসুমে হায়দারাবাদ থেকে আওরংগাবাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। কার্নোলের সেনাপতি বাহাদুর খান পন্নী, আবুল ফাতাহ খান (কাড়াপ্পার সেনাপতি আবদুল খানের পুত্র), আবদুল মজীদ খান মিয়ানা (সাদানুরের সেনাপতি আবদুন্নবী গাফফার খানের পুত্র), গালেব খান (আবু তালেব বাদাখশীর পুত্র এবং অরকটের সেনাপতি সাদাত খানের প্রতিনিধি) এবং রাচোরের সেনাপতি দেলোয়ার খান তার অভিযাত্রী ছিল। সামগ্রিকভাবে তার সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার অশ্বারোহী এবং ৩০/৪০ হাজার পদাতিক। কিন্তু তিনি সবেমাত্র যখন নান্দেতরের নিকটে গোদাবরী নদী পার হয়ে বাসেম অঞ্চলে প্রবেশ করছেন, তখনই (রমজান, ১১৩৬ হিজরী) নিযামুল মুল্‌ক আওরংগাবাদ পৌঁছে গেলেন এবং এ ঘটনা গোটা রাজনৈতিক দৃশপটই পাল্টে দিল। দাক্ষিণাত্যে নিযামুল মুল্‌কের যে প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ শাহের মোটেই আশা ছিল না যে, নিযামুল মুল্‌ক আওরংগাবাদ পৌঁছে গেলে এবং সেখানে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের যথেষ্ট সময় পেলে মুবারেজ খান তার মোকাবিলায় জয় লাভ করতে পারবে। তাই সম্রাট তার খেলায় হেরে যাওয়া অনিবার্য দেখে কৌশল পাল্টালেন। তিনি নিযামুল মুল্‌ককে লিখলেন। "তুমি দাক্ষিণাত্য প্রদেশ রাজস্বের স্বল্পতায় দরিদ্র হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছিলে। সে জন্যই মুবারেজ খানকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারীতে নিযুক্ত করেছিলাম। নচেত তুমি যে সেখানে থাকতে এত উৎসুক তা আগে জানলে আমি অন্য কাউকে সেখানে

নিয়োগ করতাম না। অনুরূপভাবে তোমার পুত্র গাজীউদ্দীন খানকে ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে সরানোর কারণ এই যে, তোমার আওরংগাবাদ চলে যাওয়ার কারণে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল এবং স্বীয় পদের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল। এ জন্য ইতিমাদুদ্দৌলা কামরুদ্দীন খানকে তার স্থলে ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ কখনো এটা নয় যে, তোমাকে তোমার পদসমূহ থেকে অপসারিত কিংবা শাহী অনুগ্রহ ও সুদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মন্ত্রীত্ব ও সুবেদারী উভয় পদে তুমি যথারীতি বহাল আছ। যত দিন চাও দাক্ষিণাত্যে থাকো আবার যখন ইচ্ছা দরবারে চলে এসো। মুবারেজ খানকে পাটনার সুবেদার নিযুক্ত করা হয়েছে। তাকে সেখানে অবাধে চলে যেতে দিও।"

অপর দিকে মুবারেজ খানকে লেখা হলো ঃ "তোমাকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারীর দায়িত্ব এ জন্যই অর্পণ করা হয়েছিল যে, তুমি স্বীয় আফগান মিত্রদের সাহায্য নিয়ে তা দখল করবে বলে অংগীকার করেছিলে। তোমাকে এমন সময় ফরমান পাঠানো হয়েছিল, যখন আওজ খান দেওগড়ে এবং নিযামুল মুল্‌ক মুরাদাবাদে ছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজধানী আওরংগাবাদ তখন একেবারেই অরক্ষিত ছিল। কিন্তু তুমি এক নগণ্য জমীদারের মোকাবিলা করতে গিয়ে এত অধিক সময় কাটিয়ে দিলে যে, নিযামুল মুল্‌ক ও আওজ খান উভয়েই আওরংগাবাদে মিলিত হলো। এখন তুমি আরো এক ভুল করলে যে, আওরংগাবাদ থেকে ৬০ ক্রোশ দূরে পড়ে রয়েছ এবং বৃষ্টির অজুহাত দেখাচ্ছ। তোমার মিত্র বাহাদুর খান প্রমুখও আসেনি। এমতাবস্থায় নিযামুল মুল্‌ককে সুবেদারীতে বহাল রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তোমাকে এর বদলে পাটনার সুবেদারী দেয়া গেল। বুরহানপুর অথবা সিকাকুল—এই দুই পথের যে পথ ধরে ইচ্ছা সেখানে চলে যাও। নিযামুল মুল্‌ককে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি যাতে তোমার যাত্রায় বাধা না দেয়।" কিন্তু এই দু'টো ফরমান এমন সময়ে পৌঁছলো, যখন উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেদের বিবাদ মীমাংসার ভার তরবারীর হাতে সমর্পণ করে ফেলেছেন।

মুবারেজ খানের পরাজয়

নিযামুল মুল্‌ক ইতিপূর্বে যেমন আলম আলী খান ও দেলোয়ার আলী খানকে যুদ্ধের আগে সন্ধির আহবান জানিয়েছিলেন, তেমনি মুবারেজ আলী খানকেও আপোষকামী ও বন্ধুসুলভ ভাষায় মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও হানাহানির পরিণাম সম্পর্কে হুশিয়ার করে দেন এবং পুরনো প্রীতির বন্ধন ও একই জন্মভূমির সন্তান হিসেবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। শাহী দরবারের উপদেষ্টা ও পারিষদবর্গ যে শিশুসুলভ আচরণ করছিল, তার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন যে, আমাদের এসব কারসাজির হাতিয়ার হওয়া সমিচীন নয়। তিনি একথাও লিখলেন যে, আমাকে এই প্রদেশ

থেকে বদলী এবং অন্য কোন প্রদেশে নিযুক্তির আনুষ্ঠানিক নির্দেশ না আসা পর্যন্তই আমি এখানে অবস্থান করছি। যে মুহূর্তে এ সংক্রান্ত নির্দেশ আসবে, আমি তৎক্ষণাত চলে যাবো। এতক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর।" কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা এই যে, মুবারেজ খান এই সন্ধির আহ্বান গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পাঠান মিত্ররা তাকে স্বদেশী প্রীতির দোষারোপ করে এবং বলে যে, তুমি সম্রাটের নির্দেশ উপেক্ষা করে স্বীয় মোগল ভাই-এর পক্ষাপাতিত্ব করছ। এ কথা শুনে মুবারেজ খান বাধ্য হয়ে নিযামুল মুল্‌কের সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবার জন্য রওনা হয়ে যান। ওদিকে নিযামুল মুল্‌ক আওরংগাবাদ থেকে ৬ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে যখন উভয় বাহিনীর মধ্যে ১২ ক্রোশের ব্যবধান রয়ে গেল, তখন মুবারেজ খান হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ভিন্ন পথ ধরে নিযামুল মুল্‌কের অজান্তে সোজা আওরংগাবাদ চলে যাবেন। কেননা আওরংগাবাদের প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই বলে তিনি জানতেন। তা ছাড়া দৌলতাবাদের দুর্গরক্ষী তার হাতে দুর্গ সপে দেবে এই মর্মে একটি আশ্বাসও তিনি পেয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মুবারেজ খান স্বীয় শিবির পুনার কাছে রেখে ভিন্ন পথ ধরে ক্ষীপ্র গতিতে আওরংগাবাদ অভিমুখে ছুটলেন। কিন্তু তার এই নয়া চাল সম্পর্কে তার সেনাবাহিনী ওয়াকিফহাল ছিল না। তারা ভাবলো, মুবারেজ খান নিযামুল মুল্‌কের মোকাবিলা করতে ভয় পাচ্ছেন। তাই তাদেরও সাহস ও উদ্যমে ভাটা পড়লো। অপর দিকে নিযামুল মুল্‌কের সৈন্যরা যখন ব্যাপারটা জানলো, তখন তাদের মধ্যে যারা নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতার জন্য ভীত হয়ে পড়েছিল, তাদের সাহস বেড়ে গেল। তারা বুঝে ফেললো যে, মুবারেজ খান তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। লোকেরা তৎক্ষণাত নিযামুল মুল্‌ককে মোবারকবাদ জানালো। জনৈক কবি এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে যে কবিতা লেখেন তার শিরোনাম ছিল ঃ

"ডর গিয়া মুবারেজ খান"(মুবারেজ খান ভড়কে গেছে)।

মুবারেজ খানের নয়া কৌশলের তাৎপর্যও নিযামুল মুল্‌ক তৎক্ষণাত বুঝে ফেললেন। তিনি স্বীয় বাহিনীর মারাঠা সৈন্যদেরকে তার পেছনে লাগিয়ে দিলেন। এই সৈন্যরা মুবারেজ বাহিনীর ওপর ক্রমাগত গেরিলা হামলা চালিয়ে এত বিব্রত করে যে, তারা যত ক্ষীপ্রতার সাথে আওরংগাবাদ যেতে চেয়েছিল তাতে সফল হতে পারেনি। এভাবে স্বীয় প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করার পর নিযামুল মুল্‌ক স্বীয় কামান বাহিনীকে সাথে নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করে এগিয়ে গেলেন। শাকার খেড়া[১] নামক স্থানে গিয়ে শত্রু বাহিনীকে ধরে ফেললেন। ২৩ মুহাররম ১১৩৭ হিজরী মোতাবেক ১১ই অক্টোবর ১৭২৪ খৃঃ তারিখে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে মুবারেজ খান, বাহাদুর খান পন্নী,

১. আওরংগাবাদ থেকে ৮০ মাইল দূরে বেরার প্রদেশের পাডুয়ানা জেলায় অবস্থিত। পরবর্তীকালে এ স্থানের নাম রাখা হয় ফাতাহ খেড়া অর্থাৎ বিজয় খেড়া।

গালেব খান, আবুল ফাতাহ খান মিয়ানা প্রমুখ ত্রিশ চল্লিশজন বাঘা বাঘা সেনাপতি মারা যায়। মুবারেজ খানের বাহিনীর সাড়ে তিন হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং মুবারেজ খানের দুই পুত্র খাজা মাহমুদ খান ও হামেদুল্লাহ খান গ্রেফতার হয়। এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় নিযামুল মুল্‌ক মাত্র তিনজন সেনাপতি ও খুব কম সংখ্যক সৈন্য হারিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। এই বিজয়ের পেছনেও ছিল নিযামুল মুল্‌কের কামান বাহিনীর সর্বোত্তম ব্যবহার। অতপর ১১৩৭ হিজরীর রবিউস সানী মোতাবেক ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি হায়দরাবাদ পৌছলেন। মুবারেজ খানের পুত্র জালালুদ্দীন মাহমুদ খান তার হাতে শহর সপে দিল। এরপর শুধুমাত্র গোলকুণ্ডার দুর্গ অবশিষ্ট থেকে যায়। মুবারেজ খানের পুত্র খাজা আহমদ খান এক বছর পর্যন্ত দুর্গ রক্ষার্থে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

অবশেষে ১১৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে সেও আনুগত্য স্বীকার করে। এভাবে বৃহত্তর হায়দরাবাদ প্রবেশ নিরংকুশভাবে তার দখলে এসে যায়। এই সময়ে নিযামুল মুল্‌ক মুবারেজ খানের পরিবার পরিজনের সাথে যে অনুকম্পা ও মহানুভবতার আচরণ করেন, তা থেকে বুঝা যায় তিনি কত উদার ও মহৎ ছিলেন এবং কিভাবে দুশমনকে বন্ধুতে পরিণত করতেন। তিনি খাজা আহমদ খানকে ছয় হাজারী পদবী ও শাহামাত খান খেতাব দেন আর খাজা মাহমুদ খানকে দেন পাঁচ হাজারী পদবী ও মুবারেজ খান খেতাব। অধিকন্তু হামেদুল্লাহ খানকে দোহাজারী পদবী দিয়ে তার সাথে নিজের বোনের বিয়ে দেন। সালাবাত জং এর শাসনামলে খাজা মাহমুদ খানকে মুবারেজুল মুল্‌ক গালেব জং এবং হায়দরাবাদের শাসনকর্তার পদ দেয়া হয়। আর তার মৃত্যুর পর হামেদুল্লাহ খানকে দেয়া হলো মুবারেজুল মুল্‌ক খেতাব এবং দেওয়ান সরকার পদ।

সম্রাটের নামে নিযামুল মুল্‌কের পত্র

বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর নিযামুল মুল্‌ক সম্রাটের বরাবরে একটি দীর্ঘ পত্র পাঠালেন। এতে তিনি যা যা করেছেন তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি তৈমুরের আমল থেকে শুরু করে মুহাম্মদ শাহের আমল পর্যন্ত মোগল সৈন্য ও মোগল আমীরদের আনুগত্যের বিবরণ দেন। বিশেষত নিজের পরিবারের এবং স্বয়ং নিজের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের বিস্তারিত বিবরণ দেন। এই কৃতিত্বের সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত ছিল গুজরাটে হায়দার কুলি খান এবং মালোহে দোস্ত মুহাম্মদ খানের বিদ্রোহ দমন। তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, আমি ব্যক্তিগত ক্ষমতার জন্য কখনো লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে উদ্যোগী হইনি। নচেত আমাকে ডিংগিয়ে মুহাম্মদ আমীন খান মন্ত্রী হতে পারতেন না এবং আমি বারবার শাহী আদেশে দিল্লী হাজির হতাম না। তিনি স্বীয় মন্ত্রীত্বের আমলে সাম্রাজ্যের প্রশাসন যন্ত্রে কিভাবে সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেছেন এবং সম্রাটের

ঘনিষ্ঠতম লোকেরা গোপন ষড়যন্ত্র, চোগলখুরি ও কুটিল চক্রান্তের মাধ্যমে কিভাবে তা নস্যাত করার চেষ্টা চালিয়েছে তারও উল্লেখ করেন। চিঠিতে তিনি এক জায়গায় মুবারেজ খানকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লেলিয়ে দেয়ার গোপন কাহিনীও তুলে ধরেন এবং সেই সাথে মুবারেজ খানের নামে পাঠানো সম্রাটের আসল চিঠিগুলোও দেখিয়ে প্রশ্ন করেন, "আমি আমার ও আমার পরিবারের দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ সেবার বিনিময়ে কি এই প্রতিদানেরই যোগ্য ছিলাম? অতপর বিজাপুর ও হায়দারাবাদের ইতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করে তিনি সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে বলেন যে, একজন রাষ্ট্রনায়কের জন্য তার অসৎ উপদেষ্টারাই প্রধান সমস্যা হয়ে থাকে। এ ধরনের উপদেষ্টাদের কারণেই আদিল শাহ ও কুতুব শাহের সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল এবং এদের জন্যই ইরানের ওপর আফগানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি মুহাম্মদ শাহকে স্বীয় আচার আচরণ ও আদত অভ্যাস শুধরানোর উপদেশ দেন এবং একজন সম্রাট হিসেবে তার দায়িত্ব কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন। উপসংহারে তিনি মুবারেজ খানের সাথে স্বীয় যুদ্ধের বর্ণনা দেন এবং কিভাবে বিজয় লাভ করেন তা সবিস্তারে উল্লেখ করেন।

নিযামুল মুল্কের মালোহ ও গুজরাট থেকে পদচ্যুতি ও দাক্ষিণাত্যে নিয়োগ লাভ

মুহাম্মদ শাহ দৃশ্যত নিযামুল মুল্‌কের উক্ত চিঠিকে কোন আমল দেননি। তবে দরবারের আমীরদের একটি সর্বসম্মত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নিযামুল মুলকের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাকে দাক্ষিণাত্যের ৬টি প্রদেশের সুবেদার হিসেবে স্থায়ী নিয়োগ প্রদান এবং মন্ত্রীত্বের পূর্বে তার যে জাইগীরগুলো ছিল তা বহাল করেন। অধিকন্তু তাকে আসফজাহ খেতাব ও 'নয় হাজারী আরোহী ও পদাতিক' পদবী প্রদান করেন। সেই সাথে ইতিমাদুদ্দৌলা কামরুদ্দীন খানকে স্থায়ীভাবে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। মালোহ ও গুজরাটের সুবেদারী থেকে নিযামুল মুল্‌ককে সরিয়ে প্রথমটিতে গিরিধর বাহাদুর নাগরকে এবং দ্বিতীয়টিতে সারবলন্দ খানকে সুবেদার নিয়োগ করেন।

আসফিয়া রাজ্যের স্বরাজ

এই সময় থেকেই নিযামুল মুল্‌ক আসফজাহ শাসিত দাক্ষিণাত্যে তথা আসফিয়া রাজ্যে স্বায়ত্ব শাসনের সূচনা হয়। নবাব সাহেব অবশ্য পুরুষানুক্রমিক চাকুরীর ঐতিহ্যের মূল্য দিয়ে দিল্লীর সম্রাটের আনুগত্য বর্জন করেননি এবং রাজকীয় শাসন ক্ষমতার প্রতীক স্বরূপ কোন আলাদা বাহ্যিক সাজসজ্জাও অবলম্বন করেননি। তিনি নিজেকে রাজা বা সম্রাট ঘোষণা করেননি, সিংহাসনে বসেননি, রাজ দরবার প্রতিষ্ঠা করেননি, নিজ নামে স্বতন্ত্র মুদ্রা ও খুতবা প্রবর্তন করেননি, এমনকি এ ঘটনার কয়েক বছর পর দিল্লী থেকে সম্রাটের অনুরোধ পেয়ে তাতে সাড়া দিতে এবং সামরিক ও রাজনৈতিক

দায়িত্ব পালন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশের সকল রাজনৈতিক ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি কার্যতঃ দিল্লীর শাহী আধিপত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যান। সকল ছোট বড় প্রশাসনিক পদে নিয়োগ ও পদচ্যুতি, খেতাব পদবী ও জাইগীর প্রদান, যুদ্ধ সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, করদ রাজ্যগুলোর কর আদায়, প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের সাথে রাজনৈতিক লেনদেন এবং অন্য সকল ব্যাপারে তিনি আপন একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এসব ব্যাপারে তিনি অবিকল একজন স্বাধীন ও স্বয়ম্ভর শাসকের মত কাজ চালিয়ে যান। নিযামুল মুল্‌কের পর তদীয় উত্তরসুরীরাও এক শতাব্দীরও বেশীকাল অবধি দিল্লীর সম্রাটকে একইভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে থাকেন। যতদিন তৈমুর বংশীয় সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল, ততদিন দাক্ষিণাত্যে তার নামেই মুদ্রা ও খুতবা চালু ছিল। দাক্ষিণাত্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার জন্য দিল্লী থেকেই ফরমান লাভ করার রেওয়াজ চালু ছিল। (যদিও এই ফরমান ছিল নিতান্তই আনুষ্ঠানিক এবং ফরমানের ওপর কারোর শাসক হওয়া নির্ভর করতো না।) দিল্লীর সম্রাটের ফরমানকে প্রাচীন আমলের মতই সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হতো। কিন্তু এসব বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আসফিয়া রাজ্যে দিল্লীর সম্রাটের কোন বাস্তব ও কার্যকর কর্তৃত্ব অবশিষ্ট ছিল না।

সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ও দাক্ষিণাত্যের বিচ্ছিন্নতার কারণসমূহ

দাক্ষিণাত্যের স্বশাসিত রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার এই ঘটনা যেসব কারণে সংঘটিত হয়েছিল, তার একটা মোটামুটি ধারণা ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে পাঠকগণ পেয়ে থাকবেন। কিন্তু একটা পূর্ণাংগ ও নির্ভুল ধারণা লাভের জন্য উল্লিখিত ঘটনাবলীর আলোকে দেশ ও সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা, অবক্ষয় ও অধোপতনের কারণসমূহ এবং এসব কারণের ফলাফলের ওপর একটা সার্বিক পর্যালোচনা চালানো আবশ্যক।

আলমগীরের চরিত্র, তাঁর শাসনপ্রণালী এবং তার রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। এমনকি ঐতিহাসিক সমালোচকদের একটি বৃহৎ গোষ্ঠী আলমগীরকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলে আখ্যায়িত করতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু তাঁর পক্ষে বা বিপক্ষে কোন ধরনের মতামত ব্যক্ত করার আগে যে কোন সুস্থ চিন্তাসম্পন্ন পর্যবেক্ষকের এ ব্যাপারে তত্ত্বানুসন্ধান করা উচিত যে, আলমগীরের আমলে দেশ ও দেশবাসীর অবস্থা কিরূপ ছিল, নৈতিক, মানসিক, বৈষয়িক, জ্ঞানগত ও চারিত্রিক দিক থেকে তাদের সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও যোগ্যতার মান কি ছিল, আর এসবের আলোকে যে মানুষটির হাতে তৎকালে রাজনীতি ও নেতৃত্বের বাগডোর ছিল সে তার পতনের জন্য কতখানি দায়ী ছিল, নাকি তারই কল্যাণে সাম্রাজ্য

আরো কিছুকাল দীর্ঘস্থায়ী হতে সক্ষম হয়েছিল ? এরূপ মুক্ত ও নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ আমলের সার্বিক পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করলে এ তথ্যই উদঘাটিত হবে যে, হিজরী একাদশ তথা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী ভারতবর্ষের জন্য এমন এক সময় ছিল, যখন এ দেশের মানুষ যুগপৎভাবে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরেও আরোহণ করেছিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পতনের দিকেও ধাবিত হয়েছিল। শান্তি ও নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপকরণসমূহের প্রাচুর্য, ভোগবিলাসের সামগ্রীর অঢেল সরবরাহ এবং আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত হুমকি ও উপদ্রবের শংকা থেকে মুক্তি সম্রাট শাহজাহানের আমলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। আর এই নিরুদ্বেগ সুখ সমৃদ্ধি ও উপচে পড়া ঐশর্যই জাতির চিন্তা ও কর্মের উদ্যম ও স্পৃহাকে নিস্তেজ এবং নৈতিক ও মানসিক মানকে অধোপতিত ও জরাগ্রস্ত করে দিতে শুরু করে। দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, ঘাতপ্রতিঘাত ও সংগ্রাম অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে যে মানবীয় শক্তি ও বল-বীর্যের উত্থান ঘটেছিল, আরাম-আয়েশ, বিলাস-ব্যসন ও উদ্বেগহীন প্রশান্তির কারণে তা নিষ্ক্রীয় ও স্থবীর হয়ে পড়ে। জনগণের মধ্যে তেজস্বীতা, উদ্দীপনা ও বলবিক্রমের পরিবর্তে এমন সব আবেগ উচ্ছাস ও ঝোঁকপ্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে, যার প্রভাবে তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কৃত্রিমতা ও বৈচিত্র প্রীতি, আরাম আয়েশ, বিলাস ব্যসন, সাজসজ্জা, রূপচর্চা, জাঁকজমক ও আড়ম্বর প্রিয়তা এবং মাত্রাতিরিক্ত সৌন্দর্যপ্রীতি ও বাবুগিরিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, দেশে মনোরম পোশাক পরিচ্ছদ, সুরম্য অট্টালিকা, নয়নাভিরাম যানবাহন, চমকপ্রদ তৈজসপত্র ও ঘরোয়া সাজরসজ্ঞাম এবং অন্য সকল যুগোপযোগী তামাদ্দুনিক উপরকরণ সরবরাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, সুযোগ্য সেনাপতি, সদা জাগ্রত কর্মকর্তা, বিচক্ষণ প্রশাসক ও দক্ষ কর্মীর অভাব দিন দিন প্রকট হতে থাকে। একদিকে আকবর জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে যেসব আমীর ওমরাহ পরিবার অত্যন্ত দক্ষ ও দুর্লভ রত্নের জন্ম দিয়েছিল সেসব পরিবার চরম বন্ধাত্বের শিকার হয়ে পড়ে এবং সে ধরনের সুযোগ্য সন্তান জন্ম দিতে অপারগ হয়ে পড়ে। অপর দিকে দেশের সাধারণ সমাজ জীবনও নয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের দরুন এত বিষাক্ত হয়ে পড়ে যে, উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও মন্ত্রী পর্যায়ে স্থানীয় অধিবাসীর মধ্য থেকে লোক নিয়োগ দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। যোগ্য মানুষের অভাব এত প্রকট হয়ে দেখা দেয় যে, সম্রাট আলমগীর প্রায়ই এ জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করতেন। নিজের আত্মজীবনীতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন ঃ "কাজের লোকের অভাবে হতাশ হয়ে পড়েছি।"

মোগল সাম্রাজ্য ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়াও ইরান ও তুরান থেকেও দক্ষ জনশক্তির সরবরাহ পেত। নতুন রক্ত, উর্বর মস্তিষ্ক এবং কর্মচঞ্চল হাত পা সমৃদ্ধ এসব বিদেশী মানুষ এখানকার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার

করতো। কিন্তু অবক্ষয়ের যে মহামারী এ সময়ে ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তৎকালে ইরান, তুরান, খোরাসান, ইরাক, রোম ও সিরিয়া—সর্বত্রই তার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে শাহ আব্বাস সাফাভীর মৃত্যুর পর ইরানেও অবক্ষয় শুরু হয় এবং শতাব্দীর সমাপ্তিকালে তা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। যে বছর ইরানে আফগানদের আগ্রাসন শুরু হয় এবং ভারতের সিংহাসনে মুহাম্মদ শাহ অধিষ্ঠিত হন, তার তিন বছর পর ইরানে সাফাভী সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। অপর দিকে আফগান জাতিও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তারা তিন বছরের বেশী সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসনকার্য চালাতে সক্ষম হয়নি। যে বছর নিযামুল মুল্ক মোগল সাম্রাজ্যের চরম বিশৃংখলায় হতাশ হয়ে দাক্ষিণাত্যের পথে পাড়ি জমান, প্রায় সেই বছরই ইরানের ক্ষমতাসীন নতুন আফগান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ওদিকে তুর্কিস্তান ও মধ্য এশিয়ার অবস্থা ইরান ও আফগানিস্তানের চেয়েও শোচনীয় ছিল। সেখানে চরম অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, যা ক্রমান্বয়ে গোটা তুর্কী জাতির বল-বীর্য ধ্বংস করে দেয়। এরই পরিণতিতে এক থেকে দেড় শতাব্দীর পর জার শাসিত রুশ সাম্রাজ্য গোটা তুর্কিস্তানকে গ্রাস করে।

অনুরূপভাবে ভারতে স্থানীয়ভাবে যোগ্য লোকের উৎপাদন কম এবং বিদেশ থেকে সরবরাহ ততোধিক কম হয়ে যাওয়ায় এত বড় বিশাল দেশের শাসনকার্য স্বাভাবিকভাবে ও শক্ত হাতে পরিচালনার ব্যাপারে মোগল শাসকদের যোগ্যতা দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। কিন্তু এই দুর্বলতার প্রভাব প্রকট ও বিপর্যয়কর হয়ে ওঠার পথকে যে বস্তুটি আগলে রেখেছিল, সেটি আলমগীরের ন্যায় প্রতাপান্বিত রাষ্ট্রনায়কের ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। আলমগীরের কট্টর বিরোধীরাও একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবন, কষ্ট সহিষ্ণুতা, সৈনিক সুলভ অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ওপর ব্যক্তিগত তদারকী, পরিস্থিতি অনুধাবনের ক্ষমতা এবং মানুষের সুপ্ত সহজাত যোগ্যতা চেনা ও তা কাজে লাগানোর সামর্থের দিক দিয়ে তার কোন জুড়ি ছিল না। গভীর ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখে নিয়েছিলেন যে, দেশে দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতি দেশবাসীকে বিলাসপ্রিয় ও ভোগলিপ্সু বানিয়ে দিয়েছে। শংকাহীন ও নিরুপদ্রব জীবন তাদের সামরিক বল-বিক্রম ও সংগ্রামী উদ্যম উদ্দীপনাকে নিস্তেজ করে দিয়েছে। সুখ-সমৃদ্ধি ও নিরুদ্বেগ জীবন তাদেরকে শ্রমবিমুখ ও অলস করে দিয়েছে। তাদের কর্মশক্তি ও কর্মস্পৃহা নির্জীব ও ভোগস্পৃহা প্রবল হয়ে উঠছে। এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি ভারতের ভেতর ও বাহির থেকে সম্ভাব্য দক্ষতম লোকদেরকে বেছে বেছে সংগ্রহ করেন, তাদের মধ্যে সুপ্ত যোগ্যতা ও সহজাত প্রতিভা চিহ্নিত করে তদনুসারে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেন এবং তাদেরকে উচ্চতর দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করেন। তিনি প্রত্যেককে তার যোগ্যতা অনুসারে কর্মে নিয়োগ করেন এবং যে যে পদ ও

দায়িত্বের যোগ্য নয়, তাকে সেই পদ ও দায়িত্বের ধারে কাছেও ঘেষতে দিতেন না। আসাদ খান, জুলফিকার খান, গাজীউদ্দীন খান ফিরোজ জং, মুহাম্মদ আমীন খান, চেন কালীজ খান, হামীদুদ্দীন খান, রুহুল্লাহ খান বখশী, ফাতহুল্লাহ খান, আজদুদ্দৌলা আওজ খান, সায়েফ খান মীর আতেশ, হাসান আলী খান, শেখ নিযাম হায়দারাবাদী, এনায়াতুল্লাহ কাশ্মীরী এবং এ ধরনের অনেককে তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলেন, যারা সমকালের শ্রেষ্ঠতম সেনানায়ক, প্রশাসক ও পরিকল্পক ছিলেন। এসব লোককে তিনি কর্মে নিয়োগ করেন এবং প্রত্যেককে তার উপযুক্ত স্থানে রাখেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বীয় প্রশাসন কাঠামোকে সর্বনিম্নস্তর থেকে শীর্ষ পদ পর্যন্ত নিজের প্রত্যক্ষ ও অব্যর্থ তত্ত্বাবধানে রাখেন। সুবেদার ও সেনানায়ক থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের স্থানীয় শাসক, অর্থ বিষয়ক কর্মকর্তা ও কর আদায়কারী পর্যন্ত সরকারের কোন কর্মচারী সম্রাটের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান থেকে মুক্ত ছিল না এবং তার ভয়ে কেউ অর্পিত দায়িত্ব পালনে গাফিলতী করতে পারতো না। অনুরূপভাবে সেনাবাহিনী ও সেনাপতিদেরকে তিনি অবিরাম চল্লিশ বছর ধরে যুদ্ধে নিয়োজিত রাখেন এবং তাদেরকে এমন কষ্টকর শ্রমে নিয়োজিত রাখেন যে, তাদের মধ্যে আরাম আয়েশের প্রতি বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল না।

কিন্তু এসব সাফল্য ও কৃতিত্ব কেবল একজন মাত্র ব্যক্তির চেষ্টা ও পথনির্দেশনার ফল ছিল এবং তারই ওপর নির্ভর করে ভারত সাম্রাজ্যের সুবিশাল কারখানাটি চলতো। নচেৎ সাম্রাজ্যের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে এই গুরুদায়িত্ব বহনের যোগ্যতা ছিল না। আলমগীর যে প্রশাসনযন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন এবং যে ধরনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম দিয়ে তাকে বিন্যস্ত করেছিলেন, তা চালাতে ও কাজে লাগাতে স্বয়ং তাঁরই মত দক্ষ প্রকৌশলী ও স্থপতির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তার ইন্তিকালের পর যারা তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল, তাঁরা তার মত দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল না। তারা কারখানাটির বিন্যাস ও স্থাপনা কিভাবে হয়েছে তাও বুঝতো না, এর সাথে সংযুক্ত যন্ত্রপাতির মধ্যে কোন্‌টি কি ধরনের ক্ষমতার অধিকারী, তাও জানতো না। আলমগীরের সময়ে যেসব যন্ত্রপাতি ছিল, তার তীরোধানের পরও সেগুলোই কর্মরত ছিল। গুটিকয় ব্যতিক্রম বাদে, বাহাদুর শাহের আমল থেকে মুহাম্মদ শাহের আমল পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে যারা কর্মরত ছিল, তাদের সকলেই আলমগীরের প্রশাসনে কাজ করতো। কিন্তু স্বয়ং সম্রাটই বুঝতেন না কাকে কোন কাজে লাগানো উচিত এবং কে কোন দায়িত্ব পালনে সক্ষম কিংবা অক্ষম। পরবর্তী সম্রাটদের কেউ এই কারখানাটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখারও ক্ষমতা রাখতেন না এবং এর শক্তিশালী যন্ত্রপাতিগুলো যাতে স্ব-স্ব স্থানে থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে না পারে সেজন্য সেগুলোকে কঠোর হস্তে আঁকড়ে ধরে রাখতে সমর্থ ছিলেন না। তারা কতক যন্ত্রপাতিকে পাল্টে ফেলেন, কতককে অকর্মণ্য করেন, কতককে নষ্ট করে ফেলেন। কতক যন্ত্রপাতিকে এমন কাজে

লাগান, যে কাজের তারা যোগ্য ছিল না। কতক যন্ত্রপাতিকে তাঁরা পরস্পরে টক্কর বাধিয়ে দিয়ে চুরমার করে দেন। অবশেষে কারখানার সমগ্র কাঠামোগত বিন্যাসকে ওলট পালট করে দেয়ার পর সেটিকে নিজের বশে আনার পরিবর্তে নিজেই তার বশীভূত হয়ে যান। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, কারখানা ভেঙে তছনছ হলো, যন্ত্রপাতি ওলটপালট ও মিছমার হলো এবং সবশেষে কক্ষচ্যুত কতিপয় চাকা ইতস্তত গড়িয়ে গিয়ে কারখানার পরিচালকদেরকেও পিষে মারলো। জুলফিকার খান ও বারেহার সৈয়দদের ঘটনা এই মর্মান্তিক পরিণতির জ্বলন্ত উদাহরণ।

বস্তুত আলমগীরের মৃত্যুর পর যোগ্য কর্মকর্তাদের অভাবের চেয়েও যোগ্য সম্রাটের অভাবই অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয়। আলমগীরের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদের পুরো তালিকার ওপর দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়, আল্লাহ তায়ালা আকস্মিকভাবে তৈমুরের বংশধরের কাছ থেকে রাষ্ট্রনায়কোচিত যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। আযম ও কামবখশের অদূরদর্শিতা, বাহাদুর শাহের দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, জাহাঁদার শাহ, ফররুখ শিয়ার ও মুহাম্মদ শাহের চরম অদক্ষতা এবং বাবরের রাজবংশে রফীউশশান ও নেকু শিয়ারের মত নারীসুলভ স্বভাবের অধিকারী যুবরাজদের জন্ম দেখলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ ধরনের উত্তরসূরী আলমগীর কেন, স্বয়ং আকবরেরও যদি ভাগ্যে জুটতো, তবু পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সাম্রাজ্য তাদের হাতছাড়া হয়ে যেত। একজন দু'জন অযোগ্য সম্রাটের পর যদি কোন একজন দক্ষ ও বিচক্ষণ সম্রাট ক্ষমতায় আসতো, তাহলেও হয়তো সে সম্রাজ্যকে কিছুটা সামাল দিতে পারতো। কিন্তু এখানে তো বরাবর একজন অযোগ্যের পর আরেকজন অধিকতর অযোগ্য ক্ষমতায় এসেছে। প্রকৃতপক্ষে আলমগীরের পর একদিনের জন্য কোন উপযুক্ত ও দক্ষ সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেনি। নিজস্ব বুদ্ধি দ্বারা রাষ্ট্রের সমস্যাবলী অনুধাবন ও তা সর্বাত্মক দৃঢ়তা দিয়ে সমাধান করা। নিজস্ব শক্তির বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন, অতপর সেই ক্ষমতা বহাল রাখা এবং নিজস্ব ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে চলার পথ সুগম করে স্বকীয় শক্তির বলে সামনে অগ্রসর হওয়ার মত বিচক্ষণতা ও তেজস্বীতা তাদের কারোর মধ্যেই ছিল না। এ ধরনের কোন সম্রাট যখনই কোন দুর্যোগ ও দুর্বিপাকে পড়ে দিশেহারা হয়ে যেত, তখন যে কোন ক্ষমতাবান ও উচ্চাভিলাসী লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করতে এলেই সে নিজেকে সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিষয়কে তার হাতে সপে দিত। অতপর এই উদ্ধারকারী যখন পরবর্তীকালে স্বেচ্ছাচারী হয়ে আবির্ভূত হতো এবং তার অত্যাচারে সে অতিষ্ঠ হয়ে যেত, তখন অন্য কোন স্বার্থপর কুচক্রী ও ধুরন্ধর লোকের ফাঁদে আটকা পড়ে তার হাত থেকে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হতো। এ ধরনের ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দরুন দেশে গোপন যোগসাজশ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, দোমুখো আচরণ ও দলাদলির এক দীর্ঘস্থায়ী ধারা

চালু হয়ে যেত। দেশ ও সাম্রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দেয়া হতো। আমীর ওমরাহ ও সুবেদারদের একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে লড়াই করতে লেলিয়ে দেয়া হতো। সাম্রাজ্যের উচ্চতর দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদেরকে পর্যন্ত উস্কে দেয়া হতো। আইন-কানুনের প্রতি কারোর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল না এবং প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থা ও শৃংখলা ভেঙ্গে পড়েছিল। সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতা ছড়িয়ে পড়েছিল। যে অটুট রজ্জুতে আবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ ছিল, তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আলমগীরের মৃত্যুর পর থেকে মুহাম্মদ শাহের সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত মাত্র ১৩ বছরের মধ্যে শুধু ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে একের পর এক সাতটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে একাধিক আমীর ও সুবেদার পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যে শক্তি-সামর্থ ও মেধা সাম্রাজ্যের পরিচর্যায় ব্যয়িত হওয়ার কথা ছিল, তার শোচনীয় অপচয় ও বিনাশ ঘটে। অধিকাংশ গৃহযুদ্ধের পর বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষকে নৃশংসভাবে কচুকাটা করে। এই গণহত্যায় বহু দক্ষ ও যোগ্য লোক নিপাত হয়ে যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উপদলের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করতে পারে এমন কোন শক্তি বা ব্যক্তিত্ব ছিল না। তাই যে দল ক্ষমতায় এসেছে, সে প্রতিদ্বন্দ্বি দলকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে। এভাবেও বিপুল পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয়েছে। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা ও ভ্রান্ত নীতির কারণে দেশের বিভিন্ন অংশে যুদ্ধাংদেহী সম্প্রদায় ও গোত্রসমূহ সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করেছে। শিখ, জাঠ, মারাঠা, বুন্দিলে ও রাঠোর প্রভৃতি সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে ঝড়ের তান্ডব তুলেছে। একটি গোষ্ঠী রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা জাগ্রত করে মোগলদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়। এ ধরনের বিদ্রোহও সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রকমারি বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের কারণে সরকারী রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দেখা দেয় এবং শিল্পে, বাণিজ্যে ও উৎপাদন তৎপরতায় ভাটা পড়ে। এর ফলে সর্বপ্রকারের রাজস্ব আদায় ব্যাহত হয় এবং ক্রমান্বয়ে সরকারের যাবতীয় আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অল্পবিস্তর যা কিছু অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা হতো, তাও সঠিক খাতে ব্যয়িত না হয়ে ভুল খাতে ব্যয়িত হওয়ায় তাতে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হতো, দরবারী মোসাহেব, ভাঁড় ও সাংগপাংগ পোষা এবং আমোদফূর্তি ও ভোগবিলাসে বেহিসেবে অর্থ খরচ করা হতো। অথচ জ্ঞানীগুণীজন উপোষ করে মরতো। সেনাবাহিনীর বেতন বাকী পড়তো। যুদ্ধের আপতকালীন প্রয়োজনে সামরিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য রাজকীয় তোষাখানার তৈজসপত্র পর্যন্ত বিক্রী করতে হতো।

এহেন পরিস্থিতিতে দেশের যোগ্য ও দক্ষ লোকেরা দেখলো যে, কেন্দ্রীয় সরকারে পদোন্নতির ক্ষেত্রে দক্ষতা ও কৃতিত্বের কোন গুরুত্ব নেই। শাহী ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে কর্তাভজা স্তাবক, তোষামুদে মোসাহেব ও কুচক্রী সভাসদদের কুক্ষীগত। এসব লোকের উপস্থিতিতে দেশ ও সরকারের কোন সেবা করা এবং সেই সেবার বিনিময়ে চাকুরীতে উন্নতি লাভ করা অসম্ভব। উন্নতি লাভ তো দূরের কথা, মান-মর্যাদা বজায় রাখাও দুরূহ ব্যাপার। অগত্যা তারা নিজ নিজ নিরাপত্তা ও কল্যাণের স্বার্থে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে অঞ্চলে যার আধিপত্য আছে, সেখানে সে নিজের পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই সমিচীন মনে করলো। যারা নিজের আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার মত প্রতাপশালী ছিল না, তারা কোন শক্তিমান আমীরের তল্পীবাহী হয়ে তার চাকুরীতে ঢুকে গেল। সাধারণ প্রজারাও নিত্য নৈমিত্তিক অরাজকতায় অতিষ্ঠ ও বিক্ষুব্ধ ছিল। সাম্রাজ্যের মসনদে প্রতিবার ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে একজন নতুন সুবেদার নিযুক্ত হয়ে আসতো। আর এই নয়া সুবেদার অদূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য নতুন কোন বিপ্লবে চাকুরী খোয়ানোর আশংকায় প্রজাদের ওপর শোষণ ত্রাসন ও লুটপাট চালিয়ে দ্রুত নিজের আখের গুছানোর ও পকেট ভারী করে রাতারাতি আংগুল ফুলে কলা গাছ হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তো। নতুন কোন সুবেদার এলে প্রথম সুবেদার তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইত না। জনগণ কার পক্ষ নেবে ভেবে দিশেহারা হতো। এসব সমস্যার যাতাকলে নিষ্পেসিত হয়ে প্রদেশবাসী বাধ্য হয়ে ভাবতো, এর চেয়ে বরং কোন শক্তিশালী লোক এসে তাদের প্রদেশে নিজের স্বতন্ত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করুক, এবং একটা নিয়মতান্ত্রিক স্থীতিশীল সরকারের অধীনে তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিত্যকার গঞ্জনা থেকে রক্ষা পাক। এসব কারণেই বাংলায়, অযোধ্যায়, রহিখণ্ডে, মালোহে, গুজরাটে, সিন্ধুতে এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছোট বড় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে।

দাক্ষিণাত্যে নিযামুল মুল্কের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠাও এই ঘটনাপ্রবাহেরেই একটি অংশ। নিযামুল মুল্ক ও তাঁর পরিবার দাক্ষিণাত্যে ৭০/৮০ বছর যাবত ভারত সাম্রাজ্যের অধীন সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর দাদা, পিতা, চাচা, ফুফা এবং তিনি স্বয়ং এ ভূখণ্ডে সেনাপতি, সুবেদার ও স্থানীয় শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়ে তার দাদা রক্ত দিয়েছেন এবং পিতা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। দাক্ষিণাত্যের জনসাধারণ, জমিদার, জাইগীরদার, শাহী কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ—সকলের ওপর তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তা ছাড়া তুরানী আমীরদের একটি বিরাট গোষ্ঠীও তাঁর পক্ষে ছিল। এদের অধিকাংশ দাক্ষিণাত্যের কোন না কোন অঞ্চলে সামরিক অথবা প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন। এ জন্য অন্য কোন প্রদেশের তুলনায় দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ তার বেশী ছিল। এ কারণেই তিনি মালোহ ও গুজরাট প্রদেশ বাদ দিয়ে দাক্ষিণাত্যকে

অগ্রাধিকার দেন। যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে নিজের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন, সে সময়ে ঐ দুই প্রদেশও তাঁর শাসনাধীন ছিল। মালোহ ও গুজরাট প্রদেশদ্বয়কে নির্বাচন না করার আরো একটা কারণ ছিল এই যে, এই প্রদেশ দু'টি রাজধানী থেকে অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত ছিল। সেখানে থাকলে মোগল সরকারের সাথে যে কোন সময় সরাসরি সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ার আশংকা ছিল। এ ধরনের যে কোন সংঘর্ষ তিনি এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী

মুনতাখাবুল লুবাব, ২য় খণ্ড
ফতুহাতে আসফী
মায়াসিরুল উমারা
মায়াসিরে নিযামী
সারওে আবাদ
খাজানায়ে আমেরা } গোলাম আলী আজাদ বলগ্রামী
সিয়ারুল মুতায়াখ্খিরীন—গোলাম হোসেন তাবাতাবায়ী কোলকাতা সংস্করণ, ১২৪৮ হিজরী
হাদিকাতুল আলম
গুলজারে আসফিয়া
তুজুকে আসফিয়া—তাজাল্লী আলী শাহ
তারীখে জাফারা—মুনশী গুরুধারী লাল, আহকার গুরখপুর সংস্করণ, ১৯২৭
রাকায়াতে মুসাভী খান—মীর মুনশী নবাব আসফজাহ আওয়ান
(পাণ্ডুলিপি, দফতরে দেওয়ানী, দাক্ষিণাত্য হায়দারাবাদ)
বিসাতুল গানায়েম, লক্ষ্মীনারায়ণ শফিক, হায়দারাবাদ সংস্করণ ১৩২২ হিজরী।
সায়রুল হিন্দ ও গুলগাশতে দাক্কান
খাজানায়ে রসূল খানী
হাকিকত হায়ে হিন্দুস্তান (পাণ্ডুলিপি)
(লক্ষ্মীনারায়ণ শফিক, কুতুবখানায়ে আসফিয়া দাক্ষিণাত্য হায়দরাবাদ।)

Later Mughals irvin
A History of the Marathus GRAnt Duff. Calcutta 1918
History of the Deccan—J.D.B Gribble London 1896 & 1924
A History of Mahrathas—Warins.
Rise of the Peshwas—H.N. Sinha. The Indian Press Allahabad 1931.

The Nizam—Briggs.
History of India—Elphinston 5th Edition 1866
Historical and Descriptive Sketch of His Highness
the Nizams Dominions, (S. Hossain Bilgrami and C. Willmott.)

তৃতীয় অধ্যায়

নিযামুল মুল্‌ক আসফজাহ্

আসফিয়া রাজ্য ও মোগল সাম্রাজ্যের সম্পর্কের ধরন

ভারতীয় উপমহাদেশ ও অন্য সকল প্রাচ্য দেশের রাজনীতিতে যে সমস্ত নৈতিক ধ্যান-ধারণা প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে, সেগুলোর মধ্যে এও একটি যে, একটি সাম্রাজ্যের কোন কর্মচারী যদি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজের পৃথক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে অথবা নিজেই সিংহাসন দখল করে বসে, তাহলে জনগণ তাকে বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ মনে করে। এ ধরনের কোন ব্যক্তির আনুগত্য করাকে তারা জঘন্যতম নৈতিক অপরাধ বলে বিবেচনা করে থাকে এবং দেশের সর্ব শ্রেণীর জনগণের মনে দীর্ঘদিন ব্যাপী তার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলতে থাকে। সেই আগুন নেভাতে ও তার তীব্রতা কমাতে তাকে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রম হতে দেখা যায়। যেমন, কোন রাজ পরিবার জুলুম-নির্যাতন, দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের দরুন সম্পূর্ণরূপে ধিকৃত হয়ে গেলে জনগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীকে নিজেদের ত্রাণকর্তা ভাবতে বাধ্য হয়। এ ধরনের অসাধারণ পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রেই উপরোক্ত মূলনীতি প্রযোজ্য। এ জন্যই দেখা যায় প্রাচ্য দেশে যখন কোন রাজশক্তি দীর্ঘদিন যাবত প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং জনগণ ঐ রাজ পরিবারের শাসন ও নেতৃত্ব মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তার চরম দুর্বলতা, অযোগ্যতা ও বিশৃংখলা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত কেউ তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। তার প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কার্যত স্বাধীন শাসকে পরিণত হয়। তথাপি প্রকাশ্যে সেই কেন্দ্রীয় শাসকের আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর স্বীকৃতি না দিয়ে পারে না। তার মোকাবিলায় কেউ নিজেকে রাজা বা সম্রাট বলে ঘোষণা করলে তাকে জনমতের পক্ষ থেকে এমন ঘোরতর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় যে, তার নতুন রাজত্ব অংকুরেই বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। কখনো কখনো প্রজারা নয়া রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করে তাকে খতম করে ছাড়ে। অক্ষমতা ও অরাজকতা চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও যে জিনিসটি মোগল সাম্রাজ্যকে এক দেড় শতাব্দী পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশের রাজনীতিতে টিকিয়ে রেখেছিল সেটি এই কাল্পনিক শক্তিরই অবদান ছিল। জুলফিকার খান যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা সত্ত্বেও নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, আর দিল্লীর সিংহাসনের চাবিকাঠি মুঠোর মধ্যে এসে

যাওয়া সত্ত্বেও বারেহার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় যে সম্রাট হয়ে যেতে পারেননি, তার পেছনেও সক্রিয় ছিল এই দুর্ভেদ্য প্রতিকূল জনমত।

নিজেকে দাক্ষিণাত্যের সম্রাট বলে ঘোষণা করা থেকে নিযামুল মুল্‌ককেও বিরত থাকতে হয়েছিল এই একই অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে। অথচ সকল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ সময় দাক্ষিণাত্যে তার একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজমান ছিল। নামমাত্র সার্বভৌমত্ব ছাড়া মোগল সম্রাটের কোন কর্তৃত্বই সেখানে বিদ্যমান ছিল না।

একথা নিসন্দেহে সত্য যে, রাজত্বের একটি মাত্র ঘোষণা দিয়েই নিযামুল মুল্‌ক যে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ও আইনানুগ কর্তৃত্ব লাভ করতে পারতেন, প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে তিনি তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে ফেলেন। কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি এমন দু'টো দুর্লভ ফায়দাও অর্জন করেন, যা নিজেকে রাজা বা সম্রাট ঘোষণা করে কখনো অর্জন করতে পারতেন না।

প্রথমটি সে সময়ে নিছক নৈতিক ফায়দা বলে গণ্য হলেও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক গুরুত্বও অর্জন করে। সেটি ছিল এই যে, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে জনমতের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও নিন্দা সমালোচনা থেকে তো নিরাপদে থাকলেনই, উপরন্তু তিনি ও তার সন্তানগণ সম্রাটের আনুগত্য বর্জন করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর পূর্ণ আনুগত্য ও সম্মান বজায় রাখার কারণে সর্বস্তরের ভারতবাসী বিশেষত ভারতীয় মুসলিম জনতার চোখে পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় দাক্ষিণাত্যও যখন চারদিক থেকে রাজনৈতিক হুমকি ও দুর্যোগে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে, সে সময় এ জিনিসটি আসফিয়া রাজ্যের জন্য এক অসাধারণ শক্তির উৎস হয়ে দেখা দেয়।

দ্বিতীয় ফায়দা ছিল এই যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে মোগল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা ও নিজের আলাদা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাকে অনিবার্যভাবে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো, তা থেকে তিনি রক্ষা পেয়ে গেলেন। সে সময় তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করে দিলে বিরোধিতা ও প্রতিকূলতার এক সর্বগ্রাসী বিভীষিকার সম্মুখীন হওয়া তার জন্য অবধারিত হয়ে উঠতো। দক্ষিণ ভারতের বহু জায়গায় অবস্থানরত সামরিক শাসকগণ, যাদের ওপর তখনো পর্যন্ত তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে পারেনি, সহসাই বিদ্রোহ করে বসতো। কর্ণাটকের যে সকল ছোট বড় জমীদার নিছক মোগল সরকারের দোর্দন্ড ক্ষমতা ও প্রতাপের ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তারা সবাই একযোগে তার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে রুখে দাঁড়াতো। নিযামুল মুল্‌কের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন উত্তরাঞ্চলীয় বহু গোত্রপতি এমন ছিল, যারা তাঁর বিরুদ্ধে মোগল সরকারের সমর্থনে অস্ত্র ধারণ করতো। সর্বোপরি, মারাঠারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করতো না। মুহাম্মদ শাহ ও

তার আহমক উপদেষ্টাদের ভ্রান্ত রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এ আশংকা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, নিছক নিযামুল মুল্‌ককে দাবিয়ে দেয়ার মতলবে তারা বাজীরাওকে দাক্ষিণাত্যের দু'তিনটে প্রদেশের বন্দোবস্ত দিয়ে দিত এবং মুহূর্তের মধ্যে মহারাষ্ট্রে বর্গীরা (অর্থাৎ মারাঠা দস্যুদেরকে তৎকালে বর্গী বলা হতো) সমগ্র দাক্ষিণাত্যের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে নিযাম সরকারের গোটা প্রশাসনকে তছনছ করে দিত। এসব মারাত্মক বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে নিযামুল মুল্‌ক যাদের সাহায্য নিতেন, তারাও পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হতো না। কেননা তার প্রজারা, কর্মচারীরা, সৈন্যরা এবং অনেক সেনাপতিও মনে মনে তার বিরুদ্ধে থাকতো। তারা নাজুক মুহূর্তে তার পক্ষ ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সাথে গোপন গাঁটছড়া বাঁধতো। এরূপ অবস্থায় প্রথমত আসফিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠাই অসাধ্য হয়ে উঠতো। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, নিযামুল মুল্‌ক নিজের অসাধারণ প্রতিভা বলে এ কাজে কিছুটা সফলতা লাভ করতেন, তথাপি তার বংশধরের মধ্যে কেউ এমন যোগ্যতার অধিকারী ছিল না যে, তার অবর্তমানে এই বিপদসংকুল কাজ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হতো।

এসব দিক বিবেচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নিযামুল মুল্‌ক যে মোগল সরকারের আনুগত্য থেকে প্রকাশ্যভাবে বিচ্যুত হননি এবং রাজকীয় ক্ষমতা লাভের মোহ সম্বরণ করেছিলেন, সেটা নিছক প্রাচ্য দেশীয় মানসিকতাজাত একটা সৌজন্যমূলক কিংবা প্রভু ভক্তিসূচক কাজ ছিল না, বরং তা ছিল একটি উঁচু মানের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার কাজ। এ ধরনের কাজ শুধুমাত্র সেইসব অসাধারণ ব্যক্তিই করতে পারে, যাদের বিবেক কখনো ভাবাবেগের কাছে পরাভূত হয় না। বস্তুত রাজকীয় ক্ষমতা ও মর্যাদার মোহ এক অতীব দুর্নিবার মোহ। এ ক্ষমতা করায়ত্ব করার যথেষ্ট সামর্থ থাকা সত্ত্বেও এর মোহ পরিত্যাগ করা অনেক উঁচু দরের সংযমী লোকের পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, প্রকাশ্যে দিল্লীর সরকারের আনুগত্য বজায় রাখা ও ভেতরে ভেতরে স্বাধীন সরকার পরিচালনার প্রেক্ষাপটে আসফিয়া রাজ্য ও মোগল সাম্রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের রাজনৈতিক ও আইনগত ধরন কি ছিল? এ প্রশ্ন খানিকটা জটিল বটে। কিন্তু ব্যাপারটাকে সরলভাবে ব্যাখ্যা করলে বলা যায় যে, কার্যত স্বাধীন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোন রাজনৈতিক কিংবা বৈষয়িক কারণে নয় বরং নিছক নৈতিক কারণে নিযামুল মুল্‌ক ও তাঁর উত্তরসূরীরা মোগল সম্রাটের আনুগত্যের স্বীকৃতি দিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ জন্য আসফিয়া রাজ্যের ওপর মোগল শাহীর কর্তৃত্ব এবং আধিপত্যও নিছক বাহ্যিক ও প্রদর্শনমূলক ছিল। নিযামুল মুল্‌ক ও তার উত্তরসূরীরা বাহ্যত মোগল সাম্রাজ্যের সুবেদার ছিলেন। সুবেদার পদে তাদের নিয়োগ শাহী ফরমানের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। সম্রাটের দেয়া খেতাব ও পদবীসমূহ তারা

সানন্দে গ্রহণ করতেন এবং সেগুলোকে পরম গৌরবের উৎস মনে করতেন। অথচ দাক্ষিণাত্যে তাদের শাসন ক্ষমতা সম্রাটের প্রদত্ত ছিল না, তার স্থায়ীত্বও সম্রাটের শক্তির ওপর নির্ভর করতো না এবং তাদের নিয়োগ বা পদচ্যুতিতেও সম্রাটের ইচ্ছার কোন দখল ছিল না। সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও তৎপরতা, ছোটবড় যাবতীয় সমস্যার সমাধান এবং আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা একজন স্বাধীন রাজার মতই সর্বেসর্বা ও নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের প্রদেশসমূহ ও প্রশাসনিক [illegible]সমূহের শাসকরা নিযামেরই অধীন ছিল এবং তাদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি [illegible] এখতিয়ারাধীন ছিল। কিন্তু বাহ্যত তারা দাক্ষিণাত্যের সুবেদারের [illegible] বরং মোগল সম্রাটের অধীনস্থ শাসনকর্তা ছিল। কিছুকাল পর্যন্ত তাদের নিয়োগের ফরমান সম্রাটের কাছ থেকেই আসতো। এখানকার করদ রাজ্যগুলোও প্রকৃতপক্ষে নিযামকে কর দিত এবং নিযামই তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন। কিন্তু তাদের ওপর আইনানুগ সার্বভৌমত্ব নিযামের নয় বরং মোগল সম্রাটের ছিল। তারা নিযামকে কর দিত স্বাধীন রাজা হিসেবে নয় বরং মোগল সম্রাটের নিযুক্ত সুবেদার হিসেবে। তাদের ওপর দাক্ষিণাত্যের সুবেদারের কর্তৃত্ব কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে দাবীও করা হয়নি, তারাও তা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি। সরকারের প্রশাসনকি কাঠামোতেও সম্রাটের এই আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব বজায় রাখা হয়। নিযামের সাথে মোগল সম্রাটের একজন সেক্রেটারী থাকতো। তাকে শাহী সেক্রেটারী [illegible] হতো। কিন্তু এই সেক্রেটারীকে নিযাম স্বয়ং নির্বাচন করতেন। [illegible] তার কোন হাত থাকতো না। নিযাম যাদেরকে কোন ভূমি বরাদ্দ [illegible] পুরস্কার বা পদবী প্রদান করেন, মোগল সম্রাটের পক্ষ থেকে তার [illegible] পত্র লিখে দেয়াই তার একমাত্র কাজ ছিল। মোটকথা, মোগল সাম্রাজ্য [illegible] আসফিয়া রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক এরূপ ছিল যে, তাকে পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য বলা যায় না, আবার যথার্থ অংগরাজ্য বলেও অভিহিত করা চলে না। সম্পর্কটা ছিল এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী একটা অস্পষ্ট অনির্ধারিত অবস্থার নামান্তর। সে অবস্থার কোন অকাট্য আইনগত বা সাংবিধানিক রূপ ছিল না। তবে সামগ্রিকভাবে এ অবস্থাটা স্বাধীনতার সাথে অধিকতর সংগতিশীল ছিল। অংগরাজ্য হিসেবে তার অবস্থান ছিল নিতান্তই নামসর্বস্ব। মনে হয় কেন্দ্র ও অংগরাজ্যের মধ্যে এই মর্মে একটা মনস্তাত্বিক সমঝোতা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল যে, কেন্দ্র নিছক নিজের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব মেনে নেয়াতেই সন্তুষ্ট থাকবে, কেননা কার্যত সেই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার ক্ষমতা তার ছিল না, আর অংগরাজ্য তাঁর হাতে যে বাস্তব ও সত্যিকার স্বাধীনতা রয়েছে তা নিয়েই খুশী থাকবে, যেহেতু স্বীয় স্বাধীনতাকে জাহির করার নৈতিক বল ও সাহস এবং অধিনতার কলংক ধুয়ে মুছে ফেলার ক্ষমতা তার ছিল না। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে মোগল সাম্রাজ্যের আওতায় নিযাম শাসিত দাক্ষিণাত্য রাজ্য ওরফে আসফিয়া রাজ্যের

অবস্থান ছিল তুরস্ক কেন্দ্রিক ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের আওতায় মিসরের খদীভ মুহাম্মদ আলী পাশার এবং আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অবক্ষয় যুগে ইরান, খোরাসান এবং মাওয়ারাউন্নাহ (মধ্য এশিয়ার বোখারা, সমরকন্দ ও তদসন্নিহিত অঞ্চল, যা বর্তমানে বিচ্ছিন্নতাকামী সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র উজবেকিস্তানের অন্তর্গত) প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকদের অনুরূপ।

দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সাথে দ্বন্দ্ব

মুবারেজ খান ও তার পুত্রদের শক্তি নির্মূল ও হায়দারাবাদ প্রদেশকে পুরোপুরিভাবে আপন কর্তৃত্বাধীন করার পর নিযামুল মুল্‌ক যে বিষয়টির প্রতি সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করেন তা ছিল নিজের রাজ্যের জন্য এমন একটি অঞ্চল সংরক্ষণ করা, যা হবে বহিরাগত হুমকি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। আওরংগাবাদ, বেদার ও বিজাপুর ছিল মারাঠাদের নিকটবর্তী এবং এসব অঞ্চলে মারাঠা হানাদার দস্যুরা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর কোন একটি অঞ্চলকেও রাজ্যের রাজধানী বানানো ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। এজন্য তিনি হায়দারাবাদকেই মনোনীত করেন এবং এ প্রদেশটিতে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের অবাধ্য জমীদারদেরকে তিনি সৈন্য পাঠিয়ে বলপ্রয়োগে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। অন্য যেসব অঞ্চলে দুষ্কৃতিকারী গোষ্ঠীগুলো নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছিল, সেখানে থানা স্থাপন করে গোলযোগ নির্মূল করেন। মুবারেজ খান স্বীয় সুবেদারীর আমলে হায়দারাবাদে হোসেন আলী খানের মারাঠাদের সাথে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি মানেননি এবং স্বীয় শাসনাধীন হায়দারাবাদ প্রদেশ থেকে মারাঠাদের একচতুর্থাংশ রাজস্ব দেননি। মারাঠারা সামরিক বলপ্রয়োগ করে এই প্রাপ্য আদায়ের যত চেষ্টা করেছে, মুবারেজ খান দৃঢ়তার সাথে তা প্রতিরোধ করেছেন এবং বহুবার তাদেরকে পরাজিত করেছেন। এ কারণে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য প্রদেশের মত হায়দারাবাদ প্রদেশে মারাঠাদের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ প্রদেশকে মারাঠাদের হানাদারী থেকে পুরোপুরি রক্ষা করা মুবারেজ খানের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কেননা মারাঠারা নিজেদের জাতীয় রণকৌশল অনুসারে এ প্রদেশের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিনিয়ত রাহাজানি ও লুটতরাজ চালিয়ে তারা সড়কগুলোকে এমন বিপদসংকুল করে তুলেছিল যে, বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। জমীদার ও সাধারণ প্রজাদের কাছ থেকেও তারা যেখানে পারতো এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ রাজস্ব আদায় করে নিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রাজস্ব আদায় চুক্তির নির্ধারিত হার ছাড়িয়ে যেত। নিযামুল মুল্‌ক এই উপদ্রবের মুলোৎপাটনের জন্য বাজিরাওকে বাদ দিয়ে তার প্রতিনিধি শ্রীপাতরাও এর সাথে আলাপ আলোচনা চালালেন। এই ব্যক্তির সাথে বাজিরাও এর মনকষাকষি সুবিদিত ছিল। তার মাধ্যমে তিনি রাজা সাহুর সাথে এই মর্মে

সমঝোতা করেন যে, আগামীতে হায়দারাবাদ প্রদেশে মারাঠাদের সরাসরি কোন ধরনের রাজস্ব আদায়ের অধিকার থাকবে না। পেশোয়ার মোতায়েনকৃত রাজস্ব আদায়কারীদেরকে প্রত্যাহার করা হবে এবং এসব রাজস্বের পরিবর্তে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক চাঁদা সরকারী কোষাগার থেকে দেয়া হবে।[১] এই সমঝোতায় রাজা সাহুকে সম্মত করার জন্য নিযামুল মুল্ক তাকে বেশ কয়েকটা সুবিধা দেন। ইন্দপুরের নিকটে তাকে একটি জমি বরাদ্দ দেন। প্রতিনিধিকেও আরো একটা জমীর বন্দোবস্ত দেন। ইতিপূর্বে সাহুর প্রতিদ্বন্দ্বী সরদার রম্ভজী বনালকর (রাওজী)-কে পুনার কাছে যে জমী বরাদ্দ দিয়েছিলেন তা মওকুফ করে কিরিমলার কাছে তাকে অন্য একটা ভূসম্পত্তির বন্দোবস্ত দেন।

বাজিরাও এ সমঝোতার তীব্র বিরোধিতা করে। এ সমঝেতা তার অজ্ঞাতসারে এবং তার শত্রু শ্রীপাতরাও এর সম্মতিক্রমে সম্পাদিত বলেই শুধু নয়, বরং বাজিরাও এর মতে মোগলদের সাথে লেনদেনের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট নিস্পত্তি করা মারাঠা স্বার্থের প্রতিকূল ছিল বলেই সে এর বিরোধিতা করে। সে মনে করতো, দেনাপাওনা অস্পষ্ট রাখা ও বিরোধকে তালগোল পাকানো অবস্থায় রেখে দেয়াতে সুবিধা ছিল যে, যেখানে মোগলরা দুর্বল এবং মারাঠা শক্তি সবল হবে, সেখানে যতটা সম্ভব বাড়তি রাজস্ব আদায় করা যাবে। তাছাড়া সে এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশের পরিবর্তে নির্ধারিত পরিমাণ বার্ষিক চাঁদা নেয়ার পক্ষপাতী ছিল না। কেননা সে মনে করতো যে, মোগল শাসিত অঞ্চলে মারাঠাদের নিয়োজিত সার্বক্ষণিক আদায়কারী বিদ্যমান থাকা এবং আদায়ের নামে মারাঠা বর্গীদের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার অর্থ ছিল এই যে, ঐসব অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে মারাঠা শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে করে দেশের যেখানে যেখানে মোগল নিয়ন্ত্রণ শিথিল হবে, সেখানে মারাঠাদের অবাধে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে—এরূপ সম্ভাবনা প্রবল ছিল।

এসব কারণে বাজিরাও উক্ত সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করলো। পক্ষান্তরে প্রতিনিধি তা বহাল রাখার জন্য জিদ ধরলো। এ ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে তীব্র বিবাদ দেখা দিল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে এ বিরোধ প্রকাশ্য রূপ নিল। নিযামুল মুল্ক এই বিরোধের সুযোগ গ্রহণের জন্য পুরোমাত্রায় প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বাজিরাওয়ের মোকাবিলায় কুলহাপুরের রাজা শম্ভুজীকে মাঠে নামিয়ে দিলেন এবং চন্দ্রসেন যাদু, রাওজী বনালকার ও অন্যান্য মারাঠা সরদারদেরকে শম্ভুজীর সাহায্যে লেলিয়ে দিলেন। চন্দ্রসেনের মাধ্যমে শম্ভুজী দাক্ষিণাত্যের সুবেদারের দরবারে এই মর্মে মামলা দায়ের করলো যে, সাতারা ও কুলহাপুর উভয় জায়গার শাসক পরিবার শিবাজীর উত্তরাধিকারে সমান অংশীদার।

---

১. এই সমঝোতার বিস্তারিত বিবরণ কোন ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায় না। মুনতাখাবুল লুবাব ও হাদিকাতুল আলম নামক পুস্তক দু'টিতে শুধু এর সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোর এক-দশমাংশ ও এক-চতুর্থাংশ রাজস্বে কুলহাপুরের শাসক পরিবারের সমান অংশ প্রাপ্য। সুবেদার প্রচলিত আইন অনুসারে, রায় দিলেন যে, মামলার নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত পক্ষকে (বাজীরাও) এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ রাজস্ব আদায় থেকে বিরত রাখা হোক। রায় অনুসারে সকল এলাকা থেকে সাহুর আদায়কারীদেরকে হটিয়ে দেয়ার নির্দেশ জারী করা হলো।

এবার বাজিরাও এর পক্ষে আত্মসংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়লো। অবশ্য বর্ষার মওসুম শেষ হওয়া নাগাদ ধৈর্য ধারণ না করে উপায় ছিল না। অতপর ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে সে সৈন্যসামন্ত নিয়ে লোকালয় তছনছ করে ও ব্যাপক লুটতরাজ চালাতে চালাতে জালনা অভিমুখে অগ্রসর হলো। ওদিক থেকে নিযামুল মুল্ক তার মোকাবিলার জন্য এগিয়ে এলেন। জালনার উপকণ্ঠে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর বাজিরাও লাহোরের দিকে পালালো। পুনরায় আওরংগাবাদের ভেতর দিয়ে খান্দেশের দিকে অগ্রসর হলো। এ সময়ে সে সর্বত্র রটিয়ে দিল যে, সে বুরহানপুর ধ্বংস করতে যাচ্ছে। নিযামুল মুল্ক বুরহানপুরকে রক্ষা করতে যাত্রা করলেন। কিন্তু অজন্তার পার্বত্যাঞ্চলে পৌছে জানতে পারলেন যে, পেশোয়া লুটতরাজ করতে করতে গুজরাটের দিকে গেছে। তিনি তার পিছু নিয়ে সুরাট পর্যন্ত গেলেন। কিন্তু তার নাগাল পেলেন না। মারাঠাদের হালকা সেনাদল যেরূপ ক্ষীপ্র গতিতে ছুটতো, সে তুলনায় মোগলদের ভারী অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম বাহী বাহিনীর গতি ছিল মন্থর। পেশোয়ার এই দুরন্ত চলাফেরা রোধ করা নিযামের পক্ষে কঠিন ছিল। তাছাড়া যথাসাধ্য প্রকাশ্য ময়দানে নিয়মিত সেনাবাহিনীর মুখোমুখী হওয়ার ঝুঁকি এড়িয়ে দেশের আনাচে কানাচে আকস্মিক গেরিলা হামলা চালিয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর মাধ্যমে সরকারী সৈন্যকে বিব্রত করা মারাঠাদের চিরাচরিত যুদ্ধরীতি ছিল। এই যুদ্ধরীতিকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য নিযামুল মুল্ক সুরাট থেকে সোজা পুনা অভিমুখে রওনা করলেন। ভাবলেন, মারাঠাদের মূল আবাসভূমি বিপন্ন হয়ে উঠলে তারা বাধ্য হয়ে তা রক্ষা করতে আসবে। এভাবে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি আহমদ নগর পর্যন্ত পৌছার আগেই মারাঠারা তার বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেললো। অতপর তাদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে দিল।[১] তাদের দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্যরা ছোট ছোট সেনাদলের আকারে

---

১. মারাঠাদের এই রণকৌশল ঐতিহাসিক ওরামের (Orme) বর্ণনায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি ঐ সময় উপদ্রুত অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন এবং এ ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ স্বচোক্ষে দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"মারাঠা বাহিনীর প্রধান শক্তি তার বিপুল সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য। এই সৈন্যরা পরিশ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতায় এবং বাধাবিপত্তি অতিক্রমের ক্ষমতায় ভারতের অন্য সকল বাহিনীর চেয়ে অগ্রগামী। জনশ্রুতি আছে যে, তাদের বড় বড় সেনাদল একদিনে ৫০ মাইল পর্যন্ত পথ ধাওয়া করে চলে যায়।

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। রসদ আগমনের পথ বন্ধ করে দিল। জংগলে পশুর খাওয়ার ঘাস, ক্ষেতের ফসল ও আশপাশের গ্রাম-গঞ্জ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুটপাট করে এক লোমহর্ষক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত করলো। এসব কারসাজিতে মোগল বাহিনী খাদ্য সংকটের কবলে পড়লো। তারা যেখানে মোগল সৈন্যদের সংখ্যাধিক্য দেখলো সেখান থেকে ছুটে পালালো। আর যেখানে ছোট খাট বাহিনী পেল সেখানে হামলা চালিয়ে লুটপাঠ করে চম্পট দিল। নিযামুল মুল্‌ক কাঁটা দিয়ে কাঁটা খসানোর কৌশল অবলম্বন করলেন এবং তিনি তাঁর মারাঠা মিত্র চন্দ্রসেনকে বাজিরাও এর দস্যুপনার জবাব দস্যুপনার মাধ্যমে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু চন্দ্রসেনের বাহিনী মোগল সৈন্য ও মারাঠা সৈন্যের জগাখিচুড়ি ছিল। তারা দস্যুপনায় দক্ষ ছিল না। অপর মিত্র শম্ভুরাও এর সৈন্যরা বাজিরাও এর লোকদের সাথে যোগসাজশে লিপ্ত ছিল। ফলে সেও কোন কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলো না। অবশেষে নিযামুল মুল্‌ক যখন যথেষ্ট পরিমাণে দিশেহারা হয়ে পড়লেন, তখন বাজীরাও আজদুদ্দৌলা আওজ খানের মাধ্যমে সন্ধি প্রস্তাব পাঠালো। এই সন্ধি প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) শম্ভুজীকে বাজীরাও এর হাতে সমর্পণ করতে হবে।

(২) আগামী থেকে মারাঠাদেরকে রাজস্বের পুরো অংশ দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

(৩) যে অংশ এ যাবত বাকী পড়েছে তা দিতে হবে।

নিযামুল মুলক শেষোক্ত শর্ত দু'টো মেনে নিলেন এবং প্রথমটি প্রত্যাখ্যান করলেন। শেষ পর্যন্ত এই মর্মে নিষ্পত্তি হলো যে, নিযামুল মুল্‌ক শম্ভুজীকে পানহাল্লা পর্যন্ত নিজ হেফাজতে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবেন। এরপর রাজা সাহু তার সাথে যে আচরণ করতে চায় করতে পারবে। এভাবে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দ

(পূর্বে পৃষ্ঠার পর) সম্মুখ সমরে প্রচলিত মারামারি তারা সবসময় এড়িয়ে চলে। যুদ্ধে তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে শত্রুর দেশের সর্বোচ্চ পরিমাণে ক্ষতি সাধন করা। এ উদ্দেশ্যে তারা কখনো জীব-জানোয়ার হাকিয়ে নিয়ে যায়। কখনো ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করে। কখনো লোকালয় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে এবং এমন জুলুম নির্যাতন চালায় যে, অরক্ষিত এলাকার জনসাধারণ তাদের আগমনের প্রথম খবর শুনতেই ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারা এত ক্ষীপ্র গতিতে চলাফেরা করে যে, শত্রু পক্ষ তাদের ওপর কোন চূড়ান্ত আঘাত হানার সুযোগ প্রায়ই পায় না। এমনকি তাদের কোন নির্দিষ্ট সেনাদলের ওপর কার্যকর আক্রমণ চালানোও সম্ভব হয়ে ওঠে না। যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষকে একটা বিরাট বাহিনী নিয়ে প্রতীক্ষারত থাকার নিষ্ফল ব্যয়ভার বহন এ ধরনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধের সুযোগ পর্যন্ত না পাওয়া এবং সাধারণ লোকালয়ে তাদের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালানোর ফলে অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতি—এসব কার্যকারণ একত্রিত হয়ে এমন এক দুঃসহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, তাদের সাথে লড়াইরত সরকারগুলো তাদেরকে টাকা-পয়সা দিয়ে আপদমুক্ত হতে সহজেই রাজী হয়ে যায়। মারাঠারা কখনো কখনো নিজেদের ছোট ছোট সেনাদল এমনকি গোটা বাহিনীকেও ভাড়া দেয়। কিন্তু তাদেরকে ভাড়ায় খাটানো নিরাপদ নয়। কেননা যে কোন মুহূর্তে প্রতিপক্ষ কোন লোভনীয় প্রস্তাব দিলেই যে তারা তা লুফে নেবে এবং ভাড়ার চুক্তিতে যে মিত্রের পক্ষে লড়াই করছে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রতিপক্ষের সাথে মিলিত হবে —এটা প্রায় অবধারিত। তাছাড়া যে এলাকার নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে ভাড়া করা হয়, তারা সেখানেও লুটতরাজ চালাতে দ্বিধা করে না।"(ওরাম, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪০)

মোতাবেক ১১৪১ হিজরী সনে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হলো। নিযাম ও বাজীরাও প্রথমবারের মত পরস্পরে মিলিত হলেন এবং উভয়ে উভয়কে ভোজ দিলেন। এরপর দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলোতে পুনরায় মারাঠা আদায়কারীরা নিয়োজিত হলো। তবে হায়দারাবাদ প্রদেশ সম্পর্কে নিযামুল মুল্‌ক ও রাজা সাহুর মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তা বহাল থাকলো।

এবার পুনার রাজনৈতিক দিকপালরা অনুভব করলো যে, কুলহাপুর রাজ্যের শক্তি খর্ব করা দরকার। নচেৎ দাক্ষিণাত্যের সুবেদার তাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকবে। পরের বছরই তারা শম্ভুজীর সাথে যুদ্ধ করলো এবং ভারনা নদীর কিনারে তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিতাড়িত করলো। এ যুদ্ধে স্বয়ং তারাবাই ও তার পুত্রবধু রাজেস বাই গ্রেফতার হলো। এ জন্য শম্ভুজী একেবারেই অসহায় হয়ে পড়লো এবং ১৭৩০ সালে সে রাজা সাহুর সাথে এক মর্মে চুক্তি সম্পাদন করলো। চুক্তি অনুসারে তাকে কুলহাপুরের ক্ষুদ্র রাজ্যটি ছাড়া বাদবাকী সব মারাঠা অধিকৃত এলাকার দাবী ছেড়ে দিতে হলো। এভাবে মারাঠাদের এক গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার একটা মোক্ষম উপায় নিযামুল মুল্‌কের হাত ছাড়া হয়ে গেল।

শম্ভুজীর দাপট চূর্ণ হওয়ার দরুন দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ভারসাম্যের যে ক্ষতি সাধিত হলো, তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য নিযামুল মুলক অন্য একটি শক্তিকে কাজে লাগানোর সংকল্প নিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তিনি অকৃতকার্য হলেন। তৎকালে গুজরাটে কয়েকজন মারাঠা সরদার মোগল সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এসব যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে তারা যে এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ রাজস্ব লাভের নিশ্চয়তা অর্জন করে, তা বাজীরাও তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। এতে ঐ সরদাররা তেলে বেগুনে জ্বলতে থাকে এবং প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা আঁটিতে থাকে। এদের মধ্যে বাজীরাও এর সবচেয়ে কট্টর বিরোধী ছিল ত্রিমবাকরাও ভারে। পীলাজী গেকোয়াড় কাণ্ডজী, ঘোজী ভাণ্ডে, ভাজী পোদ্দার এবং আরো কয়েকজন মারাঠা সরদার তার পক্ষ নিয়েছিল। নিযামুল মুল্‌ক ত্রিমবাকরাও এর সাথে পত্রলাপ শুরু করলেন। অবশেষে উভয়ের মধ্যে এই মর্মে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলো যে, গুজরাটের দিক থেকে ত্রিমবাক রাও এবং হায়দারাবাদের দিক থেকে নিযামুল মুল্‌ক সসৈন্যে অগ্রসর হবেন। অতপর বাজীরাও এর ওপর সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালানো হবে। অন্যদিকে নিযামুল মুল্‌ক মালোহের সুবেদার মুহাম্মদ খান বংগেশের সাথেও পত্রালাপ করলেন এবং তাকে নর্বদার উপকূলে এক স্থানে সাক্ষাতের জন্য ডাকলেন। ১১৪৪ সালের রমযান মোতাবেক ১৭৩১ সালের এপ্রিল মাসে আকবারপুরের উপত্যকায় উভয়ের সাক্ষাত হয়। ১২ দিন ব্যাপী আলাপ আলোচনার পর তারা পেশোয়ার বিরুদ্ধে মারাঠা সরদারদের সাথে মিলিত হয়ে একটা সম্মিলিত অভিযান চালানোর নীল নক্‌শা তৈরী করলেন। কিন্তু ত্রিমবাক

রাও এই সামরিক নীল নকশা সম্পর্কে অবগত ছিল না। সে সময় হওয়ার পূর্বেই ৩৫ হাজার সৈন্য নিয়ে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করলো।[১] কোন এক উপায়ে বাজীরাও এই যোগসাজশের খবর জেনে ফেললো এবং সে স্থির করলো যে, উভয় মিত্রের সম্মিলিত হওয়ার আগেই ত্রিমবাক রাওকে শেষ করে দিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সে অবিলম্বে গুজরাট রওনা হলো। ১১ই এপ্রিল ১৭৩১ তারিখে বরোদা ও দিভুয়ীর মধ্যবর্তী ভিলাপুর নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ সময় ত্রিমবাকরাও একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা যায়। তার মৃত্যুর সংগে সংগেই তার সৈন্যরা হতাশ হয়ে পড়ে। বড় বড় সেনাপতিরা হয় মারা পড়লো, নয় ধরা পড়লো, নয় পালালো। এভাবে এত বড় বাহিনী ক্ষণেকের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এ ঘটনায় নিযামুল মুল্কের সমগ্র নীলনক্শা মুখ থুবড়ে পড়লো। মারাঠাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে নিজ ভূখণ্ডকে যে তাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করবেন, সে সুযোগ আর রইল না। এরপর তার হাতে মাত্র দু'টো বিকল্প অবশিষ্ট রইল। একটি হলো, মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং তাদের শক্তি খর্ব না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া। অপরটি হলো, তাদের সাথে এমন কোন চুক্তি সম্পাদন করা, যার লাভজনক শর্তাবলীতে আশ্বস্ত হয়ে তারা দাক্ষিণাত্যের শান্তি শৃংখলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে। প্রথম পন্থা অবলম্বনে নিযামুল মুল্ক প্রস্তুত ছিলেন না। কেননা সে সময়ে উপর্যোপরি গোলযোগ, বিশৃংখলা ও অশান্তির কারণে দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলোর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থা দিন দিন চরম অবনতির দিকে ধাবমান ছিল। এমতাবস্থায় মারাঠাদের সাথে একটা দীর্ঘস্থায়ী চূড়ান্ত যুদ্ধ চালানোর মত শক্তি ও সামর্থ তার ছিল না বললেই চলে। এ পরিস্থিতিকে শুধরানোর জন্য নিযামুল মুল্কের কয়েকটি নিরুপদ্রব বছর আবশ্যক ছিল এবং সেটা প্রথমোক্ত সামরিক সমাধানের পন্থা বাদ দিয়ে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করলেই অর্জিত হতে পারতো। এ উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায় বাজীরাওয়ের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। অবশেষে উভয়ের মধ্যে এই মর্মে একটা গোপন সমঝোতা হয় যে, বাজীরাও যদি দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলোকে কোন রকম উত্যক্ত না করে, তাহলে উত্তর ভারতে রাজ্য সম্প্রসারণে তাকে নিযামুল মুল্ক কোন রকম বাধা দেবেন না।[২] নিযামুল মুল্কের নিজের ভাষায় তার বক্তব্যটি মায়াসেরে নিযামী গ্রন্থে নিম্নরূপ উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

---

১. রাওভারে পরিবারের ইতিহাসে ত্রিমবাক রাও এর সৈন্য সংখ্যা মাত্র ৫ হাজার উল্লেখ করা হয়েছে। বাজীরাও এর এক চিঠিতে ৩০ হাজার উল্লেখ রয়েছে।

২. ঐতিহাসিক গ্রান্ট ডোক এবং সিয়ারুল মুতায়াখ্খিরীনের লেখক এই সমঝোতার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মায়াসেরে নিযামী গ্রন্থে এর সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত আমি এ তথ্য বিশ্বাস করতে পারিনি। কেননা এ গ্রন্থের লেখক স্বয়ং নিযামুল মুলকের কর্মচারী ছিলেন এবং এই কথাবার্তা তার চোখের সামনেই সংঘটিত হয়।

"ইনশাআল্লাহ্ নর্বদার ওপারে রাজ্য সম্প্রসারণের বিষয়টি ওদের হাতেই ছেড়ে দেব এবং ওদের সৈন্যরা আমার শাসনাধীন অঞ্চলে চলাচল করবে না।" (মায়াসেরে নিযামী, পৃঃ ৮৫)

এই প্রথমবারের মত আমরা নিযামুল মুল্‌ককে মোগল সাম্রাজ্যের স্বার্থের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখতে পাই। নিযামুল মুল্‌কের অনুসৃত এই কর্মপন্থা যে সে সময় দাক্ষিণাত্যের স্বার্থের অনুকূলে ছিল, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু নৈতিকতা ও সততার দৃষ্টিতে তিনি যতক্ষণ মোগল সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করেন এবং মোগল সম্রাটের সুবেদারগিরি প্রকাশ্যে বর্জন না করেন, ততক্ষণ তার পক্ষে দাক্ষিণাত্য তথা নিজের শাসিত রাজ্যের স্বার্থের খাতিরে সাম্রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থকে জলাঞ্জলী দেয়া কোন ক্রমেই বৈধ ছিল না। মারাঠাদেরকে তিনি যখন উত্তর ভারতের দিকে আগ্রাসন চালানোর ছাড়পত্র দিচ্ছিলেন, তখন তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, মুহাম্মদ শাহ এবং তার সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউই উত্তর ভারত তো দূরের কথা, খোদ রাজধানীকে পর্যন্ত মারাঠাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার যোগ্যতা রাখতো না। এমতাবস্থায় এ ধরনের সমঝোতার যে পরিণাম অনিবার্যভাবেই দেখা দেয়ার আশংকা ছিল এবং এর যে ফলাফল বাস্তবেও দেখা দিয়েছিল, নিযামুল মুল্‌কের ন্যায় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তির পক্ষে সেটা পূর্বাহ্নে বুঝতে না পারার কথা নয়। এজন্য আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে গত্যান্তর থাকে না যে, সে সময় নিজ রাজ্য রক্ষার অভিলাস নিযামুল মুল্‌কের দৃষ্টিতে এত প্রাধান্য পেয়েছিল যে, তার খাতিরে তিনি গোটা সাম্রাজ্য ও নর্বদার অপর পারের রাজ্যগুলোর ওপর ভয়াবহ দুর্যোগ ও ধ্বংসের বিভীষিকা নেমে আসা সুনিশ্চিত জেনেও তা মেনে নিয়েছিলেন।

উত্তর ভারতের পরিস্থিতি

উপরোক্ত সমঝোতার পর উত্তর ভারতে যে ঘটনাবলী সংঘটিত হয়, এবার আমরা সেদিকে দৃষ্টি দেব। এ ঘটনাবলীর দরুন শেষ পর্যন্ত নিযামুল মুল্‌ককে পুনরায় নিখিল ভারতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। তবে কারণ ও ফলাফলের ধারাবাহিকতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য নিযামুল মুল্‌কের মন্ত্রীত্বের অবসান এবং দাক্ষিণাত্যে তাঁর স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নর্বদার অপর পারের পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তার ওপর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিযামুল মুল্‌ক স্বীয় মন্ত্রীত্বের আমলে মালোহ ও গুজরাটের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং এই দুই প্রদেশের শাসন ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছিল। তিনি বিদ্রোহ নির্মূল করার পর গুজরাটে স্বীয় চাচা হামেদ খানকে এবং মালোহে স্বীয় ফুফাতো ভাই আজীমুল্লাহ খানকে স্বীয় ভারপ্রাপ্ত সুবেদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি যখন

সম্রাটের ওপর রাগ করে দাক্ষিণাত্যে চলে গেলেন এবং মুবারেজ খানকে পরাস্ত করে দাক্ষিণাত্য করায়ত্ব করে নিলেন, তখন সম্রাট তাকে মালোহ ও গুজরাটের সুবেদারী থেকে অপসারণ করলেন। অতপর গুজরাটে সারবলন্দ খান তুনীকে এবং মালোহে রাজা গিরিধর বাহাদুর নাগরকে সুবেদার নিযুক্ত করলেন। তাছাড়া মান্দো ও দোহার দুর্গের রক্ষকের পদ থেকে নিযামুল মুল্কের কর্মচারী আবুল খয়ের খানকে অপসারিত করে কুতুবদ্দীন আলী খান নিকোরীকে নিয়োগ করেন। আজীমুল্লাহ খান ও আবুল খয়ের প্রতিরোধ করতে চাইলে মুহাম্মদ শাহ আজীমুল্লাহ খানকে আজমীরের মূল সুবেদারী দিয়ে রাজী করেন এবং আবুল খয়েরকে নিযামুল মুল্ক নিজের কাছে ডেকে নেন। এভাবে মালোহ থেকে অবাধে নিযামুল মুল্ককে উৎখাত করা গেলেও গুজরাটে হামেদ আলী খানের সাথে মোগল কর্মচারীদের সংঘর্ষ ঘটে যায়। এই সংঘর্ষ থেকেই এমন বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়, যা পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে উত্তর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়বড়ে করে দেয়।

সারবলন্দ খান গুজরাটের সুবেদারীর নিয়োগপত্র পাওয়ার পর শাজায়াত খানকে নিজের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত সুবেদার নিয়োগ করে এবং হামেদ খানকে উচ্ছেদ করে গুজরাট প্রদেশে শান্তিশৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়। শাজায়াত খান ছিল হায়দার কুলি খানের শিষ্য এবং হামেদ খানের সাথে তার আগে থেকেই বিরোধ ছিল। ভারপ্রাপ্ত সুবেদারী পাওয়া মাত্রই সে হামেদ খানকে রাজধানী ত্যাগ করার চরমপত্র দিল। সে স্বীয় ভাই রুস্তম আলী খানকে সুরাটের শাসক নিয়োগ করলো। রুস্তম নিযামুল মুলকের নিযুক্ত শাসককে সুরাট থেকে বহিষ্কার করলো। অনুরূপভাবে গুজরাটের সচিব পদ থেকেও নিযামুল মুলকের নিযুক্ত সচিবকে হটিয়ে দিল। হামেদ খান রাজধানী খালী করে দেয়ার জন্য কিছু সময় চাইল। কিন্তু শাজায়াত খান তার কোন কথায় কর্ণপাত না করে তার ওপর হামলা চালালো। তিন দিন পর্যন্ত প্রতিরোধ করার পর হামেদ খান বাধ্য হয়ে নগরীর কর্তৃত্ব সমর্পণ করে দোহদ নামক স্থানে গিয়ে আত্মগোপন করলো।[১] সেখান থেকে সে নিযামুল মুল্ককে সমস্ত ঘটনা লিখে জানালো। শাজায়াত খানের কারসাজিতে নিযামুল মুল্ক নিদারুনভাবে ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি মারাঠাদেরকে গুজরাটের এক-চতুর্থাংশে রাজস্বের প্রলোভন দিয়ে হামেদ খানকে সাহায্য করতে প্ররোচিত করলেন।[২] সংগে সংগে মারাঠা সেনাপতি কান্তাজী ভাভে পনেরো বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে হামেদ খানের কাছে হাজির হলো। উভয়ে আহমদাবাদের ৪ ক্রোশ দূরে শাজায়াত খানের সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করলো। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে। এরপর হামেদ খান আহমদাবাদ দখল করে প্রকাশ্যে মোগল

---

১. দোহদ আহমদাবাদ থেকে ১১০ মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত।

২. কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হামেদ খান নিজেই মারাঠাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল। এ ক্ষেত্রে নিযামুল মুলকের কোন হস্তক্ষেপের কথা তারা উল্লেখ করেননি।

সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে মোগল কর্মচারী ও তমগা-ধারীদেরকে অপসারণ করে এবং কোষাগারের সমস্ত কাগজপত্র হস্তগত করে। কান্তাজী তাকে যে সাহায্য দেয় তার বিনিময়ে সে মাহী নদীর পশ্চিম তীরের সব কয়টি পরগনার এক-দশমাংশও এক-চতুর্থাংশ রাজস্বের অধিকার তাদেরকে অর্পণ করে। কিন্তু মারাঠাদের ক্ষুধা এতে নিবৃত্ত হয়নি। তারা পাইকারীভাবে আহমদাবাদে লুন্ঠন চালায়। এমনকি হজরত শেখ আহমদের মাজারও তাদের লুন্ঠন থেকে রেহাই পায়নি।

শাজায়াত খানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ ও হামেদ খানকে গুজরাট থেকে বিতাড়ণের জন্য শাজায়াত খানের ভাই সুরাট বন্দরের কর আদায়কারী ও বরোদার শাসক রুস্তম খানকে দিল্লী থেকে নির্দেশ দেয়া হলো। রুস্তম খান এ সময় পীলাজী গাইগোয়ারের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এ নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সে পীলাজীর সাথে আপোষ করলো এবং দুই লাখ রুপিয়া দিয়ে হামেদ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নিজের সহযোগী বানালো। সুরাট থেকে এই দুই মিত্র প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য নিয়ে আহমদাবাদের দিকে অগ্রসর হলো। আহমদাবাদ থেকে ৭০ মাইল দূরে মাহী নদীর তীরে আরাস নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলো। পীলাজী বাহ্যত রুস্তমের পক্ষে ছিল এবং গোপনে নিযামুল মুল্ক তাকে হামেদ খানের সহায়তার প্রতিদানে বড় রকমের পুরস্কারের প্রলোভন দিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে সে রুস্তুম খানেরও সমর্থক ছিল না, হামেদ খানেরও না। বরঞ্চ সে তাকে ডেকে ছিল যে, যে পক্ষ জিতবে তার সাথে মিলিত হয়ে পরাজিত পক্ষের সহায়সম্পদ লোপাট করবে। আবার বিজয়ী পক্ষের কাছ থেকেও বড় রকমের পুরস্কার আদায় করবে। এ জন্য সে রুস্তুম আলী খানের পেছনে পেছনে এক ক্রোশ ব্যবধান বজায় রেখে আসছিল। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যুদ্ধ হলো। হামেদ আলী খান পরাজিত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করলো এবং রুস্তুম আলী বিজয়ী হলো। যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের মারাঠা মিত্ররা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। যুদ্ধ যখন তুমুল আকার ধারণ করলো তখন কান্তাজী স্বীয় মিত্র হামেদ খানের এবং পীলাজী স্বীয় মিত্র রুস্তুম আলী খানের সহায়সম্পদ লুটপাট করলো।

এবার হামেদ খানের সুবেদারীর উচ্ছেদ অবধারিত হয়ে উঠলো। কেননা তার কাছে নিজস্ব কোন শক্তি ছিল না। পক্ষান্তরে তাঁর সাহায্যকারী মারাঠা রুস্তুম খানকে বিজয়ী হতে দেখে পালিয়ে যেতে শুরু করেছিল। কিন্তু সহসা একটা কাকতালীয় ঘটনায় যুদ্ধের ফলাফল পুনরায় পাল্টে গেল। শাজায়াত খানের নিহত হওয়ার খবর শুনে দুই তিন দিন পরেই দাক্ষিণাত্য থেকে বিপুল সংখ্যক মারাঠা সৈন্য মাহী নদী পার হয়ে গুজরাটে হামেদ খানের কাছে

সমবেত হলো। দেখতে দেখতে তার বাহিনীতে ৭০/৮০ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটলো। পীলাজীও এই মারাঠাদের দলে ভিড়ে গেল এবং সকলে চারদিক থেকে রুস্তম আলীকে ঘিরে ফেললো। কয়েক দিনের মধ্যেই তার সমগ্র বাহিনী মারাঠাদের লুটতরাজ ও রাহাজানীতে সর্বস্ব হারিয়ে অনাহারে মরার উপক্রম হলো এবং তাকে ছেড়ে সবাই পালাতে লাগলো। অনন্যোপায় হয়ে রুস্তম আহমদাবাদের দিকে যাত্রা করলো এবং যুদ্ধ করতে করতে কয়েক মাইল দূরে চলে গেল। পথিমধ্যে এক জায়গায় সে বেশামাল হয়ে মোকাবিলা করলো এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করে নিহত হলো। অতপর তার মস্তক ছিন্ন করে আহমদাবাদে পাঠানো হলো এবং জনসমক্ষে তার প্রদর্শনী করা হলো। পীলাজী রুস্তমের একখানা বাহু কেটে বিচ্ছিন্ন করে তা নিজের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল, যাতে তার 'বীরত্বের' স্মৃতি জাগরুক থাকে। মোটকথা, একমাত্র মারাঠাদের সাহায্যে হামেদ খান জয়লাভ করে। এই সাহায্যের বিনিময়ে সে কান্তাজীকে আহমাদাবাদসহ মাহী নদীর পশ্চিম তীরের সকল এলাকার এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব দেয়। আর পীলাজীকে দেয় গুজরাটের উত্তর পশ্চিম দিকের সকল এলাকার এক-চুতর্থাংশ। সুরাট ও বরোদা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। উভয় গ্রুপের মারাঠা সৈন্যরা সমগ্র গুজরাটে ছড়িয়ে পড়ে। এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব ছাড়াও পশু খাদ্য, পারিবারিক কর, নিরাপত্তা কর এবং এ ধরনের বহু রকমারি নামে তারা প্রজাদের ওপর এত কর চাপাতে শুরু করে যে, তার ফলে জনগণের ওপর ধ্বংসের বিভীষিকা নেমে আসে। নাগরিকদের জানমাল ও সম্ভ্রমের ওপর তারা এমন নিষ্ঠুর আক্রমণ চালাতে থাকে যে, হাজার হাজার অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত নাগরিক নিজ নিজ পরিবারকে বেইজ্জতি থেকে বাঁচানোর জন্য নিজ হাতে নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে হত্যা করে। এদিকে হামেদ খান আগের চেয়েও অধিক দুঃসাহসিকতার সাথে মোগল সরকারকে অমান্য করতে থাকে। সে সম্রাটের নিজস্ব খাস জমির লব্ধ অর্থ এবং সম্রাটের ব্যবহারের জন্য বানানো কাপড় চোপড় লোপাট করে দেয়। মোগল শাহীর ধনরত্নের ভাণ্ডার জোরপূর্বক খুলিয়ে তা নিজের কুক্ষীগত করে। প্রদেশের সকল জমি তা সে খাসই হোক কিংবা কারো নামে বরাদ্দ করা জাইগীরই হোক—নিজের ভোগ দখলে নিয়ে নেয় এবং বিত্তশালী নাগরিকদেরকে ধরে ধরে তাদের কাছ থেকে পণ আদায় করে।

দিল্লীতে এসব ঘটনার খবর পৌছলে সারবলন্দ খানকে হানাদার মারাঠা সৈন্য ও বিদ্রোহী হামেদ খানের কবল থেকে গুজরাটকে মুক্ত করার জন্য পাঠানো হয়। তার সাহায্যার্থে ৫০ লক্ষ রুপিয়া এককালীন দেয়া হয় এবং তিন লাখ রুপিয়া মাসিক মঞ্জুরী বরাদ্দ করা হয়। শীর্ষস্থানীয় হিন্দু ও মুসলিম সেনাপতিদেরকে তার সাহায্যে নিয়োগ করা হয়। নাজমুদ্দীন আলী খান, সাইফুদ্দীন আলী খান এবং বারেহার সৈয়দ পরিবারের অন্যান্য বড় বড়

সেনাপতিকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে তার সাথে পাঠানো হয়।[১] এসব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সারবলন্দ খান দিল্লী থেকে রওনা হলো এবং বছরের শেষের দিকে গুজরাটে এসে পৌছলো। যেহেতু হামেদ খানের শক্তি পুরোপুরিভাবে মারাঠাদের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তাই সে এতবড় সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে মাহমুদাবাদের দিকে পালিয়ে গেল এবং মারাঠাদেরকে তার সাহায্যের জন্য আহবান জানালো। তার ক্রমাগত ডাকে সাড়া দিয়ে কান্তাজী যখন এল, তখন সারবলন্দ খানের প্রতিনিধি আহমদাবাদ দখল করে নিয়েছে। কান্তাজী আসার সাথে সাথেই হামেদ খান আহমদাবাদের ওপর আক্রমণ চালালো। কিন্তু নগরবাসী তখন তার শাসন মানতে প্রস্তুত ছিল না। তারা তার বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ রচনা করলো। হামেদ খানের নিজের সৈন্যরা বেতন না পেয়ে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়লো। গুজরাটবাসীর মধ্যে যারা ইতিপূর্বে তার পক্ষে ছিল, নয়া সুবেদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিরুৎসাহী হয়ে পড়লো। মারাঠারা তো কেবল লুটপাটের ধান্ধায় ছিল, নিয়মিত যুদ্ধে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। এমতাবস্থায় যখন জানা গেল যে, সারবলন্দ খান ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে এসে গেছে, তখন হামেদ খান আর সেখানে থাকায় কোন লাভ দেখতে পেল না। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সে গুজরাট থেকে পালিয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে গেল। সেখানে নিযামুল মুল্‌ক তাকে নান্দেড়ের সুবেদার নিযুক্ত করলেন। চার বছর পর সে সেখানেই মৃত্যু বরণ করে।

এভাবে নিযামুল মুল্‌কের যে আধিপত্য দু' বছর আগে নাগাদ আগ্রা ও আজমীরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তা নর্বদা নদী পর্যন্ত সীমিত হয়ে গেল। দু'টো সুপরিসর প্রদেশ মালোহ ও গুজরাট তার হাতছাড়া হয়ে গেল।

এ যাবত নর্বদার অপর পারের মোগল শাসিত অঞ্চলে মারাঠাদের যতটুকু উপদ্রব ও বাড়াবাড়ি হচ্ছিল, তা মারাঠা রাজার পক্ষ থেকে হচ্ছিল না। বিভিন্ন মারাঠা সরদার কেবল লুটতরাজ চালাচ্ছিল। মোগলদের কলহকোন্দলের সুযোগ নিয়ে তারা এতে সফলতা লাভ করেছিল। কিন্তু এক্ষণে নিযামুল মুল্‌ক ও মোগল সম্রাটের প্রকাশ্য বিরোধ, মোগল সাম্রাজ্যের অবনতিশীল পরিস্থিতি এবং গুজরাটে মারাঠাদের সাফল্য দেখে মারাঠা পেশোয়া বাজিরাও এর মনে এরূপ ধারণা জন্ম নিল যে, ভারত থেকে মোগলদের বিতাড়নের এটাই মোক্ষম সুযোগ। সে রাজা সাহুর নিকট আবেদন জানালো যে, উত্তর ভারতে আক্রমণ পরিচালনা করতে এবং মারাঠা রাজ্যের সীমা নর্বদার অপর পারে সম্প্রসারিত করতে তাকে অনুমতি দেয়া হোক। বাজীরাও এর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীপাতরাও এই

---

১. ঐতিহাসিক আবুল কাসেমের বর্ণনা অনুসারে সারবলন্দ খানকে শুধু মারাঠা ও হামেদ খানের কবল থেকে গুজরাটকে মুক্ত করার জন্য পাঠানো হয়নি বরং দাক্ষিণাত্যের ওপর আক্রমণ চালিয়ে নিযামুল মুলককে সেখান থেকে উৎখাত করাও এর উদ্দেশ্য ছিল।

প্রস্তাবের কঠোর বিরোধিতা করলো। সে তাকে একটা বিপজ্জনক ও খামখেয়ালী প্রস্তাব হিসেবে আখ্যায়িত করলো। সে বললো "অনিয়মিত লুটতরাজের কথা আলাদা। এতে মারাঠা রাজার ওপর দোষারোপের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যে মুহূর্তে রাজা তার পেশোয়াকে মোগল এলাকায় আগ্রাসন চালানোর আনুষ্ঠানিক অনুমতি দেবে, তখন সেটা মোগল সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর হবে এবং সে ক্ষেত্রে গোটা ভারত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মারাঠাদের লড়াই করতে হবে। আমাদের সরকার এখনো এতখানি শক্তিও অর্জন করেনি, যা দিয়ে আমাদের দখলীকৃত এলাকায় শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এমতাবস্থায় এত বড় একটি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানো মারাত্মক বোকামী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তোমাদের যদি দেশ জয়ের এত সাধ হয়ে থাকে, তাহলে উত্তর ভারতে হামলা করার পরিবর্তে কর্ণাটকের যেসব এলাকা শিবাজী জয় করেছিলেন, তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করাই উত্তম।" এর জবাবে বাজীরাও এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে সাহুর দাদার বীরত্ব গাঁথা স্মরণ করিয়ে দিল এবং কত শক্তিশালী সম্রাটদের সাথে তার মোকাবিলা হয়েছিল ও কিভাবে তিনি জয় করেছিলেন তা বর্ণনা করলো। অতপর সে ভারতের বিরাজমান পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে মোগলদের ভোগবিলাস প্রীতি, কর্মবিমুখতা ও চারিত্রিক অধোপতনের সাথে মারাঠাদের ক্ষীপ্রতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও শৌর্যবীর্যের তুলনা করলো। অবশেষে সে বললো ঃ

"এখন হিন্দুদের দেশ থেকে এই বিদেশীদের বিতাড়িত করে অমরত্ব লাভ করার মোক্ষম সময় আমাদের কাছে সমাগত। আমরা আমাদের শৌর্যবীর্যকে ভারতের পেছনে ব্যয় করে আপনার শাসনামলেই কৃষ্ণ থেকে অটক পর্যন্ত মারাঠাদের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেব।" একথা শুনে সাহু আবেগের আতিশয্যে বলে উঠলো ঃ "বরঞ্চ হিমালয় পর্বতের ওপর তোমরা ঝাণ্ডা স্থাপন করবে।"

এ ধরনের একাধিক ভাষণ দ্বারা বাজীরাও সাহুর মনে একথা বদ্ধমূল করে দিল যে, ছোট ছোট রাজ্য আক্রমণ করার চাইতে মূল সাম্রাজ্যের ওপর আঘাত হেনে গোটা ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা করায়ত্ব করাই শ্রেয়। সে বললো "ঘুনে ধরা বৃক্ষটির কান্ডের ওপর আঘাত হানাই তো ভালো। ডালপালা ও পত্রপল্লব আপনা আপনিই ঝরে পড়বে।"

শেষ পর্যন্ত শ্রীপাতরাও এর বিরোধিতা হালে পানি পেল না। সাহু বাজীরাওকে উত্তর ভারতে আগ্রাসন চালানোর অনুমতি দিয়ে দিল। এই অনুমতি পাওয়া মাত্রই সে বিভিন্ন মারাঠা সেনানায়ককে নর্বদার অপর পারে মালোহ ও গুজরাটের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিল। গুজরাট, মালোহ, বান্দেল খন্ড, আজমীর, আগ্রা ও এলাহাবাদ প্রদেশগুলোতে একে একে মারাঠাদের

প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। এমনকি তাদের হানাদারীর আগ্রাসী থাবা খোদ রাজধানীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। দশ বছরের মধ্যে তারা নর্বদা থেকে যমুনা পর্যন্ত সমগ্র মধ্য ভারতকে কাঁপিয়ে তুললো। যেহেতু গুজরাট থেকেই এই নতুন আপদের সূচনা, তাই আমরা সর্বপ্রথম এই প্রদেশটির বিবরণ দিচ্ছি।

গুজরাটে মারাঠাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

হামেদ খানের গুজরাট ছেড়ে যাওয়ার পর মারাঠারাও স্বদেশে চলে যায়। সারবলন্দ খানের জন্য এটা ছিল সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সে স্বীয় প্রদেশে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে পারতো। কিন্তু নিজের অধীনস্থ ও সহযোগীদের সাথে গোন্ডগোল করা ও নিজের শক্তি নিজ হাতে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে সে এই সুযোগ নস্যাত করে দেয়। বারেহার সাইয়েদদের সাথে তার দ্বন্দ্ব এতদূর গড়ায় যে, সৈয়দ নাজমুদ্দীন আলী খান তাকে ছেড়ে আজমীর চলে যেতে বাধ্য হয়। সরদার মুহাম্মদ খান, আলী মুহাম্মদ খান বালী এবং অন্যান্য বড় বড় সেনাপতির সাথে একে একে তার কলহ ঘটে। এমনকি তার পুত্র খানাজাদ খান গালেব জং তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে দিল্লী চলে যায়। শীর্ষস্থানীয় বণিক ও সওদাগরদের ওপর জবরদস্তি ও নিগৃহ চালিয়ে সে অর্থ আদায় করে। এভাবে তার ক্রমাগত অত্যাচার ও অনাচারের দরুন তার বিরুদ্ধে বেশ বড় একটা দল গড়ে ওঠে। এহেন বিশৃংখলা ও অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় গুজরাটে মারাঠারা সয়লাবের মত চড়াও হয়। অতপর যথারীতি গণহত্যা ও লুটপাঠ চালিয়ে অল্প ক'দিনের মধ্যেই এই শস্যশ্যামল প্রদেশটিকে তারা বিরাণ করে দেয়। অবশেষে সারবলন্দ খান অতিষ্ঠ হয়ে কান্তাজীকে মাহী নদীর পশ্চিম তীরের আহমদাবাদ শহর ও আহমদাবাদ পরগনা ছাড়া সমগ্র এলাকা থেকে এক-চতুর্থাংশ কর দিতে সম্মত হয়ে যায়। আর গুজরাটে ত্রিম্বক রাওভারের প্রতিনিধি পীলাজী গাইকোয়াড়কে হামেদ খানের দেয়া সাবেক এলাকাগুলোতে এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব প্রদানের নীতি অব্যাহত রাখে।

এ ঘটনার খবর দিল্লীতে পৌছলে মুহাম্মদ শাহ সারবলন্দ খানের এই নতজানু নীতিতে ক্ষুব্ধ হন এবং গুজরাট অভিযানে মাসিক তিন লাখ রুপির যে সাহায্য বরাদ্দ করেছিলেন তা বাতিল করে দেন। সারবলন্দ খান এই সাহায্য ব্যতীত স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে অপারগ ছিল। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সে ছিল একেবারেই আনাড়ী। গুজরাটের মত প্রদেশে তার অপচয় ও অপব্যয়ের বোঝা বহন করতে সক্ষম ছিল না। সরকারের ব্যয়ভার তো দূরের কথা, তার সৈন্যদের বেতন এত বেশী ছিল যে, গুজরাটের আয় দিয়ে তা পরিশোধ করা অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যে ঘাটতি দেখা দেয়, তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য সে আগের চেয়েও

নিষ্ঠুর পন্থায় জনসাধারণের ওপর জরিমানা আরোপ করতে আরম্ভ করে। এভাবে হানাদার মারাঠাদের হাতে দেশের বিপর্যয় ঘটতে যেটুকু বাকী ছিল, তা দেশের রক্ষক ও দায়িত্বশীলের হাতে ষোলকলায় পূর্ণ হয়। এই লুটতরাজেও যখন ঘাটতি পুরন হলো না, তখন সে দরবারের সভাসদদের গুজরাটস্থ সকল জাইগীর বাজেয়াপ্ত করলো। আর এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সভাসদরা সারবলন্দ খানের পাঞ্জাবে অবস্থিত সকল জাইগীর বাজেয়াপ্ত করে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিল। এভাবে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে তার সম্পর্ক ভীষণ তিক্ত হয়ে গেল। অপরদিকে নিজ প্রদেশের জনগণ ও প্রভাবশালী নেতারা তার বিরুদ্ধে চলে গেল।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে নিযামুল মুল্‌ক ও বাজীরাও এর মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। এ জন্য বাজীরাও গুজরাটের প্রতি মনোনিবেশ করতে সক্ষম ছিল না। সারবলন্দ খানের কাছ থেকে এক-চতুর্থাংশ রাজস্বের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল যে কান্তাজী ও ত্রিম্বক রাও ভারে, তারা ছিল বাজীরাও এর বিরোধী পক্ষের রাঘব বোয়াল। এ জন্য তাদের উভয়ের পেছনে আসল মারাঠা রাজার সমর্থন ছিল না। শুধু তাই নয়, বাজীরাও তাদেরকে গুজরাট থেকে উচ্ছেদ করার অভিলাসী ছিল। এ জন্য সে ১৭২৭ ও ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে স্বীয় সেনাপতি ওদাজী এবং ভ্রাতা জামনাজীকে কয়েকবার গুজরাটে পাঠায়। তারা গুজরাটের মোগল কর্মকর্তাদের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানায়। কিন্তু বাজীরাও এর সকল শক্তি নিযামুল মুলকের সাথে লড়াইতে ব্যপৃত হওয়ায় সে গুজরাটে এত সৈন্য পাঠাতে পারেনি, যাতে কান্তাজী ও পীলাজীকে পরাস্ত করা যায়। সারবলন্দ খান যদি বাজীরাও এর প্রেরিত সরদারদ্বয়ের সাথে আঁতাত করে কান্তা ও পীলাজে নিপাত করতো এবং পরে নিযামুল মুলকের সাথে মিলিত হয়ে বাজীরাও এর বিরুদ্ধে লড়াইতে শরীক হতো, তাহলে সেটাই হতো তার জন্যে সবচেয়ে উত্তম ও সময়োপযোগী কর্মপন্থা। কিন্তু সে এই সুযোগটি কোন রকম কাজে লাগাতে পারলো না। সে বরঞ্চ সম্রাটের সাথে নিজ প্রদেশের জনগণ ও কর্মকর্তাদের সাথে এবং পার্শবর্তী প্রদেশের শাসকের (নিযামুল মুল্‌ক) সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও কলহ-কোন্দল করে এই সুযোগ নষ্ট করে ফেললো। অবশেষে ১৭২৯ সালে যখন সর্বপ্রথম বাজীরাও এর সাথে নিযামুল মুল্‌কের সন্ধি হলো এবং বাজীরাও তার সমগ্র শক্তি নিয়ে গুজরাটের উপকণ্ঠে আবির্ভূত হলো, তখন সারবলন্দ খান তার প্রতিরোধে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়লো। সে বাধ্য হয়ে বাজীরাওকে সমগ্র গুজরাট প্রদেশের এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশে রাজস্ব আদায়ের অধিকার দিয়ে দিল।[১]

---

১. এ ব্যাপারে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাতে এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ কর থেকে সুরাট বন্দর ও সুরাট পরগনাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল এবং আহমদাবাদ শহর থেকে মাত্র এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ধার্য হয়েছিল। অন্যান্য শর্তাবলী দাক্ষিণাত্যে হোসেন আলী খান যেরূপ ধার্য করেছিলেন তদ্রূপই ছিল এবং একই হারে রাজস্ব আদায়ের জন্য পেশোয়াকে নিজস্ব আদায়কারী (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সারবলন্দ খানের এই সর্বশেষ কাণ্ডটি শাহী দরবারে তাকে একেবারেই অবিশ্বাসী ও অথর্ব হিসেবে চিহ্নিত করে। পরবর্তী বছরেই সামসামুদ্দৌলা খানে দাওরানের পরামর্শক্রমে মুহাম্মদ শাহ তাকে বরখাস্ত করে দেন। তার স্থলে যোধপুরের শাসক রাজা অভয় সিং রাঠোরকে গুজরাটের সুবেদার নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এই নিয়োগ পূর্ববর্তী নিয়োগের চেয়েও খারাপ হয়েছিল। জনগণের ওপর নিপীড়ন চালানোর ব্যাপারে অভয় সিং সারবলন্দ খানের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। উপরন্তু তার ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে প্রদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ, বিশেষত মুসলিম জনগণ তার কট্টর বিরোধী হয়ে যায়। এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার পাশাপাশি নয়া সুবেদার মারাঠা দমনের যত চেষ্টাই করলো, তাতে সফলতা লাভ করতে পারলো না। আসলে এ কাজে তার পর্যাপ্ত ক্ষমতাও ছিল না। তাছাড়া তার সুবেদারীর আমলের সূচনাতেই ঘটনাপ্রবাহ এমন খাতে মোড় নেয় যে, অভয় সিং এর সাফল্যের যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ যা ছিল, তাও হাতছাড়া হয়ে যেতে লাগলো। অভয় সিং এর গুজরাটে আসার এক বছর যেতে না যেতেই ত্রিম্বক রাওভারে, কান্তাজী ও পিলাজী গাইকোয়াড় নিযামুল মুল্ক ও মুহাম্মদ খান বঙ্গেশ (মালোহের সুবেদার) এর সাথে আঁতাত করে বাজীরাও এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এ যুদ্ধে তারা বাজীরাও এর কাছে এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করে যে, চিরদিনের জন্য তাদের শক্তি নির্মূল হয়ে যায়। অতপর ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে নিযামুল মুল্ক ও বাজীরাও এর মধ্যে এক সমঝোতা হয়। এই সমঝোতার মাধ্যমে বাজীরাও দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করে উত্তর ভারতে বিজয় অভিযান চালানোর প্রতি সর্বাত্মক মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে অভয় সিং এর পক্ষে সারবলন্দ খান কর্তৃক পেশোয়াকে গুজরাটের এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ রাজস্ব প্রদানের চুক্তি নির্বিবাদে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। এতদসত্ত্বেও সে বরোদা ও রাদভুয়ী থেকে মারাঠাদেরকে বিতাড়নের চেষ্টা করে এবং পীলাজীকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করে। তবে তার এ কৌশলও সফল হয়নি। পীলাজীর ভাই মাধাজী তাকে পরাজিত করে বরোদা পুনর্দখল করে নেয় এবং পীলাজীর পুত্র দামনাজী যোধপুরে হামলা চালিয়ে অভয় সিংকে গুজরাট বাদ দিয়ে নিজ রাজ্যের প্রতিরক্ষার কথা ভাবতে বাধ্য করে।[১]

নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সাথে একটি অর্থবহ শর্ত এও রাখা হয়েছিল যে, পেশোয়া গুজরাটে মারাঠাদের উৎপাত রোধ করতে বাধ্য থাকবে। মূলত এ শর্তটা রাখা হয়েছিল ত্রিম্বক রাওভারে, কান্তাজী ও পিলাজীকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে। আর এই শর্তের সূত্র ধরেই পরবর্তী সময়ে মারাঠাদের দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যার উল্লেখ আমি ইতিপূর্বে করেছি।

১. অভয় সিং কিরূপ মুসলিম বিদ্বেষী এবং অত্যাচারী ছিল, কবি আবুল কাসেম সেটা তার এক ফার্সী কবিতায় নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন:

"সে এত জুলুম ও নিপীড়ন চালিয়েছিল, যা ছিল নজীরবিহীন। কাফের শাসকের অত্যাচারে মুসলিম অধ্যুষিত শহরটি এমনভাবে বিরাণ হয়ে গিয়েছিল যে, লেখনী দ্বারা তার বর্ণনা দেয়া দুঃসাধ্য। কুচক্রী রাজপুতরা বহু সংখ্যক মুসলিম শিশুকে পর্যন্ত বন্দী করে রাখে, অতপর (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মালোহ প্রদেশে মারাঠা আধিপত্য

গুজরাটের পর দ্বিতীয় যে প্রদেশটি মারাঠাদের আগ্রাসনের শিকার হয় সেটি ছিল মালোহ। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে নিযামুল মুল্‌ককে অপসারিত করে সম্রাট মুহাম্মদ শাহ রাজা গিরিধর বাহাদুর নাগরকে ঐ প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। নাগরের সুবেদারীর শুরুতেই মালোহে মারাঠা শক্তির আগ্রাসন আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম এসব আগ্রাসী তৎপরতার উদ্দেশ্য লুটপাট ছাড়া আর কিছু ছিল না। এ জন্য বাজীরাও প্রতি বছর রানুজী সিন্ধিয়া, মুখাজী হোলকার, উদাজী পুয়ার ও চামনাজী আপাকে মালোহে পাঠাতো। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজপুতানার হিন্দু গোত্রপতিগণ মোগল শাসকদের উচ্ছেদের জন্য গোপনে মারাঠাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এসব গোত্রপতির পালের গোদা জয় সিং সোয়াই এর ইশারায় ইন্দোরের প্রভাবশালী জমীদার নন্দলাল মন্দালতীও মারাঠাদের সহযোগী হয়ে যায়। এদের সকলের আঁতাতে মারাঠা শক্তির দাপট এত বেড়ে যায় যে, দুই তিন বছরের মধ্যেই তারা সমগ্র মালোহের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মোকাবিলায় গিরিধর বাহাদুরের দুর্বলতার অনেক কারণ ছিল। সে অত্যন্ত অর্থগৃধ্নু ও কৃপণ ছিল। প্রয়োজনের সময় অর্থ ব্যয় করতে সে গড়িমসি করতো। এমনকি সেনাবাহিনীর ব্যয়ও তার কাছে অসহনীয় বোঝা মনে হতো। এ কারণে সে সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিল। তার প্রদেশের বড় বড় সরদারও হয় তার বিরোধী নয় নিরপেক্ষ ছিল। আর কেন্দ্রীয় সরকার ছিল আত্মপ্রসাদের গভীর নিদ্রায় বিভোর। মালোহের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি এবং গিরিধর বাহাদুরের দুর্বলতার কথা জানা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশটির প্রতিরক্ষার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলো না। এই অসম মোকাবিলায় গিরিধর বাহাদুর বেশী দিন টিকতে পারলো না। ১৭২৮ সালে মোতাবেক ১১৪১ সালের জমাদিউল আউয়াল মাসে উজ্জয়িনীর নিকটে সে মারাঠাদের হাতে নিহত হলো। তারপর শাহী সরকার মালোহের প্রতিরক্ষার কাজে তার পুত্র রাজা ভবানী রাম চমন বাহাদুরকে নিযুক্ত করলো। কিন্তু অতীব প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও কোন আর্থিক সাহায্য করলো না। ফলে কয়েক মাসের মধ্যে তার ব্যর্থতাও প্রকট হয়ে পড়লো। অতপর গিরিধর বাহাদুরের চাচাতো ভাই দয়া বাহাদুরকে (সেনারাম নাগরের পুত্র) সুবেদার নিযুক্ত করা হলো। সে মালোহে কঠোরভাবে আইন শৃংখলা বাস্তবায়নের চেষ্টা করলো। কিন্তু শত্রু যখন একেবারে মাথার ওপর এসে পড়ে, তখন কঠোরতার উল্টা ফল ফলে। এক বছর পূর্ণ না হতেই স্থানীয় জমীদাররা তার কঠোরতায় অতিষ্ঠ হয়ে মারাঠাদের সাথে যোগ দেয়। অতপর দোহারের নিকটে তাকে পরাজিত করে হত্যা করে। এ ঘটনা ঘটে ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। জয় সিং সোয়াই এই বিজয়ে বাজীরাওকে অভিনন্দন জানায় এবং তাকে লিখে ঃ

তাদেরকে কুফরীতে দীক্ষিত করে এবং পাকা অমুসলিম বানিয়ে ফেলে। এসব অকথ্য নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হাজার হাজার মজলুম জনতা অশ্রুসিক্ত নয়নে দিল্লী চলে যায়।"

"তুমি মালোহে ধর্ম রক্ষায় চমৎকার অবদান রেখেছ এবং মুসলমানদের দর্প চূর্ণ করে ধর্মের পতাকা উড্ডীন করে দিয়েছ। তুমি আমার সাধ পূর্ণ করেছ।"১

এ সময়ে এলাহাবাদের সাবেক সুবেদার মুহাম্মদ খান বংগেশ দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। জাফর খান রওশনদ্দৌলা এবং রহীমুন্নেসা কোকী মোটা দাগে ঘুষ নিয়ে তাকে মালোহের সুবেদার নিয়োগ করে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। বংগেশ একজন বীর সেনানায়ক ছিলেন। তিনি মালোহ গিয়ে মারাঠাদেরকে একাধিক যুদ্ধে পরাজিত করেন। এক বছরের মধ্যে তিনি মারাঠাদেরকে উজ্জয়িনী, মন্দালিশর এবং দোহার অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন এবং নর্বদার তীরে অবস্থিতি তাদের দুর্গ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেন। আগেই বলেছি যে, এ সময়ে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সাথে নিযামুল মুলকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছিল। এ সময় নিযাম মুহাম্মদ খান বংগেশের সাথে পত্রালাপ করেন। তিনি গুজরাটের মারাঠা সরদারদেরকে বাজীরাও এর বিরুদ্ধে উস্কে দেন। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে নর্বদার তীরে মুহাম্মদ খান বংগেশের সাথে মিলিত হয়ে তাকেও এই জোটে যোগদানে সম্মত করেন। কিন্তু গুজরাটের মারাঠা সরদারদের পরাজয় সমগ্র প্রেক্ষপট পাল্টে দেয়। এ ঘটনার পর নিযামুল মুলক ও বাজীরাও এর মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত এবং গুজরাটে মারাঠাদের আধিপত্য দৃঢ়তর হয়। মুহাম্মদ খান মারাঠাদের প্রতিরোধে একাকী হয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে মারাঠারা দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে মালোহের প্রতি সর্বতোভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সুযোগ পেয়ে যায়। পরবর্তী বছরই বাজীরাও এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মালোহ আক্রমণ করে। সে স্বীয় সেনাপতিদের এক একজনকে ১৫/২০ হাজার করে সৈন্য দিয়ে প্রদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেয় এবং সর্বত্র লুটতরাজ ও হানাহানি করে মুহাম্মদ খানকে এত বিব্রত করে যে, তিনি বিপুল ধন-সম্পদ দিয়ে সাময়িক সমঝোতা স্থাপনে বাধ্য হন। এভাবে নানা কৌশল প্রয়োগ করে মারাঠাদেরকে কোন রকমে সামাল দিয়ে তিনি সম্রাটের কাছে সাহায্য চান। ক্রমাগত চিঠি দিয়ে তাকে জানান যে, বর্তমানে মালোহের ওপর সমগ্র উত্তর ভারতের ভাগ্য নির্ভরশীল। এটি যদি মারাঠাদের দখলে চলে যায় তাহলে দিল্লী আগ্রার কল্যাণ নেই। তিনি একথাও লিখলেন যে, অন্য কাউকে পাঠানো হলে আমি তার অধীনেও কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু মুহাম্মদ খান নিযামুল মুলকের সাথে একজোট হওয়ার যে চেষ্টা করেছিলেন, সেটা সম্রাটের সভাসদদের বিশেষত সামসামুদ্দৌলা খানে দাওরানের দৃষ্টিতে এত বড় অপরাধ

---

১. অনুরূপ অন্য একটি ঘটনায় জয় সিং নন্দলালকে এই বলে অভিনন্দন জানায় যে, "তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কেননা তুমি শুধু আমার কথায় বিশ্বাস করে এবং স্বধর্মের উপকার সাধনের লক্ষ্যে মুসলমানদের নিপাত করেছ এবং সেখানে ধর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছ। তুমি আমার মনের অভিলাস পূর্ণ করেছ।"

ছিল যে, এরপর মুহাম্মদ খান কোনক্রমেই মালোহের সুবেদার পদে বহাল থাকার যোগ্য বিবেচিত হননি। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ খানকে মালোহ থেকে অপসারণ করা হলো। অতপর সামসামুদ্দৌলার পরামর্শক্রমে আগ্রার সুবেদার ও আম্বেরের শাসনকর্তা মহারাজা জয় সিংকে একই সাথে মালোহের সুবেদার নিয়োগ করা হলো।

নয়া সুবেদার এই জয় সিং-এর আস্কারা পেয়েই ইতিপূর্বে মালোহে মারাঠারা আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এরই ষড়যন্ত্রে এ প্রদেশের বড় বড় জমীদার মারাঠাদের দলে ভিড়েছিল এবং এরই চক্রান্তে ক্রমাগত চারজন সুবেদার প্রদেশটির শাসনে অকৃতকার্য হয়েছিল। সে মোগলদের প্রকাশ্য দুশমন ছিল এবং তাদেরকে বিতাড়নের জন্য যে কোন শত্রুর সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে প্রস্তুত ছিল। সে সময়কার সকল ঐতিহাসিক সর্বসম্মতভাবে লিখেছেন যে, জয় সিং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো এবং মারাঠাদের সাথে তার গাঁটছড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয় বরং ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ছিল।[১] এ জিনিসটা সে কখনো লুকিয়ে রাখতেও চেষ্টা করেনি এহেন নাজুক মুহূর্তে এমন ভয়ংকর দুশমনকে দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োগ করা এবং খোদ রাজধানী নগরী থেকে নর্বদা পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তার কর্তৃত্বে সমর্পণ করার একমাত্র অর্থ এটাই ছিল যে, মোগল সাম্রাজ্য নিজেই দেশকে হাতছাড়া করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

বন্দেল খন্ডে মারাঠা আধিপত্যের বিস্তৃতি

জয় সিং এর মালোহের সুবেদার নিযুক্তির পর যে ঘটনাবলী সংঘটিত হয় তা বর্ণনা করার আগে সংক্ষেপে বন্দেল খন্ডের বৃত্তান্ত বর্ণনা করাও জরুরী, যাতে উত্তর ভারতে মারাঠা আগ্রাসনের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক ধারাবাহিকতা দৃষ্টিপথে স্পষ্ট হতে থাকে।

বন্দেল খন্ডে রাজা চতরসাল দাংঘার বিদ্রোহ অনেকদিন যাবত চলে আসছিল। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে যখন মুহাম্মদ খান বংগেশ এলাহাবাদের সুবেদার নিযুক্ত হন, তখন তিনি বন্দেল খন্ডে কয়েকবার আক্রমণ চালান। ক্রমাগত চার বছর যাবত যুদ্ধ করে বন্দেল খন্ডের বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে যখন নিযামুল মুল্‌ক মুবারেজ খানকে পরাজিত করে মোগল সরকারের ইচ্ছার

---

১. জয় সিং সম্পর্কে ঐতিহাসিক আবুল ফায়েজ লিখেছেন : "যে দিন থেকে ভারতে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছে, এত বড় অসচ্চরিত্র শাসক আর কখনো আবির্ভূত হয়নি। দিনরাত সে শুধু এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো, যাতে ভারত থেকে ইসলামের নামনিশানা মুছে যায়। এই খোদাদ্রোহী যখন মোগল সম্রাটকে ব্যক্তিত্বহীন অপদার্থরূপে দেখতে পেল, তখন কুফরীর আবেগে উদ্দীপিত হয়ে দাক্ষিণাত্যের কাফেরদেরকে ইসলামের মূলোৎপাটনের নিমিত্তে ডেকে পাঠালো। অভিশপ্ত দুশমনদেরকে সে ভালোবেসে ভারত উপমহাদেশে ঠাঁই করে দিল।"

বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্য দখল করলেন এবং সম্রাট স্বীয় সামরিক শক্তি সংহত করার জন্য অন্যান্য সেনাপতির ন্যায় মুহাম্মদ খানকেও তার সৈন্যসামন্তসহ দিল্লীতে ডেকে আনলেন, তখন বন্দেল খন্ডের বিদ্রোহ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ পেল। তারা ঝাঁসি থেকে বিহারের সীমান্ত পর্যন্ত এক ভয়াবহ নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। এই নয়া বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ খানকে আবার পাঠানো হয়। তিনি বন্দেল খন্ডের অধিবাসীদেরকে ক্রমাগত পরাস্ত করে রাজধানী জিতপুর[১] জয় করেন। রাজা চতরসাল ও তার পুত্ররা বাধ্য হয়ে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে। মোগল শাসিত যেসব এলাকা তারা দখল করেছিল তা ছেড়ে দেয় এবং নিজেদের অঞ্চলে মোগল সরকারের থানা প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের মূলোৎপাটনে বদ্ধপরিকর দিল্লীর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রীরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। সভাসদদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ খানের দুশমন ছিল, তারা তার সম্পর্কে কুৎসা রটায় যে, সে তৈমুরীয় রাজবংশের শত্রু এবং ভারতে পাঠান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অভিলাসী। বুরহানুল মুল্‌ক সাদত খান, সামসামুদ্দৌলা খানে দাওরান এবং অন্যান্যরা চতরসাল ও তার সাংগপাংগদেরকে চিঠি দিয়ে বিদ্রোহের উস্কানী দিতে থাকে। তারা তাকে আশ্বাস দেয় যে, সম্রাটের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ খানকে কোন রকম সাহায্য করা হবে না। বন্দেল খন্ডবাসী এই আস্কারা পেয়ে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ করে বসলো এবং গিরিধর বাহাদুরকে হত্যা করে যে মারাঠারা মালোহে আপন আগ্রাসী নখর বিদ্ধ করেছিল, তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকলো। মুহাম্মদ খান এসব ঘটনার কিছুই জানতেন না। তিনি বন্দেল খন্ডের পার্বত্য এলাকায় সেনাবাহিনী নিয়ে শিবির গেড়ে বসেছিলেন। যখন তার সৈন্যদের বেশীর ভাগ ছুটি নিয়ে চলে গেছে, ঠিক সেই সময় বাজীরাও ও রাজা চতরসাল ৭০ হাজার সৈন্য নিয়ে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। মুহাম্মদ খান পরাজিত হয়ে জিতপুর দুর্গে আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকে তিনি মোগল সম্রাট ও তার উর্ধতন কর্মকর্তাদেরকে ক্রমাগত চিঠি লিখতে লাগলেন। কিন্তু তার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করা হলো না। মুহাম্মদ খানকে সাহায্য দেয়ার পরিবর্তে সামসামুদ্দৌলা বন্দেল খন্ডের শাসকদেরকে লিখলো : "একজন বিজয়ী আফগান সেনাপতি মোগল সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। এখন সে যখন তোমাদের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে, তখন আর তাকে ছেড় না। পারলে তার মাথা সম্রাটের কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়ে দাও। এতে তিনি খুব খুশী হবেন।" মুহাম্মদ খানের পুত্র কায়েম খান ফায়েজাবাদ গিয়ে বুরহানুল মুল্‌ক সাদাত খানের নিকট সাহায্য চাইল। কিন্তু সাহায্য দূরে থাক, সেখানে তাকে গ্রেফতার করার প্রস্তুতি নেয়া হলো। এই প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে সে

১. উত্তর প্রদেশের শাহীরপুরে অবস্থিত।

পালাতে বাধ্য হলো। অবশেষে সকল দিক থেকে হতাশ হয়ে মুহাম্মদ খান ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে বন্দেল খন্ডের শাসকের সাথে আপোষ করলেন এবং তাদেরকে এই মর্মে অংগীকার লিখে দিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি আর কখনো বন্দেল খন্ডে আক্রমণ চালাবেন না।

এই সাফল্যের পর মারাঠারা তাদের প্রদত্ত সাহায্যের বিনিময়ে রাজা চতরসালের নিকট থেকে বন্দেল খন্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল কুক্ষীগত করে। এই অঞ্চলের রাজস্বের পরিমাণ ৩০ লাখ রুপিয়ারও বেশী ছিল।[১]

মারাঠাদের দিল্লী আক্রমণ

এ পর্যন্ত নর্বদার উত্তরে মারাঠা শক্তি ও মোগল কর্তৃপক্ষের মধ্যে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত যে ঘটনাবলী সংঘটিত হয় তার ধারাবাহিক বিবরণ সম্পূর্ণ হলো। এ বিবরণ পড়লে বুঝা যায় যে, ভারত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে নিযামুল মুলকের বিচ্ছিন্নতার এবং সম্রাটের সাথে তার অবনিবনার একমাত্র ফল এই দাঁড়ায় যে, মাত্র ৮ বছর সময়ের মধ্যে মারাঠা শক্তি গুজরাটে মোগলদের শাসনকার্যে পরাক্রান্ত অংশীদারে পরিণত হয়। মালোহের বেশীর ভাগ স্থানও কার্যত তাদের কুক্ষীগত হয়। সর্বশেষে বন্দেল খন্ডের একটা অংশও তাদের শাসনের আওতায় চলে আসে। এরপর তারা ক্রমান্বয়ে দিল্লী ও আগ্রা অভিমুখে পা বাড়াতে লাগলো। একদিকে মারাঠাদের আগ্রাসী তৎপরতা প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছিল। অপর দিকে সাম্রাজ্যের প্রধান কর্তার অবস্থা ছিল এই যে, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও মালোহ থেকে যখন আতংকজনক খবর আসতো, তখন তার চাটুকার মোসাহেবরা তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য তাকে দিল্লীর বাইরে বাগবাগিচায় পরিভ্রমণ ও অরণ্যে শিকার করাতে নিয়ে যেত এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ শিকার ও ভ্রমণে লিপ্ত রাখতো, যাতে এসব কুলক্ষুণে খবরাদি শুনে তার মন ভারাক্রান্ত না হয়। সম্রাটের মন্ত্রীও নিজের উদ্বেগ দূর করার জন্য রাজধানীর বাইরে চলে যেত এবং মাসব্যাপী ভ্রমণ ও আমোদ-ফূর্তি করে মন হালকা করে আসতো। এ সময় সাম্রাজ্যের সকল কাজকর্ম স্থগিত থাকতো এবং যে মূল্যবান সময় দেশের রক্ষণাবেক্ষণে কাটানো উচিত ছিল তা এভাবে নষ্ট করা হতো।

এহেন ক্ষতিকর তৎপরতা দ্বারা দেশের সর্বনাশ ঘটতে যেটুকু বাকী ছিল, জয় সিং এর ন্যায় কট্টর দেশদ্রোহীকে মালোহ ও আগ্রার সুবেদার নিয়োগ করে সেটুকুও সম্পন্ন করা হলো। আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই সুবেদার মারাঠা বর্গীদের ঘনিষ্ঠতম মিত্র ও সক্রিয় সহযোগী ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের

১. এই ঘটনার দুই বছর পর রাজা চতরসাল মারা যায় এবং তার রাজ্য তার দুই পুত্রের মধ্যে বন্টিত হয়। একজন পেল পান্না অঞ্চল এবং অপরজন পেল জিতপুর অঞ্চল।

ব্যয়ে ৩০ হাজার অশ্বারোহী এবং তার চেয়েও বেশী পদাতিক সৈন্য মালোহে থাকা সত্ত্বেও জয় সিং মালোহের শাসক নিযুক্ত হওয়ার পর মারাঠাদের বাড়াবাড়ি রোধ করার কোন চেষ্টাই করলো না। বরং তাদেরকে উত্তর ভারতের দিকে আরো অগ্রসর হবার সুযোগ করে দিল। অচিরেই মারাঠাদের লুটেরা দলগুলো হত্যা ও লুটতরাজ চালাতে চালাতে আগ্রার উপকণ্ঠে পৌছে গেল। আর একটু এগুলেই তারা দিল্লী চলে যায় আর কি। এবার সম্রাটের কানে পানি গেল। তিনি নিজেই মারাঠাদের মোকাবিলা করতে দিল্লী থেকে বেরুলেন। কিন্তু ফরিদাবাদের সামনে আর এগুতে পারলেন না। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী কামরুদ্দীন খান যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি গাজীউদ্দীন খান ফিরোজ জং[১] আজীমুল্লাহ খান[২] জহীরুদ্দৌলাকে সাথে নিয়ে আগ্রা অভিমুকে যাত্রা করলেন। কিন্তু কয়েক মাস পর কিছুই না করে ফিরে এলেন। পরবর্তী বছর পুনরায় মারাঠারা আক্রমণ চালালো এবং গোয়ালিয়র থেকে আজমীর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। আগ্রার আশেপাশে তারা ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়ে দিল। এবার সামসামুদ্দৌলা খানে দাওরানকে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু তিনি কয়েকমাস গড়িমসি করে কাটিয়ে দিলেন। অবশেষে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের শুরুতে যখন বৃষ্টির মওসুম ঘনিয়ে এল এবং মারাঠারা চিরাচরিত নিয়মে নিজ নিজ গৃহের দিকে যাত্রা শুরু করলো, তখন দিল্লী থেকে বেরুলেন। এভাবে এ বছরটাও কোন প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াই কেটে গেল।

১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মারাঠারা আরো প্রচণ্ড আক্রমণ চালালো। এর প্রতিরোধের জন্য সম্রাট প্রধানমন্ত্রী কামরুদ্দীন খান এবং প্রধান সেনাপতি সামসামুদ্দৌলাকে পাঠালেন। কামরুদ্দীন খানের জন্য নির্ধারিত হলো আগ্রা অঞ্চল। এখানে স্বয়ং বাজীরাও আক্রমণ চালিয়েছিল। আর সামসামুদ্দৌলাকে আজমীরে মোতায়েন করা হলো। ঐ অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল মালাহার রাও হোলকার। কামরুদ্দীন খান আগ্রার দিক দিয়ে মালোহের দিকে অগ্রসর হলেন। কয়েকটি এলাকায় বাজীরাও এর সাথে যুদ্ধ হলো। কিন্তু হারজিত নির্ধারণের মত যুদ্ধ কোথাও হলো না। ক্রমে বর্ষা মৌসুম এসে গেল এবং বাজীরাও দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করলো। আজমীরের দিক থেকে জয় সিং এবং সামসামুদ্দৌলা মালাহার রাও হোলকারের মোকাবিলা করতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কোন যুদ্ধ হওয়ার আগেই জয় সিং সামসামুদ্দৌলাকে হোলকারের সাথে সমঝোতায় উপনীত হতে রাজী করে ফেললো। জয় সিং মালোহ প্রদেশ থেকে এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব বাবদ ২২ লাখ রুপিয়া মারাঠাদেরকে দিতে স্বীকৃত হলো এবং উজ্জয়িনীতে পেশোয়া স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করলো। সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত প্রধান সেনাপতি নিছক মনগড়াভাবে এই সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করলেন।

---

১. ইনি নিযামুল মুল্‌কের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং প্রধানমন্ত্রী কামরুদ্দীন খানের জামাতা।
২. কামরুদ্দীন খানের চাচাতো ভাই।

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে মারাঠারা একদিকে উদয়পুর, নাগোর[১] ও আজমীরে, আবার অন্যদিকে বন্দেল খন্ডের পথ ধরে গংগা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। মোগল সরকারের পক্ষ থেকে সামসামুদ্দৌলাকে আজমীর অভিমুখে এবং কামরুদ্দীন খানকে গংগা যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পাঠানো হলো। মুহাম্মদ খান বংগেশ এবং বুরহানুল মুলক সাদাত খানকে প্রধানমন্ত্রী কামরুদ্দীনের সাথে মিলিত হয়ে আক্রমণ প্রতিহত করার নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু এবারেও মারাঠাদেরকে প্রতিহত করা গেল না। ১৭৩৬ সালের গোড়ার দিকে বাজীরাও রাজা জয় সিং এর মধ্যস্থতায় আবেদন জানালো যে, মালোহ ও গুজরাটে এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ আদায়ের অধিকার সম্রাটের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নেয়া হোক। জয় সিং সামসামুদ্দৌলা এই আবেদনের পক্ষে জোর ওকালতি করলেন। ফলে মুহাম্মদ শাহ পরবর্তী ফসলের মওসুম থেকে দক্ষিণ চম্বলের জেলাগুলো থেকে বাজীরাওকে ১৩ লাখ রুপিয়া দিতে সম্মত হলেন। তাছাড়া কোড়, বুন্দী প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যগুলো থেকে খাজনা হিসেবে দশ লাখ বাট হাজার রুপিয়া আদায় করার অধিকারও তাকে দিলেন। এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য ছিল মারাঠা ও রাজপুতদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করা। খানে দাওরান এসব শর্ত অনুসারে বাজীরাও এর সাথে আলোচনার জন্য স্বীয় প্রতিনিধি ইয়াদগার খান কাশ্মীরী, কৃপারাম ও নাজাবাত আলী খানকে পাঠালেন এবং তাদের কাছে গোপনে এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ সনদও লিখে দিলেন, যাতে সমঝোতা হওয়ার পর তা পেশোয়ার কাছে সমর্পণ করা যায়। কিন্তু বাজীরাও এর প্রতিনিধি চন্ডোপান্ত পুরন্দরী তখন দিল্লীতেই ছিল। সে এই গোপন ব্যবস্থার কথা জেনে ফেললো এবং বাজীরাওকে আগে ভাগেই তা লিখে জানিয়ে দিল। বাজীরাও মনে করলো যে, মোগল কর্তৃপক্ষ তাদের ভয়ে যথেষ্ট ভড়কে গেছে এবং খুবই নতজানু হয়ে সন্ধি করতে ইচ্ছুক। এ জন্য সে দাবীর সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দিল। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই ধবলপুরে সন্ধি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। এতে মোগল সরকারের পক্ষ থেকে ইয়াদগার খান ও জয় সিং এবং মারাঠাদের পক্ষ থেকে স্বয়ং বাজীরাও যোগদান করলো। বাজীরাও এই বৈঠকে নিম্নলিখিত দাবীনামা পেশ করলো :

(১) সমগ্র মালোহ প্রদেশ তার মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে এবং যেখানে যেখানে রোহিলারা বাস করে (যেমন ভুপাল) সেখান থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে।

(২) মান্ডা, ধারা ও রায়সেন দুর্গসমূহ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে।

(৩) চম্বলের দক্ষিণের সমগ্র এলাকার মালিকানা ও শাসন ক্ষমতা দিতে হবে।

---

১. যোধপুর অঞ্চলে অবস্থিত।

(৪) শাহী কোষাগার থেকে হয় নগদ ৫০ লাখ রুপিয়া দেয়া হোক, অন্যথায়, অনুরূপ পরিমাণের আয় নিশ্চিত হয় এমন ভূখণ্ড বাংলা, এলাহাবাদ, বেনারস, গয়া ও মথুরার জেলাসমূহে জাইগীর হিসেবে বরাদ্দ করা হোক।

(৫) দাক্ষিণাত্যের ৬টি প্রদেশের মোট সরকারী আয়ের ৫ শতাংশ আদায়ের অধিকার দেয়া হোক।[১]

মুহাম্মদ শাহ প্রথম চার দফা দাবী প্রত্যাখ্যান করে দিলেন এবং শুধুমাত্র শেষোক্ত দাবীটি ৬ লাখ রুপিয়া সেলামীর বিনিময়ে মঞ্জুর করলেন। এ পদক্ষেপ মূলত নিযামুল মুল্‌কের ওপর একটা আঘাত হানার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছিল। তিনি মারাঠাদের সাথে আপোষ করে দিব্যি আরামে দাক্ষিণাত্যে বসে উত্তর ভারতে মারাঠা আগ্রাসনের তামাসা দেখছিলেন। তার এই আরামকে হারাম করা এবং পুনরায় তাকে মারাঠাদের সাথে সংঘাতের মুখোমুখী করার জন্য এভাবে উভয়ের মধ্যে স্বার্থের টক্কর লাগিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সম্রাট নিযামুল মুল্‌ককে এভাবে বুঝিয়ে দিতে চাইছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর মারাঠাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে দাক্ষিণাত্যের শাসকও তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে খোলাসা হয়ে যাবে যে, মুহাম্মদ শাহ ও তার দিকপাল উপদেষ্টাদের এই কৌশল ষোলআনাই সফল হয়েছিল।

ধবলপুরের সম্মেলনে বাজীরাও তার দাবীনামা মঞ্জুর করাতে পারলো না। কিন্তু জয় সিং মারাঠাদের পক্ষে আদাপানি খেয়ে লেগেছিল। সে নিজের ইচ্ছামত বাজীরাওকে মালোহে নিজের ভারপ্রাপ্ত সুবেদার নিয়োগ করলো। সেই সাথে তার কাছ থেকে লিখিত অংগীকার আদায় করলো যে, আগামীতে মোগল শাসিত অঞ্চলে মারাঠারা আর গোলযোগ করবে না। এভাবে মোগল সাম্রাজ্যের দ্বিগুণ ক্ষতি সাধিত হলো। মালোহ প্রদেশটি যেমন কার্যত হাতছাড়া হয়ে গেল, তেমনি সময়ের দাবী অনুযায়ী অতীব প্রয়োজনীয় সন্ধি চুক্তিটিও সম্পাদিত হতে পারলো না।

সম্মেলনের ব্যর্থতার পর মারাঠারা একটা প্রচণ্ড আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিল। ১৭৩৭ সালের মার্চ মাসে তারা দলে দলে গংগা ও যমুনার মধ্যবর্তী এলাকায় হামলা চালালো। সম্রাট তাদেরকে প্রতিহত করতে কামরুদ্দীন খান ও সামসামুদ্দৌলাকে বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ পাঠালেন। অন্যদিক থেকে অযোধ্যার সুবেদার সাদাত খান তাদেরকে উক্ত অঞ্চল থেকে মেরে পিটিয়ে তাড়াতে তাড়াতে আগ্রায় এসে সামসামুদ্দৌলার সাথে মিলিত হলেন। কামরুদ্দীন খান তখন গোয়ালিয়রে। তিনি এলে তার সাথে মিলিত হয়ে বাজীরাও এর ওপর সংঘবদ্ধ হামলা চালানোর সুযোগের জন্য সামসামুদ্দৌলাও

১. মারাঠারা দাক্ষিণাত্যে ২৫% ও ১০% রাজস্ব আগে থেকেই পেয়ে আসছিল। এক্ষণে তারা আরো ৫% দাবী করে বসলো।

সাদাত খান প্রতীক্ষায় রইলেন। কিন্তু বাজীরাও এবার তার চূড়ান্ত দাবীগুলো আদায় করার জন্য এমন একটা দুরন্ত হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিয়েছিল যাতে সম্রাট আতংকগ্রস্ত হয়ে যান এবং গোটা ভারত মারাঠাদের পদভারে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তাই এসব রাজকীয় কর্মকর্তা যখন পারস্পরিক আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত, তখন সে অন্য এক পথ ধরে সোজা দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলো এবং জেলহজ্জ মাসের নবম দিনে সহসা রাজধানীর উপকণ্ঠে আবির্ভূত হলো। এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বাজীরাও যেমন প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল, অবিকল সেটাই হলো। অবশ্য সে সময় শহরে দশবারো হাজার অশ্বারোহী এবং ২০ হাজার পদাতিক সৈন্য বর্তমান ছিল এবং তা মারাঠা বাহিনীর তুলনায় কোনমতেই কম ছিল না। যুদ্ধ সরঞ্জামেরও কমতি ছিল না, খাদ্য সামগ্রীও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং শহর রক্ষা প্রাচীরও এতটা মজবুত ছিল যে, কামান ও দুর্গবিধ্বংসী অস্ত্র ছাড়া তা আয়ত্বে আনা মারাঠা শক্তির সাধ্য ছিল না। অধিকন্তু দিল্লীর অদূরেই প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি ও অযোধ্যার সুবেদার বিপুল সৈন্যসামন্ত নিয়ে বিদ্যমান ছিলেন। এমতাবস্থায় মারাঠাদের অবরোধ কয়েকদিনের বেশী স্থায়ী হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু এ সময়ে মোগল শক্তির আসল ঘাটতি বস্তুগত উপায় উপকরণের ছিল না, বরং প্রকৃত ঘাটতি ছিল নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বলের। সম্রাট থেকে শুরু করে সাম্রাজ্যের সর্বনিম্নস্তরের কর্মচারী পর্যন্ত সকলে সাহস, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশীলতার গুণাবলী একেবারেই হারিয়ে বসেছিল। তাদেরকে হতচকিত ও ভীতিবিহ্বল করে দেয়ার জন্য কেবল এই ধারণাটা মাথায় ঢুকিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল যে, যে শত্রু এতগুলো রাজকীয় সেনাবাহিনীর ব্যুহ ভেদ করে সরাসরি রাজধানীর সামনে এসে পৌঁছেছে, সে যেমন তেমন শত্রু নয়—বরং অবশ্যই এক দুরন্ত কাল শত্রু। এমতাবস্থায় যমুনা পেরিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন কৌশল তাদের মাথায় আসার কথা ছিল না। কিন্তু নিযামুল মুলকের সাথে দাক্ষিণাত্যে সামরিক অভিযান চালিয়ে যিনি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সেই সাদুল্লাহ খান মীর আতেশ তাদের মনোবল বৃদ্ধি করলেন। অতপর তারই পরামর্শক্রমে তাড়াহুড়ো করে একটা বাহিনী গঠন করে উমদাতুল মুলক আমীর খানের নেতৃত্বে বাজীরাওকে প্রতিহত করতে পাঠানো হলো। এই বাহিনীতে এমন বহু তরুণ সেনাপতিও ছিল, যাদের মাথায় যথেষ্ট বীরত্বের অহংকার থাকলেও সমরবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞানও ছিল না। তারা আমীর খানের আনুগত্য যথাযথভাবে করলো না। বরং অতিমাত্রায় তাড়াহুড়ো করে অসতর্কভাবে মারাঠাদের ওপর চড়াও হলো এবং সামান্য কিছু মারামারি করে এমন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালালো যে, বাদবাকী সৈন্যরাও হতোদ্যম হয়ে পড়লো। এই পরাজয়ের ফলে সমগ্র রাজধানী শহরে এবং প্রধান শাহী দুর্গে পর্যন্ত আতংক ছড়িয়ে পড়লো। সম্রাট থেকে শুরু করে নগরীর কর্মকর্তারা পর্যন্ত সকলে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। ঠিক তক্ষুণি মারাঠা

আক্রমণের খবর শুনে কামরুদ্দীন খান স্বীয় বাহিনী নিয়ে ধেয়ে এলেন এবং তিনি আসা মাত্রই বাজীরাও রাজপুতানার দিকে চলে গেল।

এ ঘটনায় সম্রাট ও তাঁর উপদেষ্টাদের চেতনার সঞ্চার হলো। এবার তারা অনুভব করলো যে, মারাঠা আগ্রাসন এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যা প্রতিহত করা তাদের সাধ্যাতীত। অথচ এখনই তা প্রতিহত না করা হলে শুধু সাম্রাজ্যের পতনই অবধারিত নয়, বরং সেই সাথে জানমাল ও মানসম্ভ্রম পর্যন্ত বিপন্ন হবে। এই ভীতি ও উদ্বেগাকুল পরিস্থিতিতে তারা সর্বদিকে দৃষ্টি দিল, কিন্তু সমগ্র ভারতে নিযামুল মুল্ক ছাড়া এমন আর কোন ব্যক্তি তাদের চোখে পড়লো না যিনি সাম্রাজ্যকে মারাঠা আগ্রাসনের সয়লাব থেকে বাঁচাতে পারেন। অবশেষে নিযামুল মুল্কের কট্টর বিরোধী সামসামুদ্দৌলা সহ সভাসদদের সকলে একমত হয়ে সম্রাটকে পরামর্শ দিল যে, দাক্ষিণাত্যের সুবেদারকে তলব করা হোক এবং পুনরায় তার কাছে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করা হোক।

নিযামুল মুল্ক দিল্লীতে

নিযামুল মুল্ক ছয় বছর আগে মারাঠাদের সাথে আপোষ করেছিলেন। সেই আপোষের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, দাক্ষিণাত্যে কয়েক বছরের জন্য স্বস্তি লাভ করা এবং ৭০/৮০ বছর ব্যাপী অব্যাহত গোলযোগের দরুন সমগ্র দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলোতে যে চরম বিশৃংখলা ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছিল, তা শুধরানোর সুযোগ পাওয়া। আপোষ চুক্তির মাধ্যমে তাঁর এ উদ্দেশ্য সফল হয়। ছয় বছরের এই পুরো সময়টি তিনি প্রশাসনিক সংস্কার ও আইন-শৃংখলা পুনর্বহালের কাজে ব্যয় করেন। মারাঠা সীমান্তের লাগোয়া অঞ্চলের একাধিক শহরকে নিরাপদ ও সংহত করার কাজ তিনি এ সময়েই করেন। আশপাশের অবাধ্য জমীদারদেরকে বশীভূত করে তাদের সাথে কর খাজনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধ নিষ্পত্তি করে সরকারের সাথে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক ও স্থীতিশীল করেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের শাসক ও কর্মচারীদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। সরকারের সব কয়টি বিভাগকে পুনর্গঠিত করেন এবং নতুন নিয়ম বিধি প্রবর্তন করেন। বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ ও অর্থবিভাগের অচলাবস্থা ও বিচ্যুতি দূর করেন। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ সেনাপতিদের জন্য ভূসম্পত্তি বরাদ্দ করেন এবং তাদের সাহায্যে স্বীয় সামরিক শক্তি এত উন্নতি সাধন করেন যে, প্রয়োজনের সময় তিনি অন্তত তিন লাখ সৈন্য ময়দানে নামাতে পারতেন। মোটকথা, এই ছয় বছরেই তিনি শাসনব্যবস্থার এমন অটুট কাঠামো গড়ে তোলেন, যা সালারে জং এর শাসনামল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এমনকি তার পরবর্তীকালেও তাতে তেমন কোন সংস্কার রদবদলের প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

এই গঠনমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে আরো কয়েকটি নিরুদ্বেগ ও নিরুপদ্রব বছর তার প্রয়োজন ছিল। কেননা এখনো কর্ণাটকের বিভিন্ন অঞ্চলে

তার সরকারের নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কিন্তু উত্তর ভারতের রাজনৈতিক স্থীতিহীনতার দরুন তিনি স্বীয় দৃষ্টি আওরংগাবাদ থেকে হটিয়ে দিল্লীর ওপর নিবদ্ধ না করে পারলেন না। মারাঠা আগ্রাসনের তাণ্ডবে মোগল সাম্রাজ্যের প্রাসাদ তার ধারণার চেয়েও দ্রুত গতিতে দোদুল্যমান হয়ে উঠেছিল। দাক্ষিণাত্যের বর্গীরা কয়েক বছরের মধ্যেই গুজরাট, মালোহ, রাজপুতানা, আজমীর, আগ্রা ও এলাহাবাদ প্রদেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল। খোদ রাজধানীতে হামলা চালিয়ে তারা শুধু যে সম্রাট ও তাঁর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে দিয়েছে তা নয়, বরং সেই সাথে সমগ্র ভারতে নিজেদের এক অজেয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়ে যাওয়ার পর নিযামুল মুলকের পক্ষে নীরব থাকা আত্মহত্যার শামিল হতো। কেননা এর অনিবার্য পরিণতি এই দাঁড়াতো যে, মারাঠারা কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা দখল করে বসতো। ভারতের একটা বিরাট অংশ তাদের কুক্ষীগত হয়ে যেত এবং তারপর তারা উর্দ্ধতন রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে দাক্ষিণাত্যের শাসককে নিজেদের অধীনস্থ বানাতে চেষ্টা করতো। অথচ এযাবত সাম্রাজ্যের সংবিধান মোতাবেক দাক্ষিণাত্যের সুবেদার স্বয়ং মারাঠা রাজা সাহুর ওপর কর্তৃত্বশীল ছিল। তাছাড়া বাজীরাও ছয় বছর আগে তার ও নিযামুল মুলকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিও লংঘন করে চলছিল। সে সম্রাটের ওপর চাপ প্রয়োগ করে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশে অতিরিক্ত শতকরা পাঁচ ভাগ কর বসানোর সনদ আদায় করে নিয়েছিল। এটা শুধু সেই চুক্তির বরখেলাপই ছিল না বরং এ ঘটনা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, সম্রাটকে পরাভূত করার পর মারাঠারা আগের চেয়েও প্রবলতরভাবে দাক্ষিণাত্যের ওপর আগ্রাসী থাবা বিস্তার করবে।

এসব কারণে সম্রাট তলবী ফরমান হস্তগত হওয়া মাত্রই নিযামুল মুলক দিল্লী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। দাক্ষিণাত্যে স্বীয় মেঝ পুত্র নিজামুদ্দৌলা নাসের জংকে ভারপ্রাপ্ত সুবেদার নিয়োগ করে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তারিখে বুরহানপুর থেকে রওনা হলেন এবং ১২ই জুলাই তারিখে দিল্লী পৌঁছলেন। মোগল সম্রাটের পক্ষ থেকে তাকে এমন ধুমধামের সাথে সম্বর্ধনা দেয়া হলো যা ইতিপূর্বে কোন সুবেদারকে দেয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী কামরুদ্দীন খান তাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য দিল্লী থেকে ৫৫ মাইল দূর পর্যন্ত এলেন। পথিমধ্যে জায়গায় জায়গায় সম্রাটের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপঢৌকন নিয়ে এসে দেখা করতে লাগলেন, কুশল বার্তা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন এবং সাক্ষাতের জন্য সম্রাটের ব্যাকুলতার কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন। কয়েক শতাব্দী ধরে প্রচলিত রীতিপ্রথা পর্যন্ত তার খাতিরে ভংগ করা হলো এবং বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হলো যে, নিযামুল মুলকের বাহন যেন রাজধানীতে নাকাড়া নহবত বাজিয়ে প্রবেশ করে। অথচ প্রচলিত প্রথা অনুসারে সম্রাটের অবস্থানস্থলের তিন মাইলের মধ্যে কোন রাজকর্মকর্তার নহবত বাজানোর

অনুমতি ছিল না। যখন তিনি দিল্লী প্রবেশ করলেন তখন তাকে দেখার জন্য নগরবাসী হুমড়ি খেয়ে পড়লো এবং চারদিকে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সম্রাট দেওয়ানে খাসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং চারটি কাবা (বহু মূল্য পোশাক) প্রদান করলেন, যা এ যাবত শুধুমাত্র তৈমুর বংশোদ্ভূত যুবরাজদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই অসাধারণ আড়ম্বরপূর্ণ অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে সম্রাট থেকে নগণ্য নগরবাসী পর্যন্ত সকলের এই উপলব্ধিই প্রতিফলিত হয়েছিল যে, সারা দেশে একমাত্র এই ব্যক্তিই সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।

এর এক মাস পর ১৩ই আগষ্ট তারিখে সম্রাট রাজা জয় সিং ও বাজীরাওকে আগ্রা ও মালোহ প্রদেশ থেকে বরখাস্ত করে নিযামুল মুল্‌কের জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজীউদ্দীন খান বাহাদুর ফিরোজ জংকে উক্ত প্রদেশ দু'টির শাসক নিয়োগ করলেন। সেই সাথে এই শর্তও আরোপ করলেন যে, নিযামুল মুলক যেন নিজে গিয়ে মালোহ থেকে মারাঠাদের বিতাড়িত করেন। তৎকালে ইরান সম্রাট নাদির শাহ কান্দাহার অবরোধ করে রেখেছিলেন। তার দূতরা দিল্লীতে ছিল এবং সমস্ত আলামত দেখে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল যে, কান্দাহার দখলের পর কাবুল ও পাঞ্জাবের পালা আসতে যাচ্ছে। নিযামুল মুল্‌ক এই বৃহত্তর বিপদের প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাঁকে বললেন যে, মারাঠাদের উৎপাত দমনের জন্য তো আমার কয়েকজন অভিজ্ঞ সেনাপতিই যথেষ্ট। তারা উপযুক্ত পন্থায় তা প্রতিহত করবে। কিন্তু এ সময় মারাঠাদের চেয়ে বড় হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে নাদির শাহ। এ জন্য সবচেয়ে ভালো কর্মপন্থা এই যে, সেনাবাহিনী ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে আপনি স্বয়ং আফগানিস্তান চলে যান এবং আমাকে আগে আগে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি গজনীতে বসে ইরানের শাহের গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখতে পারি। কিন্তু মুহাম্মদ শাহ মারাঠাদের ভয়ে এত আতংকিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাদের চেয়ে ভয়ংকর কোন শক্তি থাকতে পারে এটা তিনি ভাবতেই পারছিলেন না। তিনি বললেন, আফগান সীমান্তের দুর্গম গিরিপথ এবং দুর্ধর্ষ জংগী আফগান উপজাতিগুলোর বাধা অতিক্রম করে ভারতে পৌঁছে যাওয়া নাদির শাহের পক্ষে এত সহজ কাজ নয়। কাজেই তুমি ওদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে মালোহ চলে যাও এবং মারাঠা বিদ্রোহ দমনে সর্বাত্মক মনোযোগ দাও।

অগত্যা সম্রাটের আদেশ মোতাবেক নিযামুল মুল্‌ক দিল্লী থেকে ৩০ হাজার সৈন্য ও ভারতের সবচেয়ে ভালো কামান বহর বলে খ্যাত একটা শক্তিশালী কামান বহর নিয়ে রওনা হলেন। আগ্রায় নিজের মামাতো ভাই মহিউদ্দীন কুলী খানকে ভারপ্রাপ্ত সুবেদার নিয়োগ করে এটাওয়া, মাখনপুর,

কালপী ও বন্দেল খন্ডের ভেতর দিয়ে ভূপালে গিয়ে উপনীত হলেন।[১] সেখান থেকে তিনি নাসের জংকে কড়া নির্দেশ দিলেন যে, বাজীরাওকে দাক্ষিণাত্য থেকে বেরুতে দিও না। কিন্তু নাসের জং এই চেষ্টায় কৃতকার্য হলো না। বাজীরাও ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে নর্বদা পেরিয়ে এল। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সে যখন নিযামুল মুল্কের মুখোমুখী হলো, তখন তিনি ভূপালের দুর্গে ও আশপাশের পাহাড়ের ওপর মজবুত অবস্থান নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এই স্থানটির এক পাশে একটি দিঘী এবং অপর পার্শ্বে একটি খাল প্রবাহিত। তখন তার সৈন্য সংখ্যা বন্দেল খন্ড ও রাজপুতানার সরদারদের সৈন্য মিলিয়ে মোট ৪০ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মারাঠারা যথারীতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং তারা লুটতরাজ চালিয়ে নিযামুল মুল্কের বাহিনীতে রসদ ও পশুখাদ্যের হাহাকার সৃষ্টি করে দিল। অযোধ্যার নবাব সাদাত খানের জামাই ও ভাগ্নে আবুল মুনসুর খান সফদর জং এবং কোটার রাজা তাকে রসদ সরবরাহের চেষ্টা করলো। কিন্তু মালাহার রাও হোলকার ও যশোবন্ত রাও পাওয়ার তাদেরকে পরাজিত করে পিছু হটিয়ে দিল। নিযামুল মুল্ক সাহায্যের জন্য দিল্লী ও আওরংগাবাদে দূত পাঠালেন। কিন্তু দিল্লী থেকে কোন সাহায্য পাঠানো হলো না। কারণ সামসামুদ্দৌলা ততক্ষণে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারের বিরুদ্ধে আবার হিংসার আগুনে জ্বলতে আরম্ভ করেছে। পক্ষান্তরে আওরংগাবাদ থেকে নাসের জং তাড়াহুড়ো করে যে বাহিনী পিতার সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিল, তাপেতী নদীতে বাজীরাও এর ভাই জামনাজী আপা অবরোধ সৃষ্টি করে রাখার দরুন তা পৌছতে পারলো না। স্বয়ং নিযামুল মুল্কের বাহিনীতে রাজপুত সেনাপতিরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রস্তুত ছিল। কেবল নিযামুল মুলক তাদের মালপত্র নিজের কাছে দুর্গের মধ্যে জমা করে রাখায় তা করতে পারলো না। রসদ ও পশুখাদ্যের এমন অভাব দেখা দিল যে, টাকায় মাত্র এক সের খাদ্য শস্য পাওয়া যাচ্ছিল এবং পশুগুলো না খেয়ে মরতে শুরু করেছিল। অবশেষে এই অবরোধ পরিস্থিতিতে অতিষ্ঠ হয়ে নিযামুল মুল্ক দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন, ভারী সাজসরঞ্জাম ভূপাল ও ইসলাম গড়ে রেখে দিলেন এবং সেনাবাহিনীকে কামান বহরের প্রহরাধীন দিল্লী নিয়ে চললেন। পথে মারাঠারা চারদিক থেকে ঘিরে ধরে হামলা চালাতো। কিন্তু কামান বহরের গোলা নিক্ষেপে তারা কাছে ভিড়তে পারতো না। এভাবে সারা পথ লড়াই করতে করতে দৈনিক তিন মাইল গতিতে নিযামুল মুল্ক এগুতে লাগলেন। সিরওয়াং থেকে ৬৪ মাইল দূরবর্তী মোহনায় যখন পৌছলেন, তখন অবরোধ পরিস্থিতির অবসান ঘটেছে বটে। কিন্তু মারাঠাদের লুটতরাজ ও খাদ্যাভাবের দরুন তার সেনাবাহিনীর চলার ক্ষমতা রহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় নিযামুল মুল্কের পক্ষে হয় চূড়ান্ত যুদ্ধ নচেত পরাজয় মেনে নিয়ে সন্ধি—এই দুই পন্থার কোন একটি অবলম্বন করা ছাড়া গত্যান্তর রইল না। সেনাবাহিনীর নিশেষিত দৈহিক

---

১. তৎকালের ভূপালের শাসক ছিল দোস্ত মুহাম্মদ খানের পুত্র ইয়ার মুহাম্মদ খান।

ক্ষমতা ও ভেঙ্গে পড়া মনোবলের পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত যুদ্ধ পরিচালনার অবকাশ ছিল না। তাই তিনি সন্ধির পথটাই বেছে নিলেন। ১৬ই জানুয়ারী ১৭৩৮ খৃঃ তিনি ঐ মোহনায় বসে বাজীরাও এর সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন। এই সন্ধিতে তিনি বাজীরাওকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, চম্বল ও নর্বদার মধ্যবর্তী সমগ্র ভূখন্ড সম্রাটের কাছ থেকে আদায় করে দেবেন এবং যুদ্ধের ব্যয় বাবদ ৫০ লাখ রুপিয়া নগদ আদায় করে দেয়ারও চেষ্টা করবেন। এভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিযামুল মুল্‌ক দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।

নাদির শাহের আক্রমণ

নিযামুল মুল্‌কের প্রত্যাবর্তনের পরেই ভারতের ওপর সেই ভয়াবহ আগ্রাসনের বিভীষিকা নেমে এল, যার আশংকা তিনি মালোহ অভিযানে যাওয়ার আগেই প্রকাশ করেছিলেন। ইরানের সম্রাট নাদির শাহের আক্রমণের আশংকার কথা তিনি মুহাম্মদ শাহকে তখনই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই খ্যাতনামা বিজেতা ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে সাফাভী রাজবংশের কাছ থেকে ইরানের সিংহাসন ছিনিয়ে নেয়ার পর সবার আগে কান্দাহারের গেলজাই উপজাতির দাপট চূর্ণ করার দিকে মনোনিবেশ করেন। কেননা তারা মাত্র কয়েক বছর আগে দক্ষিণ আফগানিস্তানের সমগ্র এলাকা ইরানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং খোদ ইরানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সাফাভী রাজবংশের নাভিশ্বাস তুলেছিল। ১৭৩৭ সালে নাদির শাহ ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে কান্দাহারের ওপর আক্রমণ চালান। সংগে সংগে তিনি সম্রাট মুহাম্মদ শাহকেও এই মর্মে বার্তা পাঠান যে, তিনি যেন কাবুল প্রদেশের শাসককে কান্দাহারের পলাতক আফগানদেরকে তাদের এলাকায় আশ্রয় না দেয়ার নির্দেশ দেন। জবাবে মুহাম্মদ শাহ তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, আমরা তোমার বিদ্রোহী প্রজাদেরকে আমাদের এলাকায় আশ্রয় দেব না। কিন্তু নাদির শাহ কান্দাহারে আক্রমণ চালানোর পর আফগানরা যখন পরাজিত হয়ে পালালো, তখন মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্তে কেউ তাদের প্রবেশ ঠেকালো না, বরং গজনী ও কাবুল অঞ্চলে তাদেরকে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ দেয়া হলো। এ জন্য নাদির শাহ ১৭৩৭ সালের মে মাসে দিল্লীতে একজন দূত পাঠালেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন, যেন ৪০ দিনের মধ্যে মুহাম্মদ শাহের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি ভংগের কৈফিয়ত আদায় করে নিয়ে আসে। কিন্তু মুহাম্মদ শাহ তাকে কোন জবাব না দিয়ে তালবাহানা করে এক বছর কাটিয়ে দিলেন। বারংবার দাবী জানানো সত্ত্বেও দিল্লীর পক্ষ থেকে কোন জবাব দেয়া হলো না। নিযামুল মুল্‌ক যখন দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লী আসেন, তখন এই দূত সম্রাটের দরবারে কৈফিয়ত তলব করছিল, আর অপরদিকে নাদির শাহ কান্দাহার অবরোধ করে গেলজাইদের ওপর নিষ্ঠুর দমন অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল। নিযামুল মুল্‌ক এই পরিস্থিতি দেখে শুরুতেই বুঝে নিয়েছিলেন যে, নাদির শাহ কান্দাহার দখল

করার পর ফেরারীদের ধরার ছুতোয় কাবুল ও গজনী অঞ্চলে প্রবেশ করবে এবং সেখানে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার দুর্বলতা টের পেয়ে ভারত ভূখণ্ডে হামলা চালাবে। এ জন্যই নিযামুল মুল্‌ক পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, মারাঠাদের আগে নাদির শাহের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নেয়া দরকার। কিন্তু তখন তার পরামর্শ উপেক্ষা করা হলো। অবশেষে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কান্দাহার অধিকৃত হলো। এর অব্যবহিত পর নাদির শাহ স্বীয় দূতকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি জবাব পাও বা না পাও, ফিরে এস। দূতকে ফেরত নেয়া নাদির শাহের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল ছিল। ১৭৩৮ সালের মে মাসে নাদির শাহ মোগল শাসিত আফগানিস্তানে (গজনী ও কাবুলে) সত্যি সত্যি আক্রমণ চালিয়ে বসলো।

এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ শাহ যে প্রতিরক্ষা শক্তির ওপর ভর করে নাদির শাহের হুমকিকে অবজ্ঞা করে আসছিলেন, তার ওপরও একটা নজর বুলিয়ে নেয়া দরকার। মুহাম্মদ শাহের শাসনামলের শুরু থেকে কাবুলের সুবেদার ছিলেন নাসির খান। শাহী দরবারে রওশনুদ্দৌলা জাফর খানের মাধ্যমে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সীমান্ত ও গীরিবর্তের প্রহরা এবং উপজাতীয়দের বেতন বাবদ মোগল কোষাগার থেকে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ছিল, তা রওশনুদ্দৌলা জাফর খানের মাধ্যমেই তার কাছে পাঠানো হতো। পরে যখন সম্রাটের ওপর সামসামুদ্দৌলার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে গেল, তখন সে রওশনুদ্দৌলাকে উৎখাত করার মতলবে তার বিরুদ্ধে কাবুলের অর্থ আত্মসাত সহ বহু সংখ্যক অপবাদ রটালো। সামসামুদ্দৌলার ক্রমাগত ফুসলানির প্রভাবে মুহাম্মদ শাহ কাবুলের সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। নাসির খান এর বিরুদ্ধে একাধিকবার প্রতিবাদ জানালেন এবং এ সাহায্য না দেয়া হলে আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষায় নিজের অক্ষমতা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত করা হলো না। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, উপজাতীয়দের বেতন ভাতা বন্ধ হয়ে গেল এবং তারা কাবুলের সুবেদারের আনুগত্য পরিত্যাগ করলো। গিরিবর্তের প্রহরীরা বেতন না পেয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব ছেড়ে দিল। সেনাবাহিনীর বেতন পাঁচ বছর যাবত বন্ধ রইল এবং তাদের শৃংখলা ও আনুগত্য বিলুপ্ত হয়ে গেল। নাদির শাহ যখন কান্দাহারে আক্রমণ চালালো এবং কিজলিবাস গোত্রের লোকেরা লুটতরাজ চালাতে চালাতে কাবুল সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তখন নাসির খান পুনরায় অর্থের তীব্র প্রয়োজন ব্যক্ত করলেন এবং তার মাথার ওপর ঝুলন্ত অনিবার্য বিপদের দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কিন্তু সামসামুদ্দৌলার সাংগপাংগরা তার জানানো আশংকাকে মনগড়া গল্প বলে আখ্যায়িত করলো এবং সম্রাটকে গভীর প্রত্যয়ের সাথে বললো যে, এসব কারসাজি কামরুদ্দীন খান ও নিযামুল মুল্‌কের ইংগীতে করা হচ্ছে, যাতে সামসামুদ্দৌলার বিরুদ্ধে আবার তুরানীদের প্রভাবপ্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়। অবশেষে নাসির খান

অনন্যোপায় হয়ে কাবুলকে জনৈক দুর্গরক্ষকের প্রহরায় রেখে পেশোয়ারে গিয়ে শান্ত হয়ে বসে রইল।

কাবুলের পর ভারতের অপর যে প্রদেশটি নাদির শাহের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে পারতো সেটি হলো পাঞ্জাব। এখানকার সুবেদার জাকারিয়া খান একজন বীরযোদ্ধা ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তুরানী গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন এবং কামরুদ্দীন খানের খালাতো ভাই ছিলেন, তাই ভারতীয়রাও তাদের দলপতি সামসামুদ্দৌলা তার বিরোধিতা করা অবশ্য কর্তব্য বলে স্থির করে রেখেছিল। এসব লোক ক্রমাগত কুৎসা রটিয়ে সম্রাটকে তার প্রতি বিরূপ করে তুললো। ইনি যখন নাদির শাহের হামলার আশংকা প্রকাশ করে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানালেন, তখন ভারতীয় গোষ্ঠী সম্রাটকে বুঝালো যে, এটিও তুরানী গোষ্ঠীর কারসাজি। ফলে পাঞ্জাবের প্রতিরক্ষার জন্যও কোন সময়োচিত ব্যবস্থা গৃহিত হতে পারলো না।

এ পরিস্থিতিতে যখন নাদির শাহ্ ভারত সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালালেন, তখন কোন শক্তি তা প্রতিহত করতে সক্ষম ছিল না। ১৭৩৮ সালের মে মাসে গজনী বিনা প্রতিরোধে বিজিত হলো। এর এক মাস পর কাবুলের দুর্গ রক্ষকও নিষ্ফল প্রতিরোধ রচনার পর আত্মসমর্পণ করলো। সেপ্টেম্বর মাসে জালালাবাদও নাদির শাহের করতলগত হলো। শুধু তাই নয়, জালালাবাদবাসী নাদির শাহের দূতদেরকে হত্যা করেছিল এই অপরাধে গোটা শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হলো। নভেম্বর মাসে নাদির শাহ ভারতের দিকে অগ্রসর হলেন। নাসির খান পেশোয়ারের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ২০ হাজার আফগান সংগ্রহ করে আলী মসজিদ ও জমরুদের মধ্যবর্তী গিরীপথে তার গতিরোধ করলো। কিন্তু এসব আনাড়ী সেনাদল নাদির শাহের নিয়মিত বাহিনীর একটি আক্রমণও সইতে পারলো না। নাসের খান ও তার সহযোদ্ধা গোত্রপতিরা গ্রেফতার হলো এবং পেশোয়ার বিজিত হলো। এরপর নাদির শাহ্ পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হলো। পাঞ্জাবের সুবেদার জাকারিয়া খান মোগল সরকারের সাহায্য ছাড়া যেটুকু প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব ছিল নিলেন এবং লাহোরে ইরানী আক্রমণ রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু তিনিও দেড় দিনের বেশী টিকতে পারলেন না এবং ১৭৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে লাহোর নাদির শাহের নিকট সমর্পণ করলেন। এই হানাদারী অভিযান চলাকালে অটক থেকে শুরু করে সারহিন্দ পর্যন্ত কিজলিবাস হানাদাররা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এবং তারা অবাধ লুটতরাজ চালিয়ে পাঞ্জাবের শহর বন্দর ও গ্রামে গঞ্জে ধ্বংসের বিভীষিকা সৃষ্টি করলো। লাহোর থেকে যাত্রা করে নাদির শাহ্ সারহিন্দ, আম্বালা, শাহাবাদ ও থানেশ্বরের ভেতর দিয়ে আজীমাবাদের সরকারী ভবনে শিবির স্থাপন করলেন। এ স্থানটি কর্ণাল থেকে মাত্র ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

সমগ্র আফগানিস্তান হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর মুহাম্মদ শাহের চেতনা সঞ্চারিত হলো। নাদির শাহের আগ্রাসী থাবা যখন খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত হলো, তখনই ভারত সাম্রাজ্যের অধিপতির বিশ্বাস জন্মালো যে, তার দেশে সত্যিই একটা বিদেশী আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। তিনি সাম্রাজ্যের তিনজন প্রবীণতম সেনাপতিকে সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য এক কোটি রুপিয়া দিয়ে ১৭৩৮ সালের ডিসেম্বরে দিল্লী থেকে বিদায় করলেন। এ তিনজন সেনাপতি হলেন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযামুল মুল্‌ক আসফজাহ, প্রধানমন্ত্রী ইতিমাদুদ্দৌলা কামরুদ্দীন খান এবং প্রধান সেনাপতি সামসামুদ্দৌলা খানে দাওরান। কিন্তু এই তিনজনের কাউকেই সর্বাধিনায়ক বানিয়ে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করা হলো না। এর ফল হলো এই যে, দিল্লী থেকে সামান্য দূরে গিয়েই এই তিনজন বাউলীর সরাইখানায় থামলো এবং হানাদারদের প্রতিরোধ করার পরিবর্তে নিজেরা কলহকোন্দল করে সময় নষ্ট করতে লাগলো। নিযামুল মুল্‌ক ও ইতিমাদুদ্দৌলা তুরানী সেনাদের ওপর আস্থাশীল ছিলেন এবং প্রতিরোধের কাজটি তাদের ওপর ছেড়ে দিতে চাইছিলেন। বুদ্ধিমান আমীর ও সরকারী কর্মকর্তারাও মনে করতেন যে, দেশে বর্তমানে একমাত্র নিযামুল মুল্‌কই একমাত্র প্রবীণ, অভিজ্ঞ, সমরবিশারদ ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, যিনি আলমগীরের আমল দেখেছেন এবং এই সর্বনাশা দুর্যোগ মুহূর্তে সাম্রাজ্যের তরীকে তিনিই বাঁচাতে পারেন। তাঁকে কর্ণধার বানিয়ে তাঁর সুনিপুণ পরিচালনার সমর্পণ করাই এ তরীকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়। পক্ষান্তরে খানে দাওরান ও সেই সাথে সমগ্র ভারতীয় গোষ্ঠী তুরানীদের হাতে সর্বময় ক্ষমতা তুলে দেয়ার তীব্র বিরোধী ছিল। তারা তুরানীদেরকে বিশ্বাসঘাতক মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল যে, তুরানীরা ইরানী বিজেতার দলে ভিড়ে যাবে এবং পুনরায় ভারতে একটা বিদেশী সরকার প্রতিষ্ঠা করবে।[১] তারা ভারতের রাজপুত ও মারাঠাদের ওপর পুরোপুরি আস্থাশীল ছিল এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রাজপুতদের ধারালো তরবারী ও মারাঠাদের দস্যুবৃত্তি নাদির শাহকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। তারা জয় সিং ও বাজীরাওকে সম্রাটের পক্ষ থেকে চিঠি লেখালো। অন্যান্য সরদার ও সেনাপতিদেরকেও একই রকম বার্তা পাঠালো। কিন্তু চরম মুহূর্তে প্রমাণ হয়ে গেল যে, তাদের কেউই দেশকে হানাদারদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে

---

১. এই সময়ে জাকারিয়া খান যখন বাধ্য হয়ে লাহোর শহরকে নাদির শাহের হাতে তুলে দেন তখন ভারতীয় গোষ্ঠী উক্ত ঘটনাকে তুরানীদের বিশ্বাসঘাতকতার নজীর হিসেবে পেশ করলো এবং জাকারিয়া খানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটালো যে, সে ইরানীদের সাথে যোগসাজশ করে দেশকে বিক্রি করে দিয়েছে। অথচ জাকারিয়া খান যখন ইরানী আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য বারংবার সাহায্য চাইছিলেন, তখন এই ভারতীয় গোষ্ঠীই তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছিল এবং তার সাহায্যের জন্য একটি পয়সা এবং একজন সৈন্যও পাঠায়নি।

প্রস্তুত ছিল না। জয় সিং এবং রাজপুত সরদাররা এই নাজুক মুহূর্তের সুযোগ গ্রহণ করে মোগল আনুগত্যের জোয়াল ছুড়ে ফেলতে প্রস্তুত হয়ে গেল। বাজীরাও দৃশ্যত সাহায্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও সে কার্যত উত্তর ভারতের প্রতিরক্ষায় আদৌ মনোনিবেশ করলো না। শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য নর্বদা ও বিন্ধ্যাচলের রক্ষাব্যূহগুলো আগলে রাখার প্রতি সর্বাত্মক মনোযোগ দিল।[১]

মোটকথা, এই দলাদলি ও আভ্যন্তরীণ কোন্দলে তারা পুরো এক মাস নষ্ট করে দিল। এক সময় সংবাদ এল যে, নাদির শাহ অটকের এ পারে এসে নেমেছেন। এই তিন আমীর অগত্যা লাহোর অভিমুখে রওনা হলেন। কিন্তু পানিপথ পর্যন্ত পৌছতেই তারা খবর পেলেন যে, নাদির শাহ লাহোর দখল করে নিয়েছেন। তারা আর কি করবেন। ওখানেই শিবির স্থাপন করলেন এবং মুহাম্মদ শাহকে অনুনয় বিনয় করে লিখলেন যে, স্বয়ং আপনাকে আসতে হবে, নচেত কাজ হবে না। অগত্যা মুহাম্মদ শাহকে আপন আয়েশী প্রাসাদ থেকে বেরুতেই হলো। পানি পথ পৌছে তিনি কি পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালানো যায়, সে ব্যাপারে সেনাপতিদের পরামর্শ চাইলেন। নিযামুল মুল্‌ক অভিমত দিলেন যে, কর্ণাল যেয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া হোক। কেননা সেখানে প্রশস্ত ময়দান রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী আলী মরদান নদী থেকে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। সমর পরিষদের অন্যান্য সদস্যও এই অভিমত সমর্থন করলেন। ১৭৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কর্ণালে গিয়ে শিবির স্থাপন করা হলো। মোগল সৈন্যরা ১২ মাইল বিস্তৃত ময়দানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান নিল। তাদের পার্শে পরিখা খনন ও মাটির প্রাচীর নির্মাণ করা হলো। মাঝখানে উঁচু ঢিবি তৈরী করে তার ওপর কামান স্থাপন করা হলো। এর এক সপ্তাহ পর নাদির শাহও মোকাবিলায় এলেন এবং কর্ণাল থেকে ৬ মাইল দূরে শিবির স্থাপন করলেন। এই মোকাবিলায় নাদির শাহ ও মুহাম্মদ শাহের শক্তির তারতম্য নির্ণয়ের জন্য এটুকু জানাই যথেষ্ট নয় যে, নাদির শাহের পক্ষে দেড় লাখ এবং মুহাম্মদ শাহের পক্ষে দশ লক্ষ সৈন্য ছিল। সেই সাথে উভয়ের পার্থক্যটাও জানা জরুরী। নাদিরের দেড় লক্ষ্যের মধ্যে ৫০ হাজার ছিল দক্ষ যোদ্ধা সৈনিক এবং বাকী এক লাখ সেনাবাহিনীর সহযোগী অযোদ্ধা। অন্য কথায়, বাহিনীর পুরো এক তৃতীয়াংশই যোদ্ধা সৈনিক ছিল। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ শাহের শিবিরে ৭৫ হাজারের বেশী যোদ্ধা সৈনিক ছিল না। এদিক থেকে এ শিবিরে যোদ্ধা ও অযোদ্ধাদের সংখ্যার হার ছিল ১ ও ১২। অপর দিকে নাদির শাহের শিবিরে

---

১. বাজীরাও একটি চিঠিতে পীলাজী যদুকে লিখেছিল ঃ "আমি উত্তর ভারত অভিমুখে যাত্রা করবো। ইরানের শাহ দিল্লীকে পদানত করার জন্য অভিযানে বেরিয়েছে। আমি মুহাম্মদ শাহের সাহায্যের জন্য মালিহার রাও হোলকার রানুজী সিন্ধিয়া এবং উদাজী পাওয়ারের নেতৃত্বে মালোহের সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে দিল্লীর সম্রাটকে সাহায্য করতে মারাঠা রাজ্য গর্ববোধ করে।"

অযোদ্ধা ভৃত্য, শিক্ষানবিশ, সহিস এমনকি নারীরা পর্যন্ত সশস্ত্র ছিল। সকলের পরিবহনের জন্য ঘোড়া ছিল এবং প্রয়োজনের সময় প্রত্যেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ শাহের শিবিরে হেরেমের মহিলা, দাসী, ভৃত্য, প্রাসাদ সেবী ও আমীরদের আপনজনদের এক বিরাট জনগোষ্ঠী ছিল, যারা জীবনে কখনো যুদ্ধই দেখেনি। এ পরিস্থিতিতে নাদির শাহের বাহিনীর প্রতিটি সৈনিকের ওপর যেখানে মাত্র দু'জন অযোদ্ধা সহযোগীর হেফাজতের দায়িত্ব ছিল, আর তাও এমন দু'জন, যারা প্রয়োজনের সময় আত্মরক্ষায় সক্ষম, সেখানে মুহাম্মদ শাহের বাহিনীর প্রত্যেক সৈনিকের ওপর বাহিনীর ১২ জন একেবারেই অক্ষম ও অথর্ব অযোদ্ধাকে সংরক্ষণের ভার অর্পিত ছিল। তাছাড়া উভয় বাহিনীর সামরিক মানেও আকাশ পাতাল ব্যবধান ছিল। নাদির শাহের দুর্জয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তার গোটা বাহিনীকে একটা শিশা ঢালা প্রাচীরে পরিণত করেছিল। অথচ মুহাম্মদ শাহের বাহিনী একটা বিক্ষিপ্ত পংগপাল ছাড়া আর কিছু ছিল না। নাদির শাহী বাহিনীতে আনুগত্য ও শৃংখলা এত উচ্চ মানের ছিল যে, ৫০ হাজার মানুষ এক ব্যক্তির হাতের ইশরায় উঠাবসা করতো, একটি হাতের সাথে ৫০ হাজার হাত উত্তোলিত হতো এবং একটি পায়ের সাথে ৫০ হাজার পা সামনে এগুতো। গোটা বাহিনীকে একটা জীবন্ত পর্বত মনে হতো, যাকে একটি শক্তিশালী হাত যেদিক ইচ্ছা নাড়াতো। আর মোগল বাহিনীতে না ছিল আনুগত্য, না ছিল শৃংখলা, আর না ছিল চিন্তা ও কর্মের ঐক্য। এই বিশৃংখল বাহিনীতে কোন আদেশদাতাও ছিল না, আদেশ মান্যকারীও ছিল না। যেন ৭৫ হাজার বিক্ষিপ্ত নুড়ি পাথরের সমাবেশ। এই নুড়ি পাথরগুলোকে একটা দুর্লংঘ্য প্রাচীরে পরিণত করার মত কোন বন্ধন সেখানে বিদ্যমান ছিল না।

এই ব্যবধানকে বিবেচনায় নিলে যে কোন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারতো যে, নাদির শাহ ও মুহাম্মদ শাহের বাহিনীর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন তুলনাই চলে না। এ কারণেই নিযামুল মুল্‌ক চাইছিলেন যে, যতদূর সম্ভব যুদ্ধ এড়িয়ে যাবেন এবং যুদ্ধ মুলতবী রাখতে সক্ষম হলে পরবর্তী পর্যায়ে কেবল স্বীয় কূটনৈতিক দক্ষতা দ্বারা নাদির শাহকে সন্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। কিন্তু যারা যুদ্ধে শুধু হাতের ব্যবহার জানতো এবং মস্তিষ্ক প্রয়োগ করতে জানতো না, তারা কিছুতেই বুঝতে সক্ষম হলো না যে, যুদ্ধ এড়ানোর দরকার কি। মুহাম্মদ শাহের কাছে যখন নাদির শাহের তুলনায় অনেক বেশী সৈন্য, কামান বহর, যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং ধন-সম্পদ রয়েছে তখন তার যুদ্ধ না করার কি কারণ থাকতে পারে। এ ধরনের লোকেরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধিয়েই ছাড়লো আর তাও মাত্রাতিরিক্ত ক্ষীপ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে এমনভাবে বাধালো যে, তার পরিণাম যতটা আশংকা করা গিয়েছিল তার চেয়েও অধিক শোচনীয় হয়ে দেখা দিল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী অযোধ্যার সুবেদার বুরহানুল মুল্‌ক সাদত খান মুহাম্মদ শাহের সাহায্যের জন্য বিশ বা ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ক্ষীপ্র গতিতে ছুটে এসে

কর্ণাল পৌঁছলেন। তাঁর আগমনের পর সামরিক পরিষদের এক সভা বসলো। এতে সাদত খানও যোগ দিলেন। পরামর্শ চলাকালেই খবর পাওয়া গেল যে, সাদত খানের যে রসদপত্র পেছনে পেছনে আসছিল, নাদির শাহের লুটেরা সেনারা তা লুণ্ঠন করেছে এবং প্রহরীদেরকে হত্যা করেছে। সাদত খান এ খবর শোনামাত্রই উত্তেজিত হয়ে তলোয়ার বের করলেন এবং সম্রাটের কাছে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। নিযামুল মুল্‌ক এই তাড়াহুড়োর তীব্র বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন যে, প্রথমত অযোধ্যার বাহিনী পুরো এক মাস ধরে ধাওয়া করে ছুটে এসেছে। এই শ্রান্ত ক্লান্ত বাহিনীকে নিয়ে নাদিরের সুস্থ সতেজ বাহিনীর সাথে লড়তে যাওয়া নিদারুণ নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। দ্বিতীয়ত এত বড় যুদ্ধ এত তাড়াহুড়ো করে করতে নেই যে, ইচ্ছা হলেই ময়দানে ঝাপিয়ে পড়া হবে। এর জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়। এখানে রণাঙ্গনে যাওয়ার কোন প্রস্তুতি নেই। সামসামুদ্দৌলা এবং আরো কতিপয় কর্মকর্তাও যুদ্ধ পরের দিনের জন্য স্থগিত রাখার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু সাদত খান কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি তৎক্ষণাত স্বীয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের ঘোষণা জারী করে দিলেন এবং প্রথম ঘোষণার সংগে সংগে যারা তাঁর কাছে সমবেত হলো তাদেরকে নিয়ে তিনি রণাঙ্গনে ছুটে গেলেন। তার এই সেনাদলে পাঁচ হাজারের বেশী সৈন্য ছিল না। কারণ শ্রান্ত ক্লান্ত যেসব সৈনিক এখনো কোমর খুলে বিশ্রাম নিতেও পারেনি, তারা স্বভাবতই যুদ্ধের আওয়াজে সাড়া দিতে অক্ষম ছিল।

সাদত খান যখন নাদির শাহের সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালালেন তখন আক্রান্ত বাহিনী সামান্য প্রতিরোধ করে পশ্চাদাপসরণ করলো। সাদত খান ভাবলেন ওরা পরাজিত হয়ে পালাচ্ছে। তাই তাদের পিছু ধাওয়া করে যেতে লাগলেন এবং সম্রাটকে বার্তা পাঠালেন যে, আমরা বিজয়ের কাছাকাছি এসে গেছি। সামান্য কিছু সৈন্য পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হোক। নিযামুল মুল্‌ক অনেক বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে, এটা ইরানীদের একটা সামরিক কৌশল মাত্র। তারা পশ্চাদাপসরণ করে সাদত খানকে ধোঁকা দিচ্ছে। যখন তারা স্বীয় কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে চলে যাবে, তখন আকস্মিকভাবে পাল্টা আঘাত হানবে। কিন্তু নিযামুল মুল্‌কের এ বক্তব্য কেউ বুঝতে পারলো না। সামসামুদ্দৌলাও কোন প্রস্তুতি ছাড়া মাত্র ৮ হাজার সৈন্য নিয়ে রণাঙ্গনে ছুটে গেলেন। এ বাহিনী ময়দানে পৌঁছার আগেই নাদির শাহ বুরহানুল মুল্‌কের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে বসলেন। মাত্র এক ঘন্টার মধ্যেই তার সমগ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে স্বয়ং সাদত খানকে গ্রেফতার করা হলো। এরপর নাদির শাহী বাহিনী সামসামুদ্দৌলার বাহিনীর দিকে অগ্রসর হলো এবং দু' ঘন্টা ব্যাপী তুমুল যুদ্ধ চালিয়ে তাকেও পরাজিত করলো। তার বাহিনীর শীর্ষ স্থানীয়

সেনাপতিরা নিহত হলো। তিনি নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ফিরে এলেন এবং দু'দিন পরেই মারা গেলেন।[১]

এই পরাজয় সমগ্র ভারতীয় বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দিল এবং প্রতিরোধের অবশিষ্ট ক্ষমতাও শেষ করে দিল। রাত্রে পরামর্শ সভা বসলে তাতে সম্রাট, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ পরের দিন অবশ্যই যুদ্ধ করা উচিত—এই মর্মে মত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু নিযামুল মুল্‌ক তাদেরকে বুঝালেন যে, এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করার পরিণাম অনিবার্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছু হবে না। সুতরাং নাদির শাহের সাথে সন্ধির চেষ্টা চালানোই উত্তম। অপর দিকে বুরহানুল মুল্‌ক সাদত খানের সাথে নাদির শাহ কথাবার্তা বললেন। তিনি বললেন ঃ "আমরা উভয়ে সমমনা ও সমগোত্রীয়।[২] আমাকে তুর্কী সুলতানের সাথে লড়াই করার জন্য ফিরে যেতে হবে। তোমাদের সম্রাটের কাছ থেকে কিভাবে সহজে মুক্তিপণ আদায় করা যায়, সে ব্যাপারে পরামর্শ দাও।" তিনি জবাব দিলেন ঃ "নিযামুল মুলকের হাতে ভারত সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি। তাকে ডাকুন এবং সন্ধির শর্তাবলী স্থির করুন।" পরের দিন নাদির শাহ মুহাম্মদ শাহের নিকট দূত পাঠিয়ে নিযামুল মুল্‌ককে তলব করলেন এবং কুরআনের কসম খেয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, নিযামুল মুল্‌কের কোন ক্ষতি করা হবে না। সাদত খানও সেই সাথে একটা চিঠি দিয়ে মুহাম্মদ শাহকে অনুরোধ করলেন যে, সন্ধির ব্যাপারে আলাপ আলোচনার জন্য নিযামুল মুল্‌ককে পাঠিয়ে দিন। সে সময় মুহাম্মদ শাহের কাছে প্রবীণতম আমীরদের মধ্যে একমাত্র নিযামুল মুল্‌কই অবশিষ্ট ছিলেন। তাই তাঁকে পাঠাতে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ "তোমার সাথে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় তাহলে আমি কি করবো ?" নিযামুল মুল্‌ক জবাব দিলেন যে, "আমাদের ও তার মাঝে কুরআন রয়েছে।" যদি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় তবে আল্লাহ প্রতিশোধ নেবেন। সে ক্ষেত্রে আপনি মাণ্ডো কিংবা অন্য কোন মজবুত দুর্গে আশ্রয় নেবেন এবং নাসের জংকে দিল্লী থেকে ডেকে এনে ইরানীদের সাথে যুদ্ধ করবেন। অবশেষে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নিযামুল মুল্‌ক ভারত সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি হিসেবে নাদির শাহের কাছে গেলেন। নাদির শাহ তার সাথে ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করলেন। আলোচনা চলাকালে ইরান সম্রাট তাঁর ব্যক্তিত্ব

১. মুহাম্মদ শাহের বাহিনীর নৈতিক অধোপতন কতদূর পৌঁছেছিল তা অনুধাবন করার জন্য একটি ঘটনাই যথেষ্ট। সাদত খান ও সামসামুদ্দৌলা যেই রণাঙ্গনে গেলেন, অমনি তার বাহিনীর পান্ডারাই তার শিবিরের ও পশুশালার যাবতীয় জিনিসপত্র লোপাট করে ফেললো। এমনকি তার বাহিনীর অবস্থানস্থলের কোন নামনিশানাই রইল না। সামসামুদ্দৌলাকে যখন মুমূর্ষ অবস্থায় রণাঙ্গন থেকে আনা হলো, তখন তার মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও অবশিষ্ট ছিল না। সাথীরা তার জন্য একটা তাঁবু চেয়ে এনে তার নীচে তাকে রাখলো। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তার নিজ শিবিরে এহেন শোচনীয় পরিস্থিতিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

২. নাদির শাহ ও বুরহানুল মুলক উভয়ে শীয়া মতাবলম্বী ছিলেন।

বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় অভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ভারত সম্রাটের কাছে তোমার মত কর্মকর্তা থাকতে অসভ্য জংলী মারাঠারা কিভাবে লুটতরাজ চালাতে চালাতে দিল্লীর প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে যায় এবং তার কাছ থেকে পণ আদায় করে।" নিযামুল মুল্ক জবাব দিলেন ঃ "নতুন কর্মকর্তাদের দাপট বেড়ে যাওয়ার পর থেকে সম্রাট খেয়াল খুশীমত কাজ করেন এবং আমার পরামর্শ তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্য হতাশ হয়ে আমি দাক্ষিণাত্যে গিয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করেছি।" এরপর সন্ধির আলোচনা শুরু হয়। উভয় পক্ষে মতামত বিনিময়ের পর স্থির হয় যে, নাদির শাহ ৫০ লাখ রুপিয়া নিয়ে ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন।[১] এর মধ্যে ৩০ লাখ রুপিয়া এক্ষুণি দিতে হবে। দশ লাখ অটক অতিক্রম করার পর এবং দশ লাখ কাবুলে দিতে হবে। এই সমঝোতার পর নিযামুল মুল্ক নাদির শাহী বাহিনীর শিবির থেকে ফিরে এলেন। নাদির শাহ তার মাধ্যমে মুহাম্মদ শাহকে পরের দিন তার সাথে ভোজে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। পরের দিন নিযামুল মুল্ক মুহাম্মদ শাহকে সাথে করে নাদির শাহের কাছে গেলেন। তাঁর সাথে ইতিমাদুদ্দৌলা কামরুদ্দীন খান এবং মু'তামানুদ্দৌলা ইসহাক খানও যোগ দিলেন।

এই বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাতকারের পর সকলে আশ্বস্ত হয়েছিল যে, ইরান ও ভারতের মধ্যে সন্ধি সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু একটি ঘটনা সহসা সমগ্র পরিস্থিতিকে পাল্টে দিল। সর্বাধিনায়ক সামসামুদ্দৌলার মৃত্যু হয়েছে কয়েকদিন আগেই। তাই মুহাম্মদ শাহ নাদির শাহের দাওয়াত থেকে ফিরে এসে নিযামুল মুল্ককে তার স্থলে প্রধান সেনাপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। পরক্ষণেই নিযামুল মুল্ক এই পদ স্বীয় জেষ্ঠ পুত্র গাজীউদ্দীন খান ফিরোজ জং-এর কাছে হস্তান্তর করলেন। নাদির শাহের সেনাশিবিরে বন্দী বুরহানুল মুলক সাদত খান যখন এ খবর অবগত হলেন, তখন তার মর্মপীড়ার অবধি রইল না। কেননা তিনি নিজে এই পদের প্রার্থী ছিলেন। প্রতিহিংসার আবেগে বেশামাল হয়ে তিনি নিযামুল মুলকের সম্পাদিত সন্ধি চুক্তি নস্যাত করতে কৃতসংকল্প হলেন। তিনি নাদির শাহের সাথে সাক্ষাত করে বললেন ঃ "ভারত সাম্রাজ্য থেকে মাত্র ৫০ লাখ রুপিয়ার বিনিময়ে সন্ধি করা কোন বুদ্ধিমত্তার কাজ হয়নি। আপনি যদি কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে দিল্লী যান, তাহলে ২০ কোটি রুপিয়া মূল্যের সোনা ও মনিমুক্তো সহজেই পেতে পারেন। মুহাম্মদ শাহের প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা নেই। তার সকল প্রধান কর্মকর্তা খতম হয়ে গেছে। আছেন শুধু নিযামুল মুল্ক, যিনি খুবই ধুরন্ধর ও চতুর হওয়ার কারণে বিপদের কারণ হতে পারেন। তাকে আপনি সাক্ষাতের ছলে ডেকে এনে বন্দী করে ফেলুন। এরপর আপনার পথ কেউ আটকাতে পারবে

১. সিয়ারুল মুতায়াখখিরীন ও ফতুহাতে আসফী গ্রন্থের বর্ণনা মতে দুই কোটি রুপিয়ার বিনিময়ে সন্ধি হয়।

না।" নাদির শাহ এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং নিযামুল মুল্ককে পরামর্শের বাহানায় ডেকে পাঠালেন। নিযামুল মুল্ক সন্ধির ওপর আস্থাশীল হয়ে ২২শে ফেব্রুয়ারী তার কাছে গেলেন এবং যাওয়া মাত্রই বন্দী হয়ে গেলেন। নাদির শাহ তাকে জানালেন যে, আগের চুক্তি আমাদের মনোপূত নয়। ২০ কোটি রুপিয়া এবং ২০ হাজার সৈন্য আমাকে দিতে হবে—তবেই সন্ধি হবে। নিযামুল মুল্কের কাছে এ দাবী একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি জবাব দিলেন ঃ "মোগল বংশের রাজত্ব শুরুর পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনো কোষাগারে ২০ কোটি রুপিয়া জমা পড়েনি। শাহজাহান অনেক চেষ্টা-সাধনা করেও ১৬ কোটির বেশী সঞ্চয় করতে পারেননি। আর এই অর্থও পরবর্তী সময়ে আলমগীর দাক্ষিণাত্যের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহে খরচ করে ফেলেছেন। এ মুহূর্তে তো কোষাগারের অবস্থা এরূপ যে, ৫০ লাখ রুপিয়া আছে কিনা তাও বলা কঠিন।" কিন্তু নাদির শাহ এসব ওজর আপত্তিতে কর্ণপাত করলেন না। তিনি বললেন যে, আমার দাবী পূরণের আগে তুমি মুক্তি পাবে না।

এরপর নাদির শাহ নিযামুল মুল্ককে চাপ দিলেন যে, মুহাম্মদ শাহকে নাদির শাহী বাহিনীর শিবিরে আসতে বল। এ ব্যাপারে তিনি অনেক বাদপ্রতিবাদ করলেন। কিন্তু নাদির শাহ নাছোড় বান্দা। তিনি চাপ প্রয়োগের মাত্রা ক্রমেই তীব্রতর করলেন। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে তিনি মোগল সম্রাটকে সমস্ত ঘটনা লিখে জানালেন এবং একথাও লিখলেন যে, নাদির শাহ আপনাকে এখানে হাজির করার জন্য জিদ ধরেছে। চিঠি পেয়ে মুহাম্মদ শাহ আতংকে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তার কাছে এ সময় শীর্ষস্থানীয় প্রবীণ কর্মকর্তাদের কেউ ছিল না, যার সাথে পরামর্শ করবেন। প্রধানমন্ত্রী কামরুদ্দীন খান সাফ জবাব দিলেন যে, আমার মাথায় কিছুই আসছে না। নিম্নস্তরের কর্মকর্তারা বললেন ঃ "আমরা জান দিতে রাজী। আর একবার লড়াই করে দেখুন।" কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে যুদ্ধের পরিণাম কি হতে পারে, সেটুকু বুঝবার ক্ষমতা মুহাম্মদ শাহের ছিল। কোন দিক থেকে কোন আশার আলো দেখতে না পেয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে, ভাগ্যে যা থাকে হবে, তিনি নাদির শাহের কাছে যাবেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী তিনি নাদির শাহের কাছে গেলেন এবং যাওয়া মাত্রই বন্দী হলেন। পরের দিন প্রধানমন্ত্রী কামরুদ্দীন খানও এসে বন্দী হয়ে গেলেন। এ সময় মুহাম্মদ শাহের বাহিনীতে ঘোষণা করে দেয়া হলো যে, সৈন্যদের যার ইচ্ছা কর্ণালে থাকতে পারে, যার ইচ্ছা দিল্লীতে ফিরে যেতে পারে। এরপর সম্পূর্ণ রাখাল বিহীন দশ লাখের এই বিশাল ভেড়ার পালের কি অবস্থা হয়ে থাকতে পারে, তা অনুমান করাও কঠিন। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। চরম বিশৃংখলা ও হতবুদ্ধিতার মধ্য দিয়ে বাহিনীর লোকজন দিল্লী অভিমুখে রওনা হলো এবং পথিমধ্যে হানাদার কিজলিবাস সৈন্যের লুটেরা দলগুলো মনের সাধ মিটিয়ে তাদেরকে লুণ্ঠন করলো।

মুহাম্মদ শাহ যেদিন গ্রেফতার হলেন, তার পরের দিন নাদির শাহ সাদাত খানকে স্বীয় বাহিনীর জনৈক সেনাপতি তাহমাসপ খান সমভিব্যাহারে দিল্লী পাঠিয়ে দিলেন। তারা উভয়ে নগর প্রশাসক লুৎফুল্লাহ খান সাদেকের কাছ থেকে সকল দুর্গ, কোষাগার ও কারখানার চাবি হস্তগত করলেন। এরপর (মার্চ মাসে) জিলহজ্জ মাসের শুরুতে নাদির শাহ স্বয়ং মুহাম্মদ শাহকে সাথে নিয়ে দিল্লী রওনা হলেন। ৯ই জিলহজ্জ মোতাবেক ৯ই মার্চ তারা দিল্লীতে প্রবেশ করলেন।[১] পরের দিন শাহী ঈদগাহে এবং নগরীর সকল মসজিদে নাদির শাহের নামে খুৎবা পড়া হলো। এর অর্থ এই যে, আনুষ্ঠানিকভাবে এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হলো যে, এখন মুহাম্মদ শাহ নয় নাদির শাহই ভারত সাম্রাজ্যের সর্বময় অধিপতি। কিন্তু নাদির শাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভারতের সিংহাসন দখল করা ছিল না বরং মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের ধনরত্ন কুক্ষীগত করা। তিনি এই ঘোষণা দ্বারা আরো একটা সুবিধা অর্জন করলেন। ঈদের নামাযের পর তিনি যখন মুহাম্মদ শাহের ভোজে অংশ গ্রহণ করলেন, তখন সেখানে বললেন যে, "প্রথম দিন যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে আমি তার ওপরই অটল রয়েছি। ভারতের সিংহাসন আমি মুহাম্মদ শাহকেই সমর্পণ করছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে আমি মুহাম্মদ শাহকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকবো। কেননা আমরা উভয়ে একই তুর্কমানী জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ।" মুহাম্মদ শাহ স্বীয় প্রাণ ও সিংহাসন উভয়টি ফিরিয়ে দেয়ায় নাদির শাহকে পরম আনন্দের সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। আর এর বিনিময়ে কোটি কোটি রুপিয়া মূল্যের সোনা, মনিমুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস উপঢৌকন দিলেন। নাদির শাহ প্রথমে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু মুহাম্মদ শাহ প্রবলভাবে পীড়াপীড়ি করতে থাকায় পাছে "তিনি মনে কষ্ট পান" এই আশংকায় উক্ত উপঢৌকন গ্রহণ করলেন এবং এবং স্বীয় কোষাধ্যক্ষকে ওগুলো গ্রহণ করার কাজে নিয়োজিত করলেন। মনে হয় যেন পুরো ব্যাপারটা একটা সাজানো নাটক ছিল এবং এতে ইরানী নাট্যকার আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন নাটকের কোন্ অংশে তিনি নিজে অভিনয় করবেন আর কোন্ অংশে মুহাম্মদ শাহকে অভিনয় করতে হবে। আর এই সমগ্র নাটকটির উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে লুন্ঠনকে উপঢৌকনের পোশাক পরিয়ে দেয়া।

কিন্তু দিল্লীর ভাগ্য তখনো আরো ধ্বংসযজ্ঞের প্রতীক্ষায় ছিল। ১০ই জিলহজ্জ সন্ধ্যায় শহরের উচ্ছৃংখল লোকেরা সহসা এক ব্যাপক দাংগা বাধিয়ে বসে। যেসব ইরানী সৈন্য শহরে ঘোরাঘুরি করছিল, তাদেরকে তারা ধরে ধরে হত্যা করা শুরু করে। এই হত্যাযজ্ঞের একাধিক কারণ ছিল। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, শহরের একশ্রেণীর অর্বাচীন লোক গুজব রটিয়ে দেয় যে, দুর্গের ভেতরে জনৈক দুঃসাহসী ঘাতক মুহাম্মদ শাহের ইংগিতে

১. ৯ই ও ১০ই জিলহজ্জের মধ্যবর্তী রাতে সাদাত খান মৃত্যু বরণ করলেন।

নাদির শাহকে খতম করে দিয়েছে। এ গুজব মুহূর্তের মধ্যে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং বখাটে তরুণরা এখন আর ইরানীদের কোন সহায় নেই ভেবে তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। কিন্তু ঐতিহাসিক আবুল ফয়েজের বর্ণনা অন্য রকম। তিনি তখন দিল্লীতেই অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেনঃ ইরানী সৈন্যরা যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বিজিত শহরের অধিবাসীদের ওপর তারা সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন চালায়। কারোর জানমাল ও মানসম্ভ্রম তাদের হাত থেকে নিরাপদ ছিল না। তারা নির্দ্বিধায় নাগরিকদের গৃহে ঢুকে পড়তো এবং যা ইচ্ছে তা-ই করতো। এতে করে শহরবাসী প্রচণ্ড উদ্বেগ ও উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং হিংসাত্মক হানাহানিতে লিপ্ত হয়। খানে জাহান এ ব্যাপারে নাদির শাহের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে তিনি প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে একজন করে মিলিটারী পুলিশ নিয়োগ করার নির্দেশ দেন, যার দায়িত্ব হবে সৈন্যদেরকে যে কোন অশোভন কাজ থেকে বিরত রাখা। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার আগেই নাদির শাহের নিহত হওয়ার গুজব রটে যায় এবং উচ্ছৃংখল লোকেরা হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। আরেকজন সমকালীন ঐতিহাসিক হরিচরণ দাস আবুল ফয়েজের বর্ণনাকে সমর্থন করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক হানওয়ের (Hanway) বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটির সূচনা এভাবে ঘটে যে, তাহমাসপ খান জালায়ের পাহাড়গঞ্জ অঞ্চলের খাদ্য শস্যের আড়তদারদেরকে শস্য গুদাম খোলা ও মূল্য নির্ধারণের নির্দেশ দেয়ার জন্য ইরানী বাহিনীর কতিপয় সামরিক পুলিশকে পাঠিয়েছিল। মূল্য নির্ধারণের প্রশ্নে আড়তদার ও সামরিক পুলিশদের মধ্যে ঝগড়া বাধে এবং তারা সামরিক পুলিশদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করে ফেলে। এই ঝগড়া ক্রমশ অন্যান্য বাজারেও ছড়িয়ে পড়ে এবং নাদির শাহের নিহত হওয়ার খবরে তা ব্যাপকতর দাংগার রূপ নেয়।

সূচনা যেভাবেই ঘটে থাকুক না কেন, দশই জিলহজ্জের সন্ধ্যা থেকে এগারই জিলহজ্জের সকাল পর্যন্ত দিল্লীর দাংগাবাজ লোকেরা ইরানীদের ওপর অবিরাম হামলা চালাতে থাকলো এবং সারা রাতে তারা তিন চার হাজার লোককে হত্যা করলো। নাদির শাহ্ প্রথমটায় এ খবর বিশ্বাস করেননি। তিনি বললেন যে, পরাজিত ভারতীয়দের এতটা দুঃসাহস হতেই পারে না যে আমার সৈন্যদের ওপর হামলা চালাবে। এটা স্বয়ং আমার বাহিনীর মনগড়া কাহিনী। শহরে লুটপাট চালানোর একটা ছুতো বের করার জন্য এ কাহিনী রচনা করা হয়েছে। কিন্তু ক্রমাগত নালিশ আসতে থাকায় ১১ই জিলহজ্জ সকালে তিনি স্বয়ং প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য দুর্গ থেকে বেরুলেন। তিনি স্বচোক্ষেই দেখতে পেলেন যে, নগরবাসী দাংগায় মেতে আছে। চাঁদনী চকে সোনালী মসজিদ নামে খ্যাত, রওশনুদ্দৌলা মসজিদের কাছে পৌঁছে লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন কোন্ কোন্ এলাকায় তাঁর সৈন্যদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। অতপর নিজে উন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে বসে গেলেন।

ইরানীদের কাছে এটি গণহত্যা চালানোর নির্দেশের ইংগিতবহ ছিল। এ ইংগিত পাওয়া মাত্রই হাজার হাজার কিজলিবাস, তুর্কমান, উজবেক, বালুচ ও আফগান দিল্লীবাসীর ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। যে যে মহল্লায় নিহত ইরানীদের লাশ দেখা গেল, সেখানে কাউকে জ্যান্ত রাখলো না। তারা ঘরবাড়ী লুটপাট করলো, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করলো, নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করলো। কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভারতের কোলাহল মুখর রাজধানী এক ভয়াবহ প্রেতপুরীতে পরিণত হলো। অসহায় সম্রাট মুহাম্মদ শাহ স্তম্ভিত হয়ে নিজ শহরের ধ্বংসযজ্ঞে তান্ডবলীলা দেখতে লাগলেন। সাম্রাজ্যের উর্ধতন কর্মকর্তাদের মধ্যে কারোর এতটুকু সাহস হলো না যে, নাদির শাহের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে। অবশেষে যখন ধ্বংসলীলা চরম আকার ধারণ করলো[১] তখন বেলা দু'টোর কাছাকাছি সময়ে মুহাম্মদ শাহ নিযামুল মুলককে অনুরোধ করলেন নাদির শাহের নিকট গিয়ে করুণা প্রার্থনা করার জন্য। বয়সে প্রবীন হওয়া ছাড়াও শান্ত সৌম্য ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ এবং সুগভীর পান্ডিত্য ও তিক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হওয়ার সুবাদে নিযামুল মুল্কের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল নাদির শাহের ওপর। দরবারের সভাসদদের মধ্যে তিনি কেবল তাকেই শ্রদ্ধার পাত্র মনে করতেন। রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক বৈঠকাদিতে যে ব্যক্তি নাদির শাহের সাথে নির্ভয়ে কথা বলতো এবং যার কথাবার্তা তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, সে ব্যক্তি নিযামুল মুল্ক ছাড়া আর কেউ নন। এ জন্য মুহাম্মদ শাহ ও তার সভাসদগণ ভাবলেন এই ক্রোধোদ্দীপ্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে একমাত্র এই প্রবীণতম ব্যক্তিই নির্ভিক চিত্তে ও সাহসিকতার সাথে নাদির শাহের সাথে কথা বলতে পারবেন এবং একমাত্র তাঁর কাছেই এ প্রত্যাশা করা যায় যে, তিনি নিজের কথা দ্বারা নাদির শাহের রোষাগ্নি নির্বাপিত করতে পারবেন। তাই মুহাম্মদ শাহের নির্দেশে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নিযামুল মুল্ক এহেন ভয়াল পরিস্থিতিতে সোনালী মসজিদে উপস্থিত হলেন[২] এবং নাদির শাহের সামনে হাজির হয়ে করুণা ভিক্ষা চাইলেন। কথিত আছে যে, তিনি নাদির শাহকে সম্বোধন করে একচ্ছত্র ফার্সি কবিতা আবৃত্তি করেন, যার অর্থ নিম্নরূপ ঃ

---

১. বিভিন্ন ঐতিহাসিক এই গণহত্যায় নিহতদের বিভিন্ন রকম পরিসংখ্যান দিয়েছেন। আট হাজার থেকে শুরু করে তিন চার লাখ পর্যন্ত অনুমান করা হয়েছে। তবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অনুমান এই যে, এই দাংগায় ২৮ হাজার থেকে ত্রিশ হাজার লোক নিহত হয়েছিল। চাঁদনী চক, জামে মসজিদ ও পাহাড়গঞ্জ এলাকা, অধিকতর ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। এর মধ্যে অবমাননাকর মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য আত্মহত্যাকারীদের একটি বিরাট সংখ্যা রয়েছে। অনেকে নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে হত্যা করার পর অকুতোভয়ে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে। এছাড়া বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ ইরানীদের হাতে বন্দীও হয়।

২. আবুল ফয়েজ লিখেছেন যে, এ সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র ফিরোজ জং তাঁর সাথে গিয়েছিলেন। তবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্য এই যে, প্রধানমন্ত্রী ইতিমাদুদ্দৌলা কামরুদ্দীন খান তার সাথে গিয়েছিলেন।

"এমন কেউ আর বেঁচে নেই যাকে প্রতিহিংসার তরবারী দিয়ে হত্যা করতে পারবেন। তবে মৃত ব্যক্তিদেরকে যদি পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন তাহলে তাই করুন এবং পুনরায় হত্যা করুন।"

একথা শোনা মাত্রই নাদির শাহ বললেন ঃ "তোমার খাতিরে সবাইকে নিরাপত্তা দিলাম।" তরবারী খাপে ঢুকালেন এবং তৎক্ষণাত শহরে শান্তি পুনর্বহালের নির্দেশ দিলেন। সৈন্যদের ওপর নাদির শাহের এমন কড়া নিয়ন্ত্রণ ছিল যে, যে মুহূর্তে যে সৈনিক নাদির শাহের শান্তির ঘোষণা শুনেছে, সে মুহূর্তেই সে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

এরপর নগরবাসীর ওপর নেমে এল মুক্তিপণের খড়্গ। হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাওয়া আমীর ওমরা, বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত নাগরিক থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত কেউ এই অর্থদণ্ড থেকে রেহাই পেল না। এই অর্থদণ্ড বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমগ্র সম্পত্তির অর্ধেকের সমান ছিল এবং তা সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আদায় করা হলো। নগরীকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রত্যেক অঞ্চলে জরিমানার পরিমাণ নির্ণয় ও তা আদায়ের জন্য পাঁচজন ইরানী সেনাপতি ও পাঁচজন ভারতীয় কর্মকর্তা মোতায়েন করা হলো। ভারতীয় যেসব কর্মকর্তা এই কাজে নিযুক্ত হন, তারা হচ্ছেন নিযামুল মুল্ক, ইতিমাদুদ্দৌলা কামরুদ্দীন খান, জহীরুদ্দৌলা আযীমুল্লাহ খান, মোবারেজুল মুল্ক সারবলন্দ খান ও মোরতজা খান। যে মহল্লাগুলো নিযামুল মুল্ক ও ইতিমাদুদ্দৌলার অধীন ছিল, সেখানে পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায় উভয় ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত উদারতা দেখানো হয়। অধিকাংশ দরিদ্র লোকদের জরিমানা নিযামুল মুল্ক ও কামরুদ্দীন খান নিজ নিজ পকেট থেকে দিয়ে দেন। কিন্তু আযীমুল্লাহ খান, সারবলন্দ খান ও মোরতজা খান ইরানীদের সাথে আঁতাত করে স্বদেশবাসীর ওপর যারপরনাই নিপীড়ন চালান। কত পরিবার এতে দেউলে ও নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। ঘরের মেঝের ভেতরে ধনরত্ন লুকানো আছে এই সন্দেহে বহু বাড়ী খনন করে তল্লাশী চালানো হয়। মহিলাদের দেহের গহনাই শুধু নয়, কাপড় পর্যন্ত খুলে নেয়া হয়। রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে বেত্রাঘাত করে এবং সব রকমের দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে টাকা-পয়সা কোথায় কত আছে তার স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় এবং লুকানো সম্পদের সন্ধান জিজ্ঞেস করা হয়। অনেকে এসব লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করে। আবার অনেকে নির্যাতনের কঠোরতায় মারা যায়। মোটকথা, এসব উপায়ে নগরবাসীর কাছ থেকে দুই কোটি রুপিয়া লুণ্ঠন করা হয়। এছাড়া নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আরো কয়েক কোটি রুপিয়া আদায় করা হয়। এই পাইকারী লুণ্ঠন থেকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কামরুদ্দীন খানও নিস্তার পেলেন না। কথিত আছে যে, তাঁকে প্রখর রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় এবং যতক্ষণ তিনি নগদ অর্থ,

রত্নরাজি ও হাতি সহযোগে এক কোটি রুপিয়া দিতে স্বীকৃত হননি, ততক্ষণ তাঁকে ছাড়া হয়নি। কিন্তু এ পর্যায়েও নাদির শাহ্ নিযামুল মুল্‌কের সম্মান বজায় রেখেছিলেন এবং তার কাছ থেকে কোন পণ তলব করা হয়নি। এমনকি তাকে অপদস্থ করার মত কোন কথাও বলা হয়নি। দিল্লীতে নাদির শাহের আধিপত্য এবং তার সামনে মোগল সম্রাটের এমন শোচনীয় অসহায়াবস্থা সমগ্র ভারতে অস্থিরতা ও উদ্বেগের সঞ্চার করে। কেননা এ ঘটনা দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পূর্বাভাস বলে মনে হচ্ছিল। সবচেয়ে বেশী উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে সেই সব হিন্দু রাজ্য, যা মোগলদের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল অথবা স্বাধীন হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাদের আশংকা হলো যে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলীয় আরেকজন তেজদর্পী বিজেতা ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে এবং তার সরকার তাদেরকে পুনরায় এক দুশ্ছেদ্য দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবে। ঠিক এই সময়ে জনশ্রুতি রটে যে, নাদির শাহ্ হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর কবর জিয়ারতের জন্য আজমীর যেতে ইচ্ছুক। আজমীর ভ্রমণের পরিকল্পনাকে রাজপুতানা দখলের অভিলাস বলে বিশ্বাস করা হলো এবং সব ক'টি রাজপুত রাজ্য এতে প্রমাদ গুণলো। জয় সিং ও তার কর্মকর্তারা সকলে নিজ নিজ পরিবার পরিজন ও সহায়সম্পদ উদয়পুরের পার্বত্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরাও প্রস্তুত হয়ে বসে রইল যে, নাদিরের আগমন বার্তা পাওয়া মাত্রই চম্পট দেবে। রাজপুতানা দখলের পর মালোহ, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের দিকেও যে অগ্রাভিযান হবে, তা প্রায় নিশ্চিত ধরে নেয়া হলো। তাই বাজীরাও নর্বদা ও বিন্ধ্যাচলের রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললো এবং নিদেন পক্ষে চম্বল অঞ্চলটা সামাল দেয়া যায় কিনা তাই ভাবতে লাগলো। হোলকার, সিন্ধিয়া, জামনাজী আপা এবং অন্যান্য মারাঠা নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যস্ত ছিল। তাদের সবাইকে সে ডেকে পাঠালো এবং নাসের জংকে চিঠি লিখলো যে, এ মুহূর্তে আমাদের পারস্পরিক বিরোধে লিপ্ত থাকার কোন কারণ নেই। ভারতে এখন আমাদের সকলের দুশমন একজনই এবং তার প্রতিরোধের জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত ও ঐকবদ্ধ্য হতে হবে। কিন্তু এই সকল কাল্পনিক বিপদাশংকা অচিরেই দূর হয়ে গেল। নাদির শাহ ভারত দখলের চেয়ে ইরানের সমস্যাবলীর প্রতি অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। প্রায় দু'মাস দিল্লীতে থাকার পর তিনি স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৭৩৯ সালের ১লা মে তিনি দুর্গের অভ্যন্তরে এক দরবারের আয়োজন করেন। এই দরবারে মুহাম্মদ শাহ ও তাঁর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারাও অংশগ্রহণ করেন। এই দরবারে তিনি স্বহস্তে মুহাম্মদ শাহকে ভারত সাম্রাজ্যের মুকুট পরান এবং ঘোষণা করেন যে, আজ থেকে দেশে পুনরায় মুহাম্মদ শাহের নামে খুতবা ও মুদ্রা চালু হলো।[১] ভারতের সকল শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা, আঞ্চলিক শাসক ও

১. নাদির শাহের অবস্থানকালে মুহাম্মদ শাহের নামে খুতবা ও মুদ্রা স্থগিত ছিল। নাদির শাহকে শাহানশাহ বলে আখ্যায়িত করা হতো এবং খুতবায় তারই নাম ঘোষিত ও মুদ্রায় তারই নাম অংকিত থাকতো।

সুবেদারকে তিনি এখন থেকে মুহাম্মদ শাহের আনুগত্য করতে ও তাকে দেশের সম্রাট হিসেবে মেনে নিতে বললেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শাসক ও সুবেদারদেরকেও তিনি একই বার্তা পাঠালেন। নাসের জং রাজা সাহু এবং বাজীরাও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশেষত বাজীরাওকে তিনি এই বলে হুমকি দিলেন যে, "তুমি যদি মুহাম্মদ শাহের আনুগত্য না কর তাহলে আমি পুনরায় সৈন্য সামন্ত নিয়ে আসবো এবং তোমাকে সমুচিত শাস্তি দেবো।" এই সাথে তিনি মুহাম্মদ শাহকেও কিছু উপদেশ দেন। তাকে তিনি বলেন যে, তোমার যেসব ক্ষতিকর নীতির জন্য তোমার সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে তা পরিত্যাগ কর এবং দেশের স্থীতিশীলতা নিশ্চিত হয় এমন নীতি অবলম্বন কর। তুমি দেশের শাসনকার্য যাদের হাতে অর্পণ করেছ, তাদের মধ্যে একজনও এই গুরুদায়িত্ব বহনের যোগ্য বলে মনে হয়নি। যে দেশের পরিচালনা এমন লোকদের হাতে ন্যস্ত থাকে, সে দেশ যদি ধ্বংস হয়ে না যায় তবে সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। তোমার এখানে আমি মাত্র এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যিনি বিচক্ষণ অভিজ্ঞ এবং শাসকসুলভ গুণাবলীর অধিকারী। তিনি হচ্ছেন নিযামুল মুল্‌ক। তাঁকে উপদেষ্টা করে নেয়াই তোমার পক্ষে উত্তম। তার হাতে সমস্ত কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দাও।[১] মুহাম্মদ শাহ এই মুকুট পরানো ও উপদেশ দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এর বিনিময়ে সিন্ধু নদের অপর পারে অবস্থিত মোগল শাসিত সকল প্রদেশ উপঢৌকন হিসেবে পেশ করেন এবং সেই সাথে চাট্টা প্রদেশও যুক্ত করেন। এই দরবারের পর ৭ই সফর ১১৫২ হিজরী মোতাবেক ৫ই মে ১৭৩৯ খৃঃ নাদির শাহ দিল্লী থেকে ইরান রওনা হয়ে যান। এই হামলায় নাদির শাহের লাভ ও ভারতের ক্ষয়ক্ষতির সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি নিম্নে দেয়া যাচ্ছে ঃ শাহী কোষাগার থেকে নগদ ১৫ কোটি রুপিয়া, আমীর নাগরিকদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত মূল্যবান রত্নরাজি, যার মূল্য কয়েক কোটি রুপিয়ায় দাঁড়ায়। সম্রাট শাহজাহানের ময়ুর সিংহাসন এবং অন্যান্য রত্ন খচিত সিংহাসন, ৩০০টি হাতি, ১০ হাজার ঘোড়া, একই সংখ্যক উট, মোগল সাম্রাজ্যের ১৩০জন সুদক্ষ হিসাবরক্ষক ও অর্থ বিষয়ক কাজে পারদর্শী কর্মচারী, ৩০০জন নির্মাণ প্রকৌশলী ও রাজমিস্ত্রী, ২০০জন কামার, ২০০জন

---

১. আবুল ফায়েজ তাঁর এই উপদেশাবলীকে একটি ফার্সী কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। কবিতাটির মর্ম নিম্নে দেয়া হলো ঃ "ভারতের মত দেশটি তার সম্রাটের ভ্রান্ত কার্যকলাপের দরুন বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। যখন থেকে তুমি অসৎলোকদের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করেছ, তোমার দেশে নিয়ম শৃংখলা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। হে সম্রাট ! এখনো প্রশাসন তোমার আয়ত্বের বাইরে চলে যায়নি। যদি তুমি আত্মবিস্মৃতি পরিত্যাগ করে সচেতন হও তাহলে দেশে শৃংখলা ফিরে আসবে। তুমি যদি চাও জনমনে তোমার প্রতাপ বহাল থাকুক, তাহলে বাঘ ও ছাগলের পার্থক্য চিনে নাও। বহুদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা তুলে দাও। তাঁর সৎ পরামর্শে ও বিচক্ষণতায় তোমার শাসন মজবুত ও টেকসই হবে। মূর্খ বাচাল ও মদখোর বিলাসীদের প্রশ্রয় দিও না। স্বল্পভাষী আসফজাহ সম্রাটের শুভাকাংখী ও বাস্তববাদী তত্ত্বাবধায়ক। এই স্বনামধন্য ব্যক্তির পরামর্শ ছাড়া কোন রাষ্ট্রীয় কাজ করা তোমার পক্ষে সমিচীন নয়।"

কাঠমিস্ত্রী, ১০০জন পাথর খোদাই শিল্পী এবং বিভিন্ন পেশার বহুসংখ্যক দক্ষ কারিগর, যারা তৎকালে শুধু দিল্লীর নয় বরং সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ কারিগর ছিল। কাবুল, গজনী, কাশ্মীর, সিন্ধু, ঠাট্টা ও তার বন্দর—এক কথায় আটক উপকূলবর্তী সমগ্র ভূখণ্ড। এছাড়া পাঞ্জাবের অধিকাংশ উঁচু অঞ্চল যা নাদির শাহ কর্ণাল যুদ্ধের আগেই অধিকার করেছিলেন, তা তিনি মুহাম্মদ শাহের লাহোরের সুবেদার শাসনে বহাল রাখেন, কিন্তু এর বাবদে বার্ষিক ২০ লাখ রুপিয়া ভূমিকর ধার্য করেন।

আসফিয়া রাজ্যের ভৌগলিক পরিচিতি

নিযামুল মুলক যে ভূখণ্ডে নিজের স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, সেটা মোগল সাম্রাজ্যের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের ৬টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত। এই প্রদেশগুলোর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

(১) খান্দেশ প্রদেশ ঃ এর সীমানা নিম্নরূপ ঃ পূর্বে বেরার পাইল ঘাট, পশ্চিমে সুরাট জেলা, উত্তরে নর্বদা নদী, দক্ষিণে আওরংগাবাদ প্রদেশ। সাহিয়া চল পর্বতশ্রেণী এই দুই প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত। এই পর্বত শ্রেণীতেই অজন্তা অবস্থিত। আওরংগাবাদ প্রদেশ থেকে খান্দেশে যাওয়ার প্রাচীন পথ ফরদাপুরের পার্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। খান্দেশ প্রদেশের আয় কত ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতামতের বিভিন্নতা রয়েছে। মোনেম খান এবং কাদির খানের মতে ৫৮৮০২২২ রুপিয়া, খাজানায়ে রসূলখানী গ্রন্থের লেখকের মতে ৫৯৪৬১৬১ রুপিয়া, গুলজারে আসাফিয়া গ্রন্থকারের মতে ৩৮৬৩১১৯ রুপিয়া, গ্রান্ট ডোফের মতে ৫৭৪৯৯১৮ রুপিয়া। লক্ষীনারায়ণও এর কাছাকাছি পরিসংখ্যান দিয়েছেন। এ প্রদেশের জেলাসমূহ নিম্নরূপ ঃ (১) আসের জেলা—এতে ৩৩টি মহাল (তথা পরগনা বা তালুক) বুরহানপুর এই জেলাতেই অবস্থিত। (২) বিগলানা জেলা ঃ এ জেলায় ৩০টি অথবা ২৭টি মহাল রয়েছে। পূর্বে কালিনা ও নাদারবার জেলা, পশ্চিমে সুরাট জেলা, দক্ষিণে জাওয়ার ও তিল কোকন জেলা এবং উত্তরে তাপেতী নদী অবস্থিত। (৩) বিজাগড় খরগুন ঃ এতে ৩৩টি মহাল রয়েছে। হান্ডিয়া জেলার পশ্চিমে এ অঞ্চল নর্বদার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। (৪) কালিনা জেলা ঃ এতে ৭টি মহাল রয়েছে। এ অঞ্চলটি আওরংগাবাদ প্রদেশের সন্নিহিত। (৫) নাদারবার জেলা ঃ এতে ৬টি মহাল রয়েছে। (৬) হান্ডিয়া জেলা ঃ নর্বদার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। হোশংআবাদ ও খাড়ুয়া এই জেলায় অবস্থিত। এই প্রদেশ গাজীউদ্দীন খান ফিরোজ জং ও সালাবাত জং এর গৃহযুদ্ধের কারণে মারাঠাদের দখলে চলে যায়।

(২) আওরংগাবাদ প্রদেশ ঃ এর সীমানা নিম্নরূপ ঃ পূর্বে বেরার প্রদেশের পাথারী জেলা ও বেদার প্রদেশ, পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তরে সাহিয়াচল পর্বত, দক্ষিণে বিজাপুর প্রদেশ। এ প্রদেশের আয় মোনেম খান, লক্ষ্মীনারায়ণ, কাদির খান ও গুলজারে আসফিয়ার লেখকের মতানুসারে সামান্য ব্যবধান সহ ১২৭৪৭৪৯৮ রুপিয়া। খাজানায়ে রসুলখানীর লেখকের মতে ১২৭২৪১৯৮ রুপিয়া এবং গ্রান্ড ডোফের মতে ১২৩০৭৬৪২ রুপিয়া। এ প্রদেশের তৎকালীন জেলাসমূহ নিম্নরূপ ঃ (১) দৌলতাবাদ জেলা ঃ ২৭টি মহাল নিয়ে গঠিত। (২) আহমদনগর জেলা ঃ ১০টি মহাল নিয়ে গঠিত। (৩) পটন জেলা ঃ ৩০টি মহাল নিয়ে গঠিত। (৪) প্রেন্ডা জেলা ঃ ১৯টি মহাল নিয়ে গঠিত। (৫) বেটার জেলা ঃ ১টি মহাল নিয়ে গঠিত। (৬) জালনা জেলা ঃ ১০টি মহাল নিয়ে গঠিত। (৭) সাংমেজ জেলা ঃ এতে ১১টি মহাল রয়েছে। (৮) শোলাপুর জেলা ঃ ৩টি মহাল নিয়ে গঠিত। (৯) ফতেহাবাদ জেলা ও বন্দর ঃ এতে ১১টি মহাল রয়েছে। (১০) জুন্নের জেলা ঃ ২০ অথবা ২৩টি মহাল নিয়ে গঠিত। পুনা এই জেলাতেই অবস্থিত। এই জেলা সম্ভবত নিযামুল মুলকের শাসনাধীনে কখনো আসেনি। স্বয়ং সম্রাট আলমগীরের আমলেও এটি নিয়ে মোগল সৈন্য ও মারাঠাদের মধ্যে বিবাদ ছিল। (১১) তাল কোকন জেলা ঃ ১৬টি মহাল নিয়ে গঠিত। প্রাচীনকালে এ জেলাকে কোকেন শাহী নিযাম বলা হতো। পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল ও সমুদ্রের মাঝখানে ওয়ায়েলের উত্তর সীমান্ত থেকে জাওয়ার কোকেন জেলা পর্যন্ত এর সীমানা ছিল। এ অঞ্চল কখনো সঠিক অর্থে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কখনো এর ওপর মোগল সেনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার মারাঠারা ছিনিয়ে নিয়েছে। ফররুখ শিয়ারের শাসনামলের শেষ ভাগে এ জেলার ওপর মারাঠাদের স্বরাজ স্বীকৃত হয়। (১২) জাওয়ার জেলা ঃ ১৩টি মহাল নিয়ে গঠিত। এটি কোকেনের উঁচু অঞ্চল এবং এর ইতিহাসও তাল কোকেনের মতই।

আওরংগাবাদ প্রদেশের উল্লিখিত ১২টি জেলার ৩টি বাদে অবশিষ্ট ৯টি জেলা নিযামুল মুলকের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৩) বেরার প্রদেশ ঃ সীমানা ঃ পূর্বে গণ্ডুয়ানা, পশ্চিমে খান্দেশ ও আওরংগাবাদ, উত্তরে হান্ডিয়া জেলা, দক্ষিণে হায়দরাবাদ ও বেদার প্রদেশ। এ প্রদেশ দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত ঃ বেরার বালা ঘাট, বেরার পাইন ঘাট। প্রথমাংশে সাহিয়াচল পর্বতের উচ্চাংশে অবস্থিত। এটি বর্তমান আদিলাবাদ, নান্দের, পারভানী ও আওরংগাবাদ জেলা নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয়াংশে উক্ত পবর্তের নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত। বেরার বালাঘাট নিম্নোক্ত জেলাসমূহ নিয়ে গঠিত ঃ

(১) পাথারী জেলা ঃ ১১টি মহাল নিয়ে গঠিত। (২) বাসাম জেলা ঃ ৯টি মহাল। (৩) বাতিয়াল বাড়ী জেলা ঃ ৯টি মহাল। অজন্তা এই অঞ্চলেই অবস্থিত। (৪) মাহোর জেলা ঃ ২০টি মহাল। (৫) মাহকার জেলা ঃ ১২টি

মহাল। লক্ষীনারায়ণের বর্ণনামতে বেরার বালাঘাটের আয় ছিল ৩৬৭৪৫৭৪ রুপিয়া। বেরার পাইন ঘাটের জেলাগুলো নিম্নরূপ ঃ (১) সারগাদেল জেলা ঃ ৪৬টি মহাল। এলচীপুর এই জেলাতেই অবস্থিত। (২) কিলম জেলা ঃ ২৪টি মহাল। ইমরাওতী এই জেলায় অবস্থিত। (৩) খেরলা জেলা ঃ ২৪টি মহাল। এই জেলায় আশেটা অবস্থিত। (৪) নারনালা জেলা ঃ ৩৭টি মহাল। বালাপুর এই জেলায় অবস্থিত। (৫) পুনার জেলা ঃ ৪টি মহাল। (৬) ইসলাম গড় ওরফে দেবগড় জেলা। (৭) সারপুর জেলা ঃ ৭টি মহাল। বেরার পাইনঘাটের আয় লক্ষীনারায়ণ শফিকের মতে ৬৭৫৫৯০৪ রুপিয়া। একত্রে সমগ্র বেরার প্রদেশের আয় মোনেম খান, কাদের খান ও গুলজারে আসফিয়া গ্রন্থকারের মতে ১২২৬৮৭৬৭ রুপিয়া ছিল। খাজানায়ে রসুলখানীর মতে ১৩৮৬৯৬৯৩ রুপিয়া এবং গ্রান্ড ডোফের মতে ১১৫২৩৫০৮ রুপিয়া।

(৪) মুহাম্মদাবাদ বেদার প্রদেশ ঃ সীমানা ঃ পূর্বে হায়দারাবাদ প্রদেশ, পশ্চিমে আওরংগাবাদ প্রদেশ, উত্তরে বেরার বালাঘাট, দক্ষিণে বিজাপুর প্রদেশ। এ প্রদেশের মোট আয় সাওয়ানেহে দাক্কান, গুলগাশতে দাক্কান ও গুলজারে আসফিয়াতে ৬৯৪২১০২ রুপিয়া, খাজানায়ে রসূলখানীতে ৭৬৪৩১৭৮ রুপিয়া এবং গ্রান্ড ডোফের মারাঠা ইতিহাসে ৭৪৯১৮৭৯ রুপিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষীনারায়ণের মতে ৭৫০৪৫৬৫ রুপিয়া এ প্রদেশের জেলাগুলো হচ্ছে ঃ (১) বেদার জেলা ঃ ৮টি মহাল। (২) ইতগীর (ফিরোজ গড়) জেলা ঃ ৭টি মহাল। (৩) মিনখেড় (মুজাফফর নগর) জেলা ঃ ১৪টি মহাল। (৪) অমর চন্টা জেলা ঃ ১টি মহাল। (৫) নান্ডের জেলা ঃ ৪২টি মহাল। (৬) কল্যাণী জেলা ঃ ২টি মহাল। (৭) আংলী কোট জেলা ঃ (বা আংকল কোট) ঃ ৭টি মহাল।

(৫) বিজাপুর প্রদেশ ঃ এটি একটি বিশাল প্রদেশ। এর সীমানা আওরংগাবাদের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে মাদুরা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ প্রদেশটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথমটি সুবা বিজাপুর আর দ্বিতীয়টি কর্ণাটক বিজাপুর।

প্রথম ভাগ সুবা বিজাপুরের সীমানা হলো ঃ পূর্বে হায়দরাবাদ প্রদেশ, পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তরে বেদার ও আওরংগাবাদ প্রদেশ এবং দক্ষিণে কর্ণাটক বিজাপুর। এতে নিম্নলিখিত জেলাগুলো অবস্থিত ঃ (১) বিজাপুর জেলা ঃ ৩০টি মহাল। (২) গুলবার্গা জেলা (৩) আযমনগর (বলগ্রাম) জেলা ঃ ১৫টি মহাল। (৪) আসাদনগর (আগলুজ) জেলা ঃ ১২টি মহাল। (৫) ইমতিয়াজ গড় (আদুনী) জেলা ঃ ৬টি মহাল। আদুনী, বলহারী ও করনোল এই জেলার প্রসিদ্ধ স্থান। (৬) বায়চুর জেলা ঃ ৯টি মহাল। (৭) বংকাপুর জেলা ঃ ১৬টি মহাল। সাদানুর, ধারওয়ার এবং হরিহর এই জেলাতেই অবস্থিত। (৮)

তুরগিল জেলা ঃ ১৬টি মহাল। বাদামীর প্রখ্যাত দুর্গ এই জেলায় অবস্থিত। (৯) রায়বাগ জেলা ঃ ১২টি মহাল। কুলহাপুর ও অযোধ্যা রাজ্য এই জেলার অন্তর্গত। (১০) গাজীপুর জেলা ঃ (আনন্দিয়াল) ২৩টি মহাল। বেগিনপল্লী এই জেলায় অবস্থিত। (১১) নলদুরুক জেলা ঃ ৮টি মহাল। (১২) মুহাম্মদ নগর (একড়ি) জেলা। (১৩) মুদগাল জেলা ঃ ১৩টি মহাল। (১৪) মোস্তফাবাদ ওয়ায়েল ঃ ৮টি মহাল। এ এলাকাটি আগে কোকেন আদিলশাহী নামে পরিচিত ছিল। এ এলাকাটি মোগলদের দখলে আসার আগে শিবাজি কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। আলমগীরের আমলের শেষ দিকে এখানেই মারাঠা ও মোগলদের মধ্যে যুদ্ধ হতো। ফররুখ শিয়ারের শাসনামলে এ এলাকার অপর মারাঠাদের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়। নিযামুল মুলকের শাসনাধীন রাজ্যে এ এলাকা কখনো অন্তর্ভুক্ত হয়নি। (১৫) মোরতজাবাদ মারিজ জেলা ঃ ৬টি মহাল। (১৬) নবী শাহ দুরুক জেলা (পরনালা) ঃ ৮টি মহাল। মারাঠাদের বিখ্যাত সাতারা, চন্দন, মন্দন ও পারলী প্রভৃতি দুর্গ এখানেই অবস্থিত। কোকেন আদিল শাহীর মত এটিও কখনো মোগল শাসনের অধীনে আসেনি। তাই এটিও নিযামুল মুল্‌কের রাজ্যের বহির্ভূত মনে করা উচিত। (১৭) নুসরাতাবাদ (সাগর) জেলা ঃ ৫০টি মহাল। তালিকোটা এই জেলার অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগুলো বিজানগরকে পরাজিত করেছিল। সাওয়ানেহে দাক্কান, খাজানায়ে রসুলখানী এবং গুলজারে আসফিয়া গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে এই প্রদেশের মোট আয় ছিল ২৬১৭০৯০৪। কর্ণাটক জেলার আয় বাদ দিলে (কেননা উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে কর্ণাটক জেলাকেও প্রথমাংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে) এই প্রদেশের আয় ২০৮৭৫৯০৪ রুপিয়া দাঁড়ায়। কর্নাটক বিজাপুর (২য় ভাগ) ঃ এর চতুঃসীমানা নিম্নরূপ ঃ পূর্বে কর্ণাটক হায়দারাবাদ, পশ্চিমে কোথাও পশ্চিম ঘাট, কোথাও আরব সাগর, উত্তরে বিজাপুর প্রদেশের দক্ষিণ জেলাসমূহ এবং দক্ষিণে মধর ও দান্দিগেল। এই বিশালয়তন এলাকাটি প্রশাসনিক দিক দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি ভাগ সরাসরি নিযামুল মুলকের শাসনাধীন ছিল। দ্বিতীয় ভাগটি জমীদারদের দ্বারা শাসিত হতো এবং তারা নিযামুল মুলককে কর দিত। প্রথম ভাগে প্রায় ৫০টি মহাল ছিল, যা ৬টি জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলাগুলো হলো ঃ সারা, কোলার, হকোটা, বড় বালাপুর, পুকাভা ও বিসাপাটন। সারা এই ভাগের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। তাজকেরাতুল বিলাদ ওয়াল হুক্কাম গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে এর মোট আয় ৭২৮১২০ রুপিয়া এবং হুন ও গুলজারে আসফিয়ার বর্ণনা অনুসারে ৫২৯৫০০০ রুপিয়া ছিল। দ্বিতীয় অংশে প্রায় ৩৫জন জমীদারের রাজ্য ছিল এবং প্রত্যেকটি মোগল সরকারকে কর দিত। রাজ্যগুলোর নাম ও আয় নিম্নরূপ ঃ

রাজ্য বা তালুকের নাম	আয়
শ্রীরংপটন বা শ্রীদাপটন (মহিশুর)	৩৫৮৫১৩৬১ রুপিয়া
উক্ত রাজ্যের অন্যান্য জমীদার	১০২৬৩৬৩৫ ,,
সুন্ধা বা সুন্দার জমীদার	৭২০৮৭১ ,,
চিতল দুরুগের জমীদার	১১২৫০০০
জরিমাজার জমীদার	৯৩৭৫০ ,,
ত্রিকারার জমীদার	১৭২৫০০ ,,
রতন গিরির জমীদার	৯২৭৫০ ,,
হরহটির জমীদার	৭৫০০০ ,,
মাওগড় বা পাওগড়	১২০০০০ ,,
নাটক পালার জমীদার	১৫০০০ ,,
চক বালাপুরের জমীদার	১৯০২৫০ ,,
কার্তিকরার জমীদার	৭৫০০০ ,,
হারপন হাল্লীর জমীদার	১০২৯৯৬০
আন্নীগোন্ডীর জমীদার	১৭৩৫৫০ ,,
কনগ গিরীর জমীদার	৯৯১১৬৫ ,,
বলহরীর জমীদার	৮৬২৫০ ,,

এছাড়া রায় ড্রিগ, দেওহটী, দেবনহিলী, বাংগালোর, ইনকসগিরি, আন্নিগুল, ভেংকট গিরি, পাংকনুর, মদন পল্লী, গোরি গডা, নীল গিডা, সুলি ড্রিক, হাসকোড়, বিহুনোড়, কোড়গ, মিতোরী (বা মিতোর) হাগল ওয়াড়ী, কোডি কোটা (বা কোড়ি কোটা) এবং শংকর গড় রাজ্যের জমীদারও ছিল, যাদের মধ্যে কোন কোন জমীদারের রাজ্য বেশ শক্তিশালী ছিল। এসব রাজ্যের মোট আয় হাকিকত হায়ে হিন্দুস্তান ও গুলজারে আসফিয়া গ্রন্থে সামান্য ব্যবধানসহ সোয়া পাঁচ কোটি রুপিয়া বলা হয়েছে। তবে কোন সূত্র দ্বারা জানা যায়নি যে, এগুলো থেকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার কি পরিমাণ রাজস্ব পেতেন। কর্ণাটক বিজাপুরের এই সকল রাজ্য সারার শাসনকর্তার অধীনে ছিল। তিনি এ অঞ্চলের শাসক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন। পরে হায়দার আলী ও টিপু সুলতান সমগ্র কর্ণাটক বিজাপুর জয় করেন। টিপু সুলতানের শাহাদাত লাভের পর এ অঞ্চল মহিশুর রাজ্য ও মাদ্রাজ প্রদেশের মধ্যে বণ্টিত হয়।

দ্বিতীয় অংশে মহিশুর, চিতল দিরিগ, বুদনুর প্রভৃতি ৩২টি রাজ্য ছিল, যার মোট আয় ৫২২৬৯২০৯ রুপিয়া ছিল।

(৬) হায়দারাবাদ প্রদেশ

এ প্রদেশটিও প্রায় বিজাপুরের সমান আয়তন বিশিষ্ট ছিল। এটিও দু'টি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। একটি ফরখান্দা বুনিয়াদ সুবা এবং অপরটি কর্ণাটক বালাঘাট ও পায়ানঘাট।

প্রথম অঞ্চল সুবা ফরখান্দা বুনিয়াদের চৌহদ্দী নিম্নরূপ ঃ পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বেদার ও বিজাপুর প্রদেশ, উত্তরে বেরার বালাঘাট, গুণ্ডুয়ানা ও উড়িষ্যা এবং দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগর। সাওয়ানেহে দাকান ও গুলজারে আসফিয়ার বর্ণনা অনুসারে এর মোট আয় ১৭০৮৫৩৪৭ রুপিয়া ছিল এবং এতে নিম্নলিখিত জেলাগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

(১) মুহাম্মদ নগর গোলকুন্ডা জেলা ঃ ১২টি মহাল। (২) ভূঙ্গের জেলা ঃ ১১টি মহাল। (৩) দেবরকুন্ডা জেলা ঃ ১২টি মহাল। (বর্তমান নাম মাহবুব নগর) (৪) মিদাক জেলা ঃ ১২টি মহাল। (৫) কোলাস জেলা ঃ ৫টি মহাল। (৬) খামাম মেট জেলা ঃ ১১টি মহাল। (৭) নীলগুন্ডা জেলা ঃ ৬টি মহাল। (৮) কোয়েলকুন্ডা জেলা ঃ ৬টি মহাল। (৯) পাংগাল জেলা ঃ ৫টি মহাল। (১০) করিম নগর জেলা ঃ ৯টি মহাল। (১১) ঘানপুরা জেলা ঃ ৯টি মহাল। (১২) আরামগীর জেলা ঃ ১টি মহাল। (১৩) ভুরুঙ্গার জেলা ঃ ১৬টি মহাল। (১৪) মালাংকোর জেলা ঃ ৩টি মহাল। (১৫) হিরক খনি জেলা ঃ ১টি মহাল। (১৬) মোস্তফা নগর (কাওন্ড পল্লী) জেলা ঃ ১৪টি মহাল। (১৭) মোরতজা নগর (গাভুর) জেলা ঃ ৫টি মহাল। (১৮) ইলোর জেলা ঃ ১২টি মহাল। (১৯) রাজমুন্ডেরী জেলা ঃ ২৪টি মহাল। (২০) মসলী পটন বা মৎস্য বন্দর জেলা ঃ ৮টি মহাল। (২১) নিযাম পট্টন জেলা ঃ ১টি মহাল। (২২) চিলকা সিকাকোল জেলা ঃ ১টি মহাল।

দ্বিতীয় অঞ্চল ঃ কর্ণাটক হায়দারাবাদ। এটিও দুই ভাগে বিভক্ত ঃ বালাঘাট ও পায়ানঘাট। কর্ণাটক বালাঘাট অঞ্চলটি পূর্বাঞ্চলীয় উঁচু পার্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত। এর একদিকে মহিশুর, অপরদিকে আসফিয়া রাজ্য এবং তৃতীয় দিকে পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য উপত্যকা অবস্থিত। এ অঞ্চলের মোট আয় ৪৯,৬২,৩৬৩ রুপিয়া ছিল। এর জেলাগুলো হলো ঃ

(১) সারহোট জেলা ঃ ৮টি মহাল। কাড়াপ্পা এর কেন্দ্রীয় শহর। (২) গাঞ্জী কোঠা জেলা ঃ ১৫টি মহাল। (৩) গোরামকুন্ডা জেলা ঃ ১২টি মহাল। (৪) খাম্মাম জেলা ঃ ৮টি মহাল। (৫) গার্তি বা কাট্টি জেলা ঃ ১৩টি মহাল।

কর্ণাটক পায়ানঘাট ঃ এ এলাকার প্রধান শহর অর্কট ছিল। এর উত্তরে ঘানতুর ও নিযাম পট্টন জেলা, দক্ষিণে রাসকুমারী, পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পূর্বাঞ্চলীয় উপত্যকা অবস্থিত। এর জেলাগুলো হচ্ছে ঃ (১) ওদগের জেলা ঃ ৬টি মহাল। (২) ভেলর জেলা ঃ ৮টি মহাল। (৩) পালাম কোট জেলা ঃ ১২টি মহাল। মাহমুদ বন্দর বিশ্বপট্টন এবং বরদা চিল্লম এই জেলাতেই অবস্থিত। (৪) ত্রিপাতুর জেলা ঃ ১০টি মহাল। মেলাপুর ও মাদ্রাজ এই জেলাতেই অবস্থিত। (৫) জগদেবপুর জেলা ঃ ১৭টি মহাল। দাম্মিম বাড়ী, কাবেরী পট্টন, খানখান হিল্লী, রায়কোট ও চেনপট্টন এই জেলাতেই অবস্থিত।

(৬) চন্দ্রগিরি জেলা ঃ ১০টি মহাল। চিতোর ও ত্রিপতী এই জেলায় অবস্থিত। (৭) চংগল পট জেলা ঃ ৩টি মহাল। (৮) সারদাপল্লী জেলা ঃ ১২টি মহাল। নিলোর ভেংকটগিরি এবং অন্তসাগর এই জেলার অন্তর্গত। (৯) কাঞ্চী জেলা (কাঁচি বের) ঃ ১৫টি মহাল। অর্কট ও কাবেরী পাক এই জেলার অন্তর্গত। (১০) তৃণমূল জেলা ঃ ১১টি মহাল। (১১) নুসরাত গড় জাঁচি জেলা (ইংরেজরা একে জাঞ্জী বা গাঞ্জী লিখে থাকে) ঃ ৮টি মহাল। (১২) বরদাবর জেলা ঃ ৯টি মহাল। সেন্ট ডেভিড দুর্গ এই জেলায় অবস্থিত। (১৩) রোতাবসী (ইংরেজদের কথিত ভাভদাস) জেলা ঃ ৩টি মহাল। (১৪) বলকোন্ডাপুর জেলা ঃ ৫টি মহাল। (১৫) ত্রিচেনাপল্লী জেলা ঃ আগে একটি করদ রাজ্য ছিল। পরে এটিকে অর্কট জেলার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। (১৬) চাঞ্জাবর বা তাঞ্জাবর জেলা ঃ (ইংরেজদের ভাষায় তাঞ্জোর) একটি হিন্দু করদ রাজ্য ছিল। তাঞ্জাবর বাদে এই গোটা এলাকার আয় ছিল ২,৯১,৬৫,০৫৩ রুপিয়া। তা াবরের আয় যোগ করলে ৩ কোটি ছাড়িয়ে যেত।

এই ছয়টি প্রদেশ ব্যতীত সুরাট বন্দরও একটা আলাদা জেলা হিসেবে নিযামুল মুল্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য কখনো কখনো এগুলোকে "দাক্ষিণাত্যের সাড়ে ছয়টি প্রদেশ" বলে আখ্যায়িত করা হতো। সুরাট বন্দরের আয় কত ছিল তার কোন তথ্য আমি পাইনি। তবে অনুমিত হয় যে, এখান থেকে আমদানী রপ্তানীর প্রচুর শুল্ক পাওয়া যেত। কেননা তৎকালে সুরাট বন্দর বর্তমান বোম্বের মত মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। সুরাট বন্দর কতদিন পর্যন্ত আসফিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কবে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

দাক্ষিণাত্যের উল্লিখিত ভৌগলিক তথ্যাবলী সংগ্রহে ও মানচিত্র তৈরীতে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ

সাওয়ানেহে দাক্কান ঃ এটি উৎকৃষ্টতম উৎস। প্রদেশসমূহের চৌহদ্দী, আয় এবং এগুলোর জেলা ও মহালসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে বিদ্যমান।

রাকয়াতে মুসাভী খান জারায়াত ঃ এর একটি অধ্যায়ে শুধু এতটুকু উল্লেখ আছে যে, নিযামুল মুলক ভারত সম্রাটের নিকট দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলোর আয় পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ করে সুরাট বন্দর চেয়ে নিয়েছিলেন।

খাজানায়ে রসূলখানী ঃ এর অধিকাংশ তথ্য সাওয়ানেহে দাক্কান থেকে গৃহীত। তবে অন্যান্য উৎস থেকেও অনেক তথ্য এতে সংকলিত হয়েছে।

কাইফিয়তে জমা ও খরচ ও ইন্তেজামে মুলুক সরকারে আলী ঃ (আসফিয়া পাণ্ডুলিপি লাইব্রেরী) সালারে জং এর শাসনামলে কোন এক কর্মকর্তা কর্তৃক এটি লিখিত। লেখকের নাম অনুল্লেখিত। অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যাবলীতে সমৃদ্ধ পাণ্ডুলিপি।

গুলজারে আসফিয়া ঃ
হাকিকত হায়ে হিন্দুস্তান } অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সম্বলিত।

তুজুক ওয়ালাজাহী
তাজকেরাতুল বিলাদ ওয়াল হুক্কাম ঃ } এই দু'টি গ্রন্থেই কর্ণাটক সম্পর্কে বহু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিসালায়ে আমদানী ও পায়মায়েশে মামালেকে হিন্দ ঃ

(আসফিয়া পাণ্ডুলিপি লাইব্রেরী) গ্রন্থকারের নাম ও রচনা সন অজ্ঞাত।

সায়রুল হিন্দ ও গুলগাস্তে দাক্কান

Imperial garetter of India

Historical and descriptive sketch of H. E. H. The Nizam's dominions.

Hyderabad Gezetter—M. Mehdi Khan

The Nizam By Briggs.

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের কোনটিতেই নিযামুল মুল্‌কের রাজ্যের সঠিক সীমানা উল্লেখ করা হয়নি। সীমানা নির্ণয়ের কাজটি আমিই করেছি। অবশ্য সূক্ষ্ম গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর এতেও যথেষ্ট সংশোধনের অবকাশ রয়েছে।